মনের আয়নায়

বিমল মিত্র

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা-৭

MANER AYNAY
[On the mirror of mind]
by BIMAL MITRA
Published by—
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3, College Street Market
Calcutta-7 (INDIA)

প্রথম প্রকাশ
পৌষ, ১৩৭১

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭ (দ্বিতলে)

মুদ্রণে ঃ
মহুয়া প্রেস
৬৫, বিধান সরণী
কলিককাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ
অমিয় ভট্টাচার্য

"I slept
And dreamt that life was all joy
I awoke
And saw that life was but service
I served
And understood that service was joy"

—*Rabindra Nath Tagore*

জানতে হয়, কোথায় থামতে হবে

'সাপ্তাহিক বর্তমান' পত্রিকার অনুরোধে অগ্রজ ঔপন্যাসিক বিমল মিত্র তার অন্তরঙ্গ সাহিত্য আলোচনা করেছেন অনুজ সাহিত্যিক সুনীল দাসের সঙ্গে। এই বিশেষ কথোপকথন তারই প্রতিবিম্ব।

প্রশ্ন ঃ আপনার বয়স তো প্রায় আশি হলো। সাহিত্য জীবনের বয়সটাও পেরিয়ে গেছে অর্ধশতবর্ষ। বাংলা উপন্যাসের সবচেয়ে বড় আয়তন গড়ে উঠেছে আপনার অনেক বছরের বিনিদ্র রজনীর পরিশ্রমে। আজ অবসাদ তাই অনিবার্য। লেখা থেকে আপনি ছুটি চাইছেন বড় আকুল হয়ে। কিন্তু সম্পাদক, প্রকাশকেরা তো আপনাকে কিছুতেই ছুটি দিতে চাইবেন না। পাঠককে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে যেতে বাধ্য করার মতো শক্তিশালী লেখার হাত তো তাঁদের হাতে বেশি নেই। এই পরিস্থিতিতে আপনি কী বলছেন ?

বিমল মিত্র ঃ দিলীপকুমার রায় একদিন শরৎচন্দ্রকে বললেন, আপনাকে আমি নিয়ে যাবো আমার ওস্তাদজির গান শোনাতে। প্রস্তাবটা শুনে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'তোমার ওস্তাদ ভালো গাইতে জানেন শুনেছি, কিন্তু ঠিকমতো থামতে জানেন তো ?'

কোনো শিল্পে এই থামতে জানাটাই খুব বড় আর্ট। লেখার জীবনেও থামতে জানা চাই। রবীন্দ্রনাথের মতো অত বড় প্রতিভাকেও উপন্যাস রচনা থামাতে হয়েছিল —১৯৩২-এ তিয়াত্তর বছরে পেঁাছে। শরৎচন্দ্র ষাট বছর বয়সে মারা গিয়ে বেঁচে গিয়েছেন। আমার দুর্ভাগ্য আমি এখনো বেঁচে আছি। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে প্রকাশের নতুন মাধ্যম নিয়ে মেতে ছিলেন। ঔপন্যাসিকের কলম তুলে রেখেছিলেন। রঙ-তুলি নিয়ে এমন অনুভূতিকে ধরতে চেয়েছিলেন যা শব্দের অক্ষরে ধরা পড়েনি। তাঁর ক্ষমতার সঙ্গে আমার নিজেকে তুলনা করার প্রশ্নই ওঠে না। আমার শরীরও ভেঙে গেছে একেবারে। ভয় ছিল 'এই নরদেহ' উপন্যাসটা বোধহয় শেষ করে যেতে পারবো না। টানা ছ'টা বছর ধরে লেখার পর এখন শেষ করতে পেরে আমি খুশি।

প্রশ্ন ঃ প্রায় পাঁচ দশক ধরে এই বিপুলায়তন সাহিত্য রচনার পরে আপনার কি মনে হচ্ছে আপনি যা দিতে চেয়েছিলেন তা দিতে পেরেছেন ?

বিমল মিত্র ঃ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে মানুষকে নানান ধরনের ট্যাক্স দিতে হয়। ইনকাম ট্যাক্স, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, রোড ট্যাক্স, প্রফেশনাল ট্যাক্স—হাজারো রকমের ট্যাক্স গুনতে হয় জীবনভর। কিন্তু সূর্যের উত্তাপ, চাঁদের আলো, বর্ষার ধারা বর্ষণ—এইসব প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করার জন্যে কোনো মানুষকে ট্যাক্স দিতে হয় না। কোটি-কোটির মধ্যে দু'একজন মানুষ দেয় মাত্র। যারা দেয় তারাই হয় কালিদাস, শেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ। অন্যরা সবাই ভোগই করে। কিছু যোগ করতে চায় না। ওই যোগের মধ্যে দিয়ে দেওয়াটাই একদা আমাকে টেনেছিল। লিখতে শুরু করেছিলুম। সে দেওয়া কতটুকু পূর্ণ হয়েছে, কতখানি সার্থক হয়েছে তা আমি বলতে পারবো না। আর আর্টে পারফেকশন বলে কিছু আছে বলে জানা নেই।

প্রশ্ন ঃ এই দেওয়ার জন্যে সরকারি চাকরিটাতে পর্যন্ত ইস্তফা দিয়ে স্বাধীন লেখকের জীবনযাপন কি একান্তই অনিবার্য ছিল ?

বিমল মিত্র ঃ রেলের চাকরিটাতে আমি তো ছিলাম বেশ আরামে। মাস পয়লায় মাইনে পেতাম। যদিও প্রতি মাসে ক্লার্কের কাছে হাত বাড়িয়ে মাইনে নিতেও আমার লজ্জা করতো। নিজে নিতাম না। অথরাইজড্ করে অন্য লোককে দিয়ে আনাতাম। অফিসে আমার পরিচয় ছিল বি কে মিত্র হিসেবে। যে ক্লার্কটি টাকা দিতো সে বলতো এই বি কে মিত্রকে তো দেখতেই পাই না।

অফিসের বাইরে আমি বিমল মিত্র। এই বিমল মিত্রকে আমি অফিসের সব রকমের হীনমন্যতা থেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতাম। অফিসের কর্মচারি হিসেবে ওপরওয়ালার যা কিছু গালিগালাজ হজম করতো বি কে মিত্র। বিমল মিত্রের গায়ে তার আঁচড় লাগতে দিতাম না। রেলে চাকরি করার সময় আমার লেখা একটা গল্প নিয়ে অফিসের মধ্যে একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠলো। আমার সেই গল্পটাতে ছিল যে একজন রেলের অফিসার ঘুষ নিচ্ছে। গল্পটা পড়ে আমার অফিসের এক সহকর্মী রেগে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে কর্তাদের কাছে অভিযোগ করলো। বি কে মিত্রের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগপত্র ওপরওয়ালা থেকে আরো ওপরওয়ালা—তারপর তারও ওপরওয়ালা—এইভাবে ঊর্ধ্বমুখী হলো।

একদিন আমার ঠিক ওপরওয়ালা আমাকে ডেকে বললেন—মিস্টার মিত্র, আপনার চাকরি আর থাকছে না। আপনি রেলে চাকরি করে রেলের বিরুদ্ধে লিখলেন ?

আমি বললাম, কেন ? রেলের অফিসাররা কি ঘুষ নেন না ? আপনার কি মনে হচ্ছে আমি মিথ্যে লিখেছি ?

অফিসার বললেন, সত্যি মিথ্যের কথা হচ্ছে না। আপনি এটা লেখাতে আমাদের অফিসের অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র এসেছিল আমার কাছে। আমি ফরোয়ার্ড করে দিয়েছি হায়ার অথরিটির কাছে। তাঁরা যা ভালো বোঝেন ব্যবস্থা নেবেন। ব্যাপারটা আপনাকে আমি জানিয়ে দিলাম।

ওইটুকু শুনে আমার ওপরওয়ালার সামনে থেকে চলে এলাম আমি। তারপর সেই অভিযোগপত্র উচ্চ থেকে উচ্চতর অফিস দপ্তরে এগোতে এগোতে যখন সর্বোচ্চ অফিসারের কাছে পোঁছলো তিনি লিখেছিলেন—It is writer's privilege.

সেবার রায় পুরোপুরি আমার পক্ষে এলেও ওই ধরনের ছোট-বড় আরো নানা ঘটনা ঘটতে লাগলো মিস্টার বি কে মিত্র এবং লেখক বিমল মিত্রের দ্বৈত্য জীবনের ভূমিকায়। এইসব ঘটনা আমাকে ভেতরে ভেতরে অস্থির করে তুললো। তাই একদিন অফিস ছেড়ে, মাস মাইনের নিশ্চিত জীবনটা ছেড়ে চলে এলাম কেবল লেখকের কলম-নির্ভর জীবনে। অবশ্য এ ব্যাপারে আমার স্ত্রীব সমর্থন ও সহযোগিতা আমায় সত্যিকারের শক্তি জুগিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ লেখক জীবনে আপনি আপনার সমসাময়িক লেখকদের কাছ থেকে কতখানি সহযোগিতা পেয়েছেন ?

বিমল মিত্র ঃ আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি এই যে, আমি আমার সমসাময়িক সমস্ত লেখকদের শত্রু তৈরি করতে পেরেছি। নরওয়ের লেখক হেনরিক ইবসেন লিখেছেন 'to live is to war with friends.'

'হাঙ্গারে'র লেখক নুট হ্যামসুন চরম অপ্রিয় কথা শুনিয়েছিলেন ইবসেনকে। তরুণ নুট হ্যামসুন প্রবীণ ইবসেনকে এক সাহিত্য সভায় আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। তারপর ইবসেনকে মঞ্চে বসিয়ে হ্যামসুন বলতে শুরু করলেন—এই যে আমার পাশে বসে আছেন ইবসেন—ইনি নাটকের কিছুই বোঝেন না। এরপর একটানা নিন্দা করে গেলেন

ইবসেনের সাহিত্যের। Enemy of the people-এর নাট্যকারকে মঞ্চে বসে থেকে নীরবে শুনতে হলো সে নিন্দা।

আমাদের দেশের শিল্প-সংস্কৃতিতেও ও ধরনের ঘটনা বিরল নয়। শ্রোতা হিসেবে আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। সেই সভায় আমার সঙ্গী ছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ। তখন নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ি এবং নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরির ব্যক্তিত্ব সংঘর্ষ ছিল তুঙ্গে। আয়োজন হয়েছিল কংগ্রেস থেকে নাট্যাচার্যকে একটি সংবর্ধনা দেওয়ার। সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল চৌরঙ্গিতে। আমরা গিয়ে দেখলাম নাট্যাচার্য এসেছেন সেই সংবর্ধনা গ্রহণ করতে। এসেছেন নটসূর্যও। অহীন্দ্র চৌধুরির মাধ্যমেই সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা শিশির ভাদুড়ির কাছে কতখানি মারাত্মক ব্যাপার ছিল আমরা মনে মনে সেটাই ভাবছিলাম। দুজনকেই আমরা জানি। অনুষ্ঠানের মধ্যে না জানি কী বিস্ফোরণ ঘটে যায়!

কিন্তু দেখা গেল নাট্যাচার্য শান্তভাবেই সংবর্ধনা গ্রহণ করলেন সহাস্য নটসূর্যের মাধ্যমে। তারপর সংবর্ধনা উত্তরে বলতে গিয়ে শিশির ভাদুড়ি বললেন, 'আমার জীবনে আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি, আমার স্ত্রী বিয়োগ সহ্য করেছি, আমার আর্থিক অভাব সহ্য করতে পেরেছি। আমার থিয়েটার চলে যাওয়ার বেদনা সহ্য করতে পেরেছি—কিন্তু আজ আপনারা আমাকে যে দুঃখ দিলেন তা সহ্য করার শক্তি আমার নেই। আজ আপনারা এমন একজনের হাত দিয়ে আমায় সংবর্ধনা দিলেন যিনি অভিনয়ের কিছু বোঝেন না।'

সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এমন তো চলছেই। ব্যক্তিত্ব সংঘর্ষের এই আঘাত প্রত্যাঘাতের কঠোর সত্যকে আমি জীবনে গ্রহণ করতে শিখেছি। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শিখেছিলাম, 'শত্রু সৃষ্টি শক্তির লক্ষণ।' সম-কালের সমস্ত লেখককে শত্রু করতে পারার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ মনু সংহিতার একটা কথা আপনার মুখে বারবার শুনেছি—'নিন্দাকে অমৃত এবং প্রশংসাকে বিষ বলে জানবে।' আপনার সাহিত্য জীবনে নিন্দার কোন অমৃতস্বরূপ ভূমিকা আছে কি?

বিমল মিত্র ঃ অগ্রজ প্রতিমের নিন্দা আমার জীবনে কিভাবে আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে সেই গল্পটা বলি।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে গিয়েছিলাম ওঁর টালার বাড়িতে ওঁকে প্রণাম করতে। জন্মদিনে উনি সবাইকে খাওয়াতেন। রীতিমতো

ভুরিভোজের ব্যবস্থা ছিল। আমি ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম সাহিত্যিক পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন তারাশঙ্কর। আমি একগুচ্ছ রজনীগন্ধা ওঁর হাতে দিলাম। তারপর ওঁনাকে প্রণাম করতেই উনি বলে উঠলেন, 'বিমল, তুমি তো খালি অতীত নিয়ে লিখছো। অতীতটা তো নষ্টালজিয়া। বর্তমান নিয়ে লেখা শক্ত। বর্তমান নিয়ে লিখতে পারো?

তখন আমার একটাই বই বেরিয়েছে—'সাহেব বিবি গোলাম'। পরিকল্পনা করা আছে এরপর 'বেগম মেরী বিশ্বাস' লিখবো। একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে সে জন্যে অগ্রিম টাকাও নিয়ে ফেলেছি। এমন সময় একঘর ভর্তি লেখকদের সামনে তারাশঙ্করের ওই কথাগুলো নিন্দার চাবুক হয়ে আমায় আঘাত করেছিল। আমি মন ভার করে বাড়ি ফিরে এলাম।

আমার বাড়ির কাছে থাকতেন বেতারের সংবাদ ঘোষক পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ি ফিরেই পীযূষবাবুর সঙ্গে দেখা। উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন - কী বিমলবাবু, মুখ এমন ভার কেন?

আমি ওঁকে বললাম, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন আমায়।

শুনে পীযূষবাবু বললেন, 'বেশ তো আপনি লিখুন না বর্তমান নিয়ে। আমি একটা কাহিনী বলবো আপনাকে'।

এইভাবে আমি পেয়ে গেলাম 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর বীজ। কাহিনী শোনার পর, পীযূষবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গল্পের চৌহদ্দিতে কালিঘাটের অলিগলি ঘোরাঘুরি শুরু হয়ে গেল। বর্তমান নিয়ে লেখার একটা ভয়ংকর জেদ তখন আমায় পেয়ে বসেছে। সেই ভেতরের তাগিদেই লেখা হলো বৃহৎ উপন্যাসটি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিন্দা না করলে আমার 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' লেখা হতো না। ওঁর নিন্দাটাই আমার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে উঠলো।

প্রশ্ন ঃ 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' বাংলা উপন্যাস পাঠকদের ঝিমিয়ে পড়া জগৎটাকে আবার প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অতি সাধারণ পাঠক পর্যন্ত উজ্জীবিত হয়েছিলেন—উপন্যাসের সেই পাঠক বিস্ফোরণে। প্রকাশক, সম্পাদক, জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রের পরিচালকেরা প্রাণিত হয়ে উঠলেন অন্যতর আশায়। ওই সময় আপনার প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

বিমল মিত্র ঃ ১ জানুয়ারি, ১৯৬০ 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় লেখা শুরু হলো। রাত জেগে জেগে লিখি, আর

প্রতি সপ্তায় পত্রিকার অফিসে গিয়ে দিয়ে আসি কিস্তি। সারাদিন কাটে জাতীয় গ্রন্থাগারে। একদিন সন্ধেবেলা সাপ্তাহিকের অফিসে গেছি কিস্তি জমা দিতে। অফিসে তখন ছিল শুধু বেয়ারা চৈতন্য। লেখা দিয়ে বললাম, 'এই নাও চৈতন্য, চোদ্দ পাতা। ঠিক আছে কিনা দেখে নাও।'

চৈতন্য শুনে নিয়ে একটা কটু মন্তব্য করলো। বলল, 'আপনার লেখাতেই যদি পত্রিকা ভর্তি হয়ে যায়, তাহলে অন্য লেখকদের লেখা কোথায় ছাপা হবে?'

এ মন্তব্য শুনে আমি রাগ করলাম না। বুঝলাম, ও বাবুদের মুখে যেসব মন্তব্য শুনেছে—তাই বলছে। অথচ লেখা শুরু করার আগের থেকেই আমার ওপর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল প্রতি সংখ্যায় চোদ্দ পাতা করে দিতে হবে এবং কোথাও যেন এতটুকু সঙ্কুচিত না করি। এরপর ১৯৬৫ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে যখন ওই একই সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'বেগম মেরী বিশ্বাস' লেখা চলছে—সেই সময় একদিন সকাল সাড়ে আটটায় আমার বাড়ির টেলিফোন বেজে উঠলো।

ফোন তুলে শুনলাম চৈতন্যর গলা। অফিস থেকে ফোন করছে। আমি বললাম, 'চৈতন্য, এতো সকালে—এই সাড়ে আটটায় ফোন করছো কেন?'

সে বললো, 'অন্য কেউ অফিসে আসার আগে ফোন করে নিচ্ছি আপনাকে একটা কারণে। আপনার লেখার জন্যে আমাদের কাগজ আজ 'এ' ক্লাস হলো—আমাদের সকলের মাইনে এ মাস থেকে বাড়লো।'

চৈতন্য সরল মানুষ বলে খুশি হয়ে খবরটা আমায় বলে ফেলেছিল। কিন্তু ওই খবরটা সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কেউ কোনোদিন জানাননি। তারপরেও আরো অনেক উপন্যাস লিখেছি ওই সাপ্তাহিকে। কাগজের প্রচার বেড়েছে প্রতি সংখ্যায়। কিন্তু কোনোদিন পত্রিকার তরফ থেকে আমার পরিশ্রমের সেই স্বীকৃতিটুকু পর্যন্ত কেউ দিতে চাননি। উল্টে প্রবল বিরোধিতা পেয়েছি। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী 'সাহেব বিবি গোলাম'কে নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছিলেন ওই সাপ্তাহিকে। সে প্রবন্ধ ছাপা হলো না। পরে ইন্দিরা দেবীর চিঠি পেয়ে যখন জানতে পারলাম, ব্যাপারটা সম্পাদককে প্রশ্ন করলাম—'কেন ছাপা হলো না এমন মাননীয়া লেখিকার রচনাটি?'

সম্পাদক বললেন, 'ওটা ছাপালে সুবোধ ঘোষ আমায় খুন করবে।' আমার মনে পড়েছিল সত্তর বছর বয়সে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি কথা।

আমি সকলকে হাসাই, কাঁদাই, ভাবাই। কিন্তু জগতে আমার মতো দুঃখী মানুষ আর একজন নেই—

একমাত্র চার্লস ডিকেন্সই এই মানুষটির দুঃখের কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই মুখে মুখে একজনকে ডিক্‌টেশন্‌ দিয়ে তাঁর জীবনী লিখেছিলেন।

সেই ছেলেটাও এই গ্রেমাল্‌ডীর জীবনের কথা অনুভব করতে পেরেছিল। কারণ সে ছেলেমানুষ হয়েও ছিল চরম দুঃখী। ছোটবেলায় পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে সে ফুটবল খেলার মাঠে যেতো। কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে কখনও একাত্ম হতে পারতো না।

ফুটবল খেলা যদিও এগারোজনের মিলিত খেলা, কিন্তু তারই মধ্যে সবচেয়ে নিঝঞ্ঝাট আর নিরাপদ ছিল 'গোলকিপারের' ভূমিকা। দল বেঁধে যেসব কাজ করতে হয় তার মধ্যে সেই ছেলেটা কখনও জড়িত থাকে না। তাই সেই ছেলেটা ফুটবল খেলায় সেই নিঝঞ্ঝাট আর নিরাপদ ভূমিকা গ্রহণ করেই তার বালকসুলভ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতো।

ওদিকে তার বাড়িতে গৃহ-শিক্ষক এসে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু তাঁর ছাত্রেরই দেখা নেই। ছেলেটা ফুটবল খেলার মাঠে গিয়ে তখন খেলাতেই মত্ত।

সেই ছেলেটার অভিভাবক তখন গৃহ-শিক্ষকের কাছে ঝুড়ি-ঝুড়ি নালিশ পেশ করছেন। আর নালিশও কি একটা? অসংখ্য। সেই ছেলেটা যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ নাকি ঘরের দরজা বন্ধ করে একলা থাকে। সংসারের একটা কুটোটুকু পর্যন্ত সে নাড়িয়ে গৃহস্থের একটু উপকারও করে না। তাহলে যখন ছেলেটা বড় হবে তখন কী করবে সে? কী করে নিজের সংসার চালাবে? তারও তো একদিন সংসার হবে। তাকেও তো একদিন টাকা উপার্জনের ধান্ধা করতে হবে। তখন?

গৃহ-শিক্ষক এর জবাবে কী আর বলবেন। চুপ করে থাকেন। ছেলেটার অভিভাবক আবার একটা খাতা এনে গৃহ-শিক্ষকের সামনে মেলে ধরে। বলেন—এই দেখ, তোমার ছাত্র এইসব ছাই-ভস্ম পদ্য লিখে কেবল সময় নষ্ট করে। ইস্কুলের লেখা-পড়া সব চুলোয় গেল, ঘরের দরজা বন্ধ করে কেবল এই করে—

গৃহ-শিক্ষক খাতাটা নিয়ে পড়তে লাগলেন। যখন এক পক্ষ থেকে নালিশ জমে জমে স্তূপীকৃত হয়ে পাহাড়ের রূপ ধারণ করেছে তখন হঠাৎ আসামী এসে কাঠগড়ায় হাজির হল। আসামীকে দেখে ফরিয়াদী পক্ষ

ভেতর-বাড়িতে অন্তর্ধান করলেন। আর গৃহ-শিক্ষকের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো আসামী। পৃথিবীর কোনও অভিভাবক বা কোনও গৃহ-শিক্ষকেরই অভিপ্রেত নয় যে তাঁর ছেলে বা তাঁর ছাত্র ভবিষ্যৎ-জীবনে লেখক হোক। কারণ তাতে অর্থ উপার্জনের কোনও নিশ্চয়তা নেই।

গৃহ-শিক্ষক সেই ছেলেটাকে তখন জেরা করা শুরু করেছেন। বললেন—তুমি এসব কী লিখেছ? কবিতা?

আসামী মাথা নাড়লেন—হ্যাঁ—

—তবে কি তুমি বড় হয়ে কবি হতে চাও? লেখক হতে চাও?

—হ্যাঁ।

কিন্তু কবি বা লেখক হলে পেট চালাবে কী করে? লিখে তো কারো পেট চলে না। বিশেষ করে বাঙলা ভাষার লেখক। লেখালেখির সঙ্গে একটা চাকরি তো তোমাকে করে যেতে হবে। তা না করলে তুমি খাবে কী?

ছেলেটা বললে—ভিক্ষে করবো সেও ভাল, তবু আমি চাকরি করবো না, আমি লেখক হবো—

গৃহ-শিক্ষক সেই ছেলেটার দৃঢ়তা দেখে অবাক। বললেন—তুমি দেখছি একটা আস্ত পাগল। এখন তোমার বয়েস কম বলে তুমি এই কথা বলছো। ছেলেবেলায় সবাই ও-রকম বলে, তারপর বয়স বাড়লে বোঝে কতো ধানে কতো চাল। তারা আফশোস করে। তোমাকেও একদিন তাই করতে হবে। তাই এখন থেকেই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ও-সব পাগলামি ছেড়ে মন দিয়ে লেখাপড়া করো, যাতে একটা ভাল চাকরি পাও। বাঙালি অন্নগত প্রাণ, তুমি বাঙালি হয়ে জন্মেছ সেটা ভুলে যেও না, তোমার বিপদের সময়ে কোন বাঙালি তোমায় দেখবে না। এটা মনে রেখো।

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—লেখক বা কবিদের কী কষ্টের জীবন তা তুমি জানো না তাই কবি হতে চাইছো। জানো, মিলটন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, বালজাকও তাই। শেষ জীবনে তাঁরা ভীষণ কষ্ট পেয়ে মারা গিয়েছিলেন। মাইকেল মধুসূদনকে অর্থাভাবে হাসপাতালে ফ্রি বেডে গিয়ে মরতে হয়েছে, তা জানো? মোপাসাঁ পাগলা-গারদে গিয়ে মারা গেছেন, যে-রুশোর লেখা বই 'The Social Contract'-এর জন্যে ফ্রান্সে অতো বড়ো বড়ো রাজা-বাদশাদের গিলোটিনে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল সেই তিনি নিজেই যন্ত্রণায় পাগল হয়ে শেষকালে

আত্মহত্যা করেছিলেন। লিও টলস্টয়ের মতো, অতো বড়ো লেখক মারা গিয়েছিলেন একটা রেলওয়ে স্টেশনের থার্ড-ক্লাস ওয়েটিং রুমে। ডস্টয়েভ্স্কীকে আট বছর সাইবেরিয়ায় নরকের মধ্যে জেল খাটতে হয়েছিল। আর ইব্সেন? সেক্সপীয়রের পরে পৃথিবীতে যাঁকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলা হয় সেই তিনিই বন্ধুদের শত্রুতায় এতই কষ্ট পেয়েছিলেন যে শেষ-জীবনে তিনিই লিখে গিয়েছেন—"To live is to war with friends". অর্থাৎ লেখক হওয়া মানেই হল বন্ধুদের শত্রু করে তোলা।

আর আমাদের দেশের বঙ্কিম চাটুজ্জের নাম শুনেছ তো? তাঁর লেখার জন্যে তাকে অফিসের বড়-সাহেবদের কাছ থেকে এতো গঞ্জনা পেতে হয়েছিল যে চাকরির মেয়াদ শেষ হবার দু'বছর আগেই তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন। আর শরৎ চাটুজ্জে? তিনি সাহিত্য করবার জন্য চাকরি ছেড়ে দিয়েও কি নিস্তার পেয়েছিলেন? তার বই তো এখনও ভদ্র-সমাজে অস্পৃশ্য। তাই বলি তুমি ও-সবের মধ্যে যেও না। যেমন করে তোমার বাপ-ঠাকুর্দা পরের সঙ্গে আপস করে জীবন কাটিয়েছেন, তুমিও সেইভাবে জীবন কাটাও। কাজ কী বাপু তোমার ও-সব ঝামেলায় গিয়ে? সবাই যেমন করে খায়-দায়-ঘুমোয় আর চাকরি করে, তুমিও তেমনি করে জীবন কাটাও না। তারপর চাকরি থেকে যথাসময়ে রিটায়ার করে সবাই যেমন পেন্শনের টাকায় শেষ-জীবনটা পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আরামে কাটায়, তুমিও তেমনি করবে। আর তারপর মারা গেলে সবাই যেখানে যায় তুমিও সেখানে যাবে। ল্যাটা চুকে যাবে। এইসব ঝগড়া-ঝাঁটি ঝামেলার মধ্যে মিছিমিছি যাবার তোমার দরকারটা কী?

গৃহ-শিক্ষকের এইসব মহা-মূল্যবান উপদেশ সেই ছেলেটা কান পেতে শুনতো বটে কিন্তু মুখে কোনও দিন কিছু বলতো না। এইসব উপদেশ বর্ষণ শেষ হলে যথারীতি রোজকার মতো আবার পড়ানো শুরু হতো।

কিন্তু সেইসব ভেবে ভেবে রাত্রে একেবারে ঘুম আসতো না সেই ছেলেটার। কেবল ভাবতো—তাহলে কি তার লেখক হওয়া হবে না? শেষকালে তারও কি তাহলে গ্রেমাল্ডীর মতো দশা হবে?

গ্রামের বাড়ির বাইরের ঘরে একদিন এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলা বসে ছিলেন। এমন সময়ে একজন পোস্টম্যান একটা চিঠি দিয়ে গেল তাঁদের হাতে। ভদ্রলোক প্রথমে ভেবেছিলেন চিঠিটা বুঝি তাঁরই। কিন্তু না। চিঠিটাতে তাঁদের ঠিকানাটা আছে ঠিকই, কিন্তু চিঠিটার ওপর লেখা রয়েছে তাঁদের আট বছর বয়েসের ছেলের নাম। আশ্চর্য ঘটনা। তাঁদের আট বছর বয়সের ছেলেকে কে চিঠি লিখতে গেল। পত্রলেখকের নামটা দেখেই ভদ্রলোক হতবাক। চিঠিটা তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—দেখ দেখ, খোকাকে কে চিঠি লিখেছেন, দেখ—

—কে?

ভদ্রলোক বললেন—লিও টলস্টয়—

লিও টলস্টয়! হাতের মুঠোয় চাঁদ পেলে মানুষের মনের যেমন অবস্থা হয়, তাঁদেরও ঠিক তাই হল। আট বছর বয়সের ছেলেকে চিঠি লিখেছেন কিনা পৃথিবী-বিখ্যাত লেখক কাউণ্ট লিও টলস্টয়!

চিঠিটার মোড়কটা ছিঁড়ে ফেলতেই ভেতরের চিঠিটা বেরিয়ে পড়ল। চিঠির নিচেয় সত্যিই লিও টলস্টয়ের নিজের স্বাক্ষর! তিনি লিখেছেন:

SBRYOJHA YERMOLWISKEY

SNEGOVAYA STREET, St. 7. FLAT NO-1 VILLINUS YASANAYA POLYANA.

March 25, 1909

Your wish to become a writer is a wicked wish, for it means that you want worldly fame for yourself. It is just wicked vanity. One should have only one desire to be kind, not to offend. not to censure and not to hate anyone, but to love everybody.

Lev Tolstoy

অর্থাৎ টলস্টয় বলতে চান—'তোমার লেখক হওয়ার ইচ্ছেটা হচ্ছে বদ ইচ্ছে, কারণ এর থেকে বোঝায় যে নিজের জন্যে তুমি জাগতিক নাম-খ্যাতি চাও। এও এক রকমের পাপ, এও এক রকমের দম্ভ। অন্যের প্রতি দয়ালু হওয়া, কাউকে আঘাত, নিন্দে বা ঘৃণা না করা। বরং তার বদলে সকলকে ভালোবাসা—এইটেই সব মানুষের একমাত্র কামনা হওয়া উচিত—'

ছেলেটির বাপ-মায়ের খুব আনন্দ। তাঁরা তো কৃতার্থ হয়ে গেছেন! তাঁদের ছেলেকে টলস্টয় নিজের হাতে চিঠি লিখেছেন এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে।

ছেলেটি স্কুল থেকে এলে তাকেও চিঠিটা দেওয়া হ'ল। সেও চিঠি পড়ে অভিভূত! তার মত ছেলের একদিন কী মতিভ্রম হয়েছিল কে জানে। বাঁকা-চোরা অক্ষরে বানান-ভর্তি হাতের লেখা চিঠিটা কাউন্ট টলস্টয়কে পাঠিয়েছিল, আর সেই চিঠিরই কিনা উত্তর দিয়েছেন তিনি! এ যে এক অভাবনীয় ঘটনা!

কিন্তু চিঠিটা বারবার পড়েও সেই গ্রামের ছেলেটি মানে বুঝতে পারলে না। ডাক্তার হওয়ার মধ্যে কোনো অপরাধ নেই, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার মধ্যে কোনও অপরাধ নেই, আর্মি বা নেভিতে সৈন্য হওয়াতেও কোনও দোষ নেই, যত দোষ হল লেখক হওয়াতে! তাহলে লেখক হওয়ার মধ্যেই কি যত দোষ লুকিয়ে আছে?

কথাটা ভাববার মত। ছেলেটা তখন গ্রামের মধ্যে বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছে, গ্রামের সব ছেলেমেয়েদের বাবারা ওর দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়। বলে—ওই দ্যাখ, ওই সেই ছেলেটা···

তারপর থেকে গ্রামের যত ছেলেমেয়ে ছিল সকলেই একটা করে চিঠি লিখতে লাগলো টলস্টয়কে। খুব ভাল কাগজে, স্পষ্ট অক্ষরে, ভাল কালিতে চিঠি লিখে পাঠাতে লাগলো তারা। কিন্তু হায়, কেউই তাদের চিঠির কোনও উত্তর পেলে না। কারণ তখন টলস্টয়ের যে মানসিক অবস্থা তা মৃত্যুর চেয়েও মর্মান্তিক। আর একদিন ১৯১০ সালে ৭ই নভেম্বর ভোর ছ'টা পাঁচ মিনিটে বিরাশি বছর বয়েসে তিনি বেঘোরে দেহত্যাগ করলেন।

কলকাতায় সেই ছেলেটা যখন খবরের কাগজের পাতায় এই খবরটা পেল তখন তারও মনে হ'ল তাহলে কিসের জন্যে লেখা? খ্যাতির জন্যে নয়? অর্থের জন্যের নয়? প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়? তা যদি না হয় তো সে কিসের জন্যে লিখবে? যদি অর্থের জন্যে না হয় তো কী খেয়ে সে বাঁচবে? টলস্টয়ের না হয় অনেক পৈতৃক সম্পত্তি ছিল তাঁর আয় থেকেই তাঁর গলগ্রহদের ছাড়াও সংসারের আটত্রিশ জন মানুষের ভরণ-পোষণ নির্বাহ হত। কিন্তু সেই ছেলেটার তো সে সুযোগ নেই। তাহলে সে কী খাবে? কী খেয়ে সে বাঁচবে? খাওয়া, তা সে যত সামান্যই হোক তাকে তো বেঁচে থাকতে হবে। খেয়েপরে বেঁচে থাকতে গেলে যেটুকু অর্থের প্রয়োজন সেটুকু অর্থ উপার্জন করাও কি তাহলে অন্যায়?

তখনকার দিনে বেশির ভাগ লোকের বাড়িতেই খবরের কাগজ কেনা হত না। বা খবরের কাগজ কেনার সামর্থ্য সকলের ছিল না। যদিও

খবরের কাগজের দৈনিক দাম ছিল মাত্র চার পয়সা। কিন্তু যদিই বা কোনো কোনও বাড়িতে খবরের কাগজ আসতো তো তাও বাংলা দৈনিক-পত্র নয়, ইংরেজি। ইংরেজি দৈনিকপত্র বাড়িতে কেনার মূল কারণ বাড়ির ছেলেদের ইংরেজি জ্ঞান বাড়ানো। ইংরেজ আমল তখন। ইংরেজিতে ভাল জ্ঞান থাকলে ইংরেজদের অফিসে চাকরি পাবে তারা। শুধু ইংরেজি জ্ঞানই নয়, ইংরেজি হাতের লেখাও ভাল হওয়া চাই। তাতেই বাঙালি ছেলেদের মোক্ষলাভ হয়ে যাবে। পোস্টাফিসে, রেলওয়ে, বা প্রাইভেট সেক্টরে গড় মাইনের সূত্রপাত হচ্ছে মাসিক পনেরো টাকা থেকে তিরিশ টাকার মধ্যে। তাতেই দোল-দুর্গোৎসব—সবকিছু সচ্ছন্দে নির্বাহ হওয়ার পক্ষে কোনও অসুবিধে হত না। পুরনো বৃদ্ধ লোকদের কাছে শোনা কথা যে যাঁরা তখন কলকাতার মেসে থেকে চাকরি করতেন এবং সপ্তাহে একদিন দেশের বাড়িতে যেতেন, তাঁদের মেসে থাকা-খাওয়া বাবদ মোট খরচ পড়তো পাঁচ টাকা। তার মধ্যেই আবার পূর্ণিমা-একাদশীতে খাঁটি ঘিয়ে ভাজা লুচি আর তরকারি বরাদ্দ হত।

সেই ছেলেটার গৃহ-শিক্ষক যাই বলুন লিখে অর্থ উপার্জন করা তখন তার পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না। 'প্রবাসী' পত্রিকায় তখন একটা ছোট গল্পের জন্যে আঠারো টাকা পাওয়া যায়। একটা দশ লাইনের গান লিখে পাওয়া যায় বারো টাকা। স্কটিশচার্চ কলেজের সামনে একটা চায়ের দোকানের সামনে লাল শালুর কাপড়ের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা ঝোলে—'পাঁচ পয়সায় ডবল ডিমের ওমলেট।' এক কাপ চায়ের দাম এক পয়সা। সুতরাং এই সব দেখেই অনুমান করা যায় শুধু লিখে সেই আয়ে সংসার চালানো সম্ভব। সেই ছেলেটা কি লিখে মাসে পঁচিশ টাকাও উপার্জন করতে পারবে না ? বিশেষ করে চা-পান-সিগারেট-বিড়ি-মদ কোনও কিছুরই নেশা যখন নেই সেই ছেলেটার ?

বাড়িতে কাঁচের আলমারির ভেতরে সার সার বই সাজানো থাকে। সব সোনার জলে নাম লেখা চামড়ায় বাঁধানো বই। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত সকলেরই বই। তবে দূর থেকে শুধু নামগুলো পড়ো কিংবা দেখ। সেগুলো কারো ছোঁবার অধিকার নেই। আলমারির পাল্লা চাবিবন্ধ। কারণ ওসব বাংলা নভেল-নাটক পড়লে ছেলেটার বারোটা বেজে যাবে। কিন্তু ইংরেজি নভেল ? ওগুলো পড়লে তোমার ইংরেজি জ্ঞান বাড়বে, ভাল চাকরি পাবে। তাতে আমাদের কারো আপত্তি নেই।

বাড়িতে তখন যে দৈনিক পত্রিকাটি রোজ আসে তার নাম ''ফরোয়ার্ড।'' সেই ফরোয়ার্ড পত্রিকায় প্রতি মাসে একবার করে একটি খবর থাকে। অন্যান্য সমস্ত সত্যি খবরের পাশে সে খবরটি এমনভাবে ছাপা হত যাতে মনে হয় সংবাদের সবটাই বুঝি সত্যি।

খবরটা একটা নতুন মাসিক পত্রিকার। মাসিক পত্রিকাটির নাম 'কল্লোল'।

সংবাদদাতার মতে সেই মাসের যে 'কল্লোল' প্রকাশিত হয়েছে তাতে বরাবরের মত প্রকাশিত হয়েছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি গল্প—যা বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগ্‌দর্শন। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা—যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। এবং পর পর প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, যুবনাশ্ব প্রভৃতির লেখার ভূয়সী প্রশংসা। নিচেয় সংবাদদাতার নাম হিসেবে ছাপা থাকত একটি ছদ্মনাম—'S.P.B.'।

কে এই 'এস পি বি' তা তার জানা ছিল না। কিন্তু ছাপার অক্ষরে যখন তা ছাপা হয়েছে খবরটা নিশ্চয়ই সত্যি! তা না হলে ইংরেজি খবরের কাগজে ছাপবে কেন?

বাবামায়েদের সঙ্গে রথের মেলায় গিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন চারদিকে যা কিছু দেখে তাইই কেনবার জন্যে ছটফট করে বায়না ধরে, সেই ছেলেটারও ঠিক সেই দশা হ'ল। সেদিন সেই ছেলেটাও গুরুজনদের কাছে বায়না ধরে বসলো যে ওই পত্রিকার সে বার্ষিক গ্রাহক হবে।

অভিভাবক আপত্তি জানিয়ে বললেন—ওসব ছাইপাঁশ কিনে কী হবে? ও শুধু শুধু পয়সা নষ্ট—

না। ছেলেটা বললে—কাগজে যখন ছাপা হয়ে বেরিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই সব সত্যি কথা। ওটা কিনে দিতেই হবে—খবরের কাগজে কি কখনও মিথ্যে কথা লেখে?

সেই ছেলেটার আজও মনে আছে সেইসব দিনের কথা। পুরো তিন-টাকা দিয়ে সে বার্ষিক গ্রাহক হ'ল 'কল্লোলে'র। সেটা বোধহয় তেরশ' ছত্রিশ কি সাইত্রিশ সালের কথা হবে।

তারপর থেকে প্রতি মাসে নিয়মে বেনিয়মে পত্রিকাটা পোস্টে বাড়িতে এসে পেঁছিয়। কিন্তু সমস্ত পত্রিকাটা পড়ে মনে হয় যেন 'S. P. B.' তাকে গো-ঠকান ঠকিয়েছে। প্রতি সংখ্যায় ওই একই সব লেখকদের লেখা ছাপা হয়। তবু কেবল জগদীশ গুপ্ত এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তারই

মধ্যে যা হোক একটু চলনসই। মেলায় যেমন খাঁটি ময়াল সাপের চর্বিতে ভাজা সিঙ্গাড়াকে খাঁটি ঘিয়ে ভাজা সিঙ্গাড়া বলে চালানো হয়, এও তেমনি। 'S.P.B.' যেন সেই ছেলেটার গালে চড় মেরে এমন করে তিনটে টাকা ঠকিয়ে নিলে। কিন্তু যা হোক তখন সেই ছেলেটার খুবই শিক্ষা হয়ে গেছে। আর বাংলা পত্র-পত্রিকা নয়! আর বাংলা উপন্যাস গল্প নয়। শুধু এমন বই পড়তে হবে যা বিজ্ঞাপনের জোরে নয় নিজের প্রাণশক্তির জোরে বহুকাল বহু যুগ ধরে টি'কে আছে। প্রচারে আর সেই ছেলেটা ভুলছে না। শুধু যে ভুলবে না তা নয়। নোবেল প্রাইজেও সে ভুলবে না আর। নোবেল প্রাইজেও তো ভেজাল আছে। কারণ নোবেল প্রাইজেও যে ভেজাল আছে টলস্টয় নিজেই তো তার প্রমাণ। ১৯০১ সাল থেকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। সেই সালই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান সালি প্রুধোমে। আর ১৯০৪ সাল পর্যন্ত চেখভ্ বে'চে ছিলেন, আর ১৯১০ সাল পর্যন্ত বে'চেছিলেন টলস্টয়। কিন্তু তাঁদের দু'জনের কেউই ওই পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন না। কিন্তু কে মনে রেখেছে সেই প্রথম নোবেল পুরস্কার পাওয়া কবি সালি প্রুধোমেকে।

তাহলে পৃথিবীর সব দেশেই কি 'S.P.B.'রা ক্রিয়াশীল?

কলেজে ভর্তি হয়েই তাই সে ধর্মতলার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে মেম্বার হ'ল। এবার থেকে সেই ছেলেটা টলস্টয় পড়বে, ডিকেন্স পড়বে, রম্যাঁ র'ল্যা পড়বে, আপটন্ সিনক্লেয়ার পড়বে, ডস্টয়েভস্কি পড়বে, মোপাসাঁ পড়বে, চেখভ্ পড়বে, গোগোল পড়বে, ফ্লবেয়ার পড়বে, রুশো পড়বে······

তাই সে টলস্টয় দিয়েই প্রথম শুরু করলে। টলস্টয়ের লেখা আত্ম-জীবনীর মধ্যেই পেল তাঁর গুরু রুশোর নাম। শেষের দিকে সারা জীবন টলস্টয় গলায় একটা মালা পরে থাকতেন। মালার লকেটে আঁটা থাকত রুশোর ছবি। সেই রুশোর কুড়ি ভলিউম বই থেকেই টলস্টয় একটা শিক্ষা পেয়েছিলেন। সেই শিক্ষাটা হচ্ছে এই যে যদি মানুষের উন্নতি সাধন তোমার কাম্য হয় তাহলে সকলের আগে তুমি নিজেকে শোধরাও, সকলের আগে তুমি নিজের উন্নতি-সাধন করতে চেষ্টা কর।

টলস্টয়ের সমগ্র সাহিত্য এই নিজেকে সংশোধন করবারই রক্তাক্ত দলিল। তা এত লেখক থাকতে টলস্টয় কেন রুশোর শিষ্য হলেন? রুশো কে?

রুশোর কথা বলবার আগে আর একজনের কথা বলে নিই। তিনিও রুশোর একজন ভক্ত শিষ্য।

১৮১১ সালের ২০ নভেম্বর। বার্লিন শহর থেকে অনেক দূরে লেকের ধারে একটা ছোট হোটেলে এসে উঠেছিলেন একজন ভদ্রলোক আর একজন ভদ্রমহিলা। সারাদিন দু'জনে নৌকো চড়ে বেড়ালেন। খুব হাসিখুশি মানুষ দু'জনেই। সারারাত তাঁদের ঘরে আলো জ্বললো। পরদিন সকালেও তাঁরা কফি খেয়ে লেকে নৌকোয় চড়ে বেড়ালেন। তারপর আবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আর তারপর হঠাৎ দুম-দুম করে দু'বার পিস্তল ছোঁড়ার আওয়াজ হ'ল। শব্দ শুনে লোকজন দৌড়ে এলো। তারা ঘরের দরজা ভেঙে যখন ভেতরে ঢুকলো তখন দেখলো মহিলাটির বুকের কাছ দিয়ে দর দর করে রক্ত ঝরে পড়ছে। আর রক্ত ঝরে পড়ছে ভদ্রলোকটির গলা দিয়ে।

দুজনেই তখন মৃত।

কিন্তু এঁরা কারা?

সেই ছেলেটাও জানত না এঁরা কারা। কারণ ছেলেটার জন্মের প্রায় একশো বছর আগেকার ঘটনা এটা। কিন্তু জানতে পারল লাইব্রেরিতে গিয়ে। যখন পৃথিবী হু হু করে এগিয়ে চলেছে, যখন সবাই ফুটবল খেলা নিয়ে মেতে আছে, যখন সবাই তাস খেলা নিয়ে রাত কাবার করে দিচ্ছে, চাকরির চেষ্টায় আকাশ-পাতাল তোলপাড় করে মরছে, টাকা উপায়ের চেষ্টায় স্বর্গ নরক পর্যন্ত ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছে, তখন সেই ছেলেটা কিন্তু অন্য আর এক জগতে বাস করছে।

আর আশ্চর্য সে-জগৎ, কিন্তু তার নিজের বলতে কোনও স্থান নেই। তার কথা শোনবার কোনও লোক নেই। আসলে সে প্রাপ্তবয়স্ক হলেও বলতে গেলে তার কোনও ভোটই নেই। এক কথায় সে একলা। সে কুনো।

তাহলে তার মনের কথা সে কাকে বলবে ?

তাই তার মনের কথাগুলো সে কাগজে লিখে ফেলতে লাগল। কখনও লেখে কবিতায় আর কখনও বা লেখে গল্পের আকারে। আর সেগুলো সে পোস্টাফিসের মারফত পাঠায় বিভিন্ন পত্রিকায়। কখনও মাসিক 'বসুমতী'তে, 'ভারতবর্ষ'তে, আর কখনও বা তখনকার দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'তে।

আড়াই কিলোমিটার পথ ভবানীপুরের জগুবাবুর বাজারের সামনে দেওয়ালের গায়ে লাগানো একটা পত্রপত্রিকার স্টল ছিল। তার মালিক ছিল অবিনাশ। সারা কলকাতার মধ্যে ওইটেই ছিল পত্রপত্রিকার প্রথম ওয়াল-স্টল। সেই মাসের 'প্রবাসী'টা খুঁজে দেখতে হবে তাতে সেই ছেলেটার লেখা বেরিয়েছে কিনা।

বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে দোকানের মালিক অবিনাশ আবার আপত্তি করে—খোকা, কিনবে ?

না, বেরোয়নি। অবিনাশের ভয়ে পত্রিকাটা আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। রাস্তার বাঁ দিকের একটা দোতলা বাড়ির ওপরে 'কটেজ লাইব্রেরি', ওখানেও একটাকা দিয়ে মেম্বার হয়েছে সে। ও লাইব্রেরিতেও অনেক বিদেশী বই আছে।

রুশোর দুজন শিষ্য। একজন তো টলস্টয়, অন্যজনের নাম হাইনরিখ্ ক্লাইস্ট্। সেই 'কটেজ লাইব্রেরি'তেই দেখা হল ক্লাইস্টের সঙ্গে।

সেই ছেলেটার মতো ক্লাইস্টও ছিল বড় একলা। বড় ঘরকুনো। সেও বড় হয়ে লেখক হতে চেয়েছিল। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কেরানি বা দোকান-দার কিম্বা রিকসাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, জুতো সেলাই করা মুচি পর্যন্ত হতে গেলে তোমাকে কেউ বাধা দেবে না, কেউ তোমায় তেমন শত্রুতা বা ঈর্ষা করবে না, কেউ তোমার গায়ে একটু আঁচড়ও কাটবে না।

কিন্তু লেখক হতে চাইলে ?

ওটি হতে চেয়ো না। ওটি হতে চাইলে আমরা তোমার মাথায় গাঁট্টা মেরে বসিয়ে দেব ! তুমি পাখার তলায় বসে আরাম করে গদ্য-পদ্য লিখবে আর সবাই তোমায় বাহবা দেবে, সবাই তোমায় ফুলের মালা দিয়ে সম্বর্ধনা দেবে, সবাই তোমায় নোবেল প্রাইজ দেবে, এটি আমরা বরদাস্ত করব না। তোমার বই যদি আবার আমাদের বই-এর চেয়ে বেশি বিক্রি হয় সেটি আমরা সহ্য করব না।

এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য' নামে একটি সনেট সবাই-ই পড়েছেন। মহাকবি কালিদাসকে উদ্দেশ্য করে তিনি সনেটটি লিখে গিয়েছেন। তা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক ঃ

"তবু কি ছিল না তব সুখ দুঃখ যত
আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরই মতো
হে অমর কবি। ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা ষড়চক্র, আঘাত গোপন।
কখনও কি সহ নাই অপমানভার
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
অভাব কঠোর ক্রূর, নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি"...

লেখকের জীবনের যে যন্ত্রণা, ক্যানসারের যন্ত্রণা তার তুলনায় বলতে গেলে কিছুই নয়। ক্যানসারের যন্ত্রণা তবু ভুলিয়ে দেওয়া যায় রোগীকে কড়া ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে রেখে। কিন্তু লেখকের যন্ত্রণা? তার যন্ত্রণা ভোলাবার ওষুধ কবে আবিষ্কার হবে? আর লেখকের শত্রু কি একটা? 'আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব', 'রাজসভা ষড়চক্র', 'আঘাত গোপন', 'অপমানভার', 'অনাদর', 'অবিশ্বাস', 'অন্যায় বিচার', 'অভাব কঠোর ক্রূর', 'নিদ্রাহীন রাতি'—এতগুলো শত্রুর সঙ্গে যদি লড়াই করতে তৈরি থাকো তবেই সাহিত্যক্ষেত্রে এসো, নইলে অন্য লাইনে গিয়ে টাকা উপায় করে মরোগে, আমরা তাতে কিছু আপত্তি করব না। আর সম্পাদক নিজে যদি একজন লেখক হয় তাহলে তো পোয়া বারো। তাহলে আর কারো লেখক হওয়ার আশা নেই। আরে, এই লেখকটা দেখছি আমার চেয়েও ভাল লিখেছে। এর এই লেখা যদি আমি ছাপি তাহলে এ লোকটা তো আমার চেয়ারটাও একদিন টলিয়ে দিয়ে ছাড়বে। তাহলে কি আমি দুধ-কলা দিয়ে ঘরে সাপ পুষবো? আমি অত বেকুব নই। সুতরাং ওই লেখকের লেখা 'অমনোনীত' করে যথা-ঠিকানায় ফেরত পাঠাও।

তবে হ্যাঁ, লেখক-সম্পাদকের যদি মদের ওপর দুর্বলতা থাকে তো তোমার খুব সুবিধে। তুমি গাঁটের পয়সা খরচ করে তাঁকে মদ খাওয়াও, যথাসাধ্য ইনভেস্ট কর তাহলে যথাসময়ে তার যথাযোগ্য ডিভিডেন্ড পাবেই।

কিন্তু 'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর এ রোগ ছিল না।

তিনি অন্য ধাতের মানুষ। তিনি মদ তো খেতেনই না, ডাকে পাঠানো লেখাও তিনি নিজে পড়তেন না। তাঁর সহকারি ছিলেন ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাশ, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, নলিনীকুমার ভদ্র প্রভৃতি অনেক লোক। তাঁদেরও তা পড়তে দিতেন না। লেখাগুলো অফিসে পৌঁছলেই সেগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হতো তাঁর বাড়িতে। সেখানে তাঁর দুই মেয়ে, সীতা দেবী আর শান্তা দেবী ছিলেন, তাঁদেরই ওপর ছিল লেখা মনোনয়নের ভার। সেখানে সেই পর্দানশীন যুগে ধরাধরি বা তোষামোদ কিম্বা মদ খাইয়ে কার্যসিদ্ধি করবার সুযোগই ছিল না।

সেদিনও সেই ছেলেটা জগুবাবুর বাজারে অবিনাশের দোকানে গিয়ে, হঠাৎ আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেল। তার পাঠানো গল্প সেই সংখ্যার 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছে। এতো এক আশ্চর্য ব্যাপার।

কার কাছ থেকে শোনা ছিল যে 'প্রবাসী'তে যে কোনও গল্প ছাপা হলেই পাতা পিছু তিন টাকা প্রণামী দেওয়া হয়। ছ'পাতার লেখা হলেই আঠারো টাকা। কিন্তু তার বেশি পাতা হলেও ওই একই প্রণামী।

কিন্তু শোনা কথার ওপরে বিশ্বাস নেই। পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তাই একদিন সাইকেলে চড়ে চলে গেল 'প্রবাসী'র অফিসে। নব্বুই নম্বর আপার সার্কুলার রোডে। উঠোনে সাইকেলটা তালাচাবি লাগিয়ে দোতলায় গিয়ে ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

—কী চাই ?

সেই ছেলেটা বললে—এই সংখ্যার 'প্রবাসী'তে আমার একটা লেখা ছাপা হয়েছে. তাই···

—কার লেখা ? তোমার দাদার ?

—না, আমার নিজের লেখা—

ব্রজেনবাবুর গম্ভীর মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে গেল। যেন পারলে তিনি এক ঘুষিতে সেই ছেলেটার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতেন। কিন্তু তা বোধহয় তখন তাঁর এক্তিয়ারে ছিল না। তাড়াতাড়ি, একটি স্লিপ তুলে নিয়ে ঘস্ ঘস্ করে কী লিখে ছেলেটার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। বললেন —এইটে নিয়ে নিচেয় কেদারবাবুকে দাও—যত্তো সব···

নিচের একতলায় রামানন্দবাবুর বড় ছেলে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসে ছিলেন। স্লিপটা তাঁকে দিতেই তিনি গুণে গুণে মোট আঠারোটা টাকা হাতে দিলেন। সেই ছেলেটার মনে তখন কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা এতদিন পরে আর তার মনে নেই। কিন্তু আজকে

কোনও আঠারো বছরের ছেলের হাতে যদি হঠাৎ আটশো টাকা দেওয়া হয় তাহলে তার মনের অবস্থা যা হয় সেই ছেলেটার মনের অবস্থা তাই-ই হয়েছিল।

হায়, সেই ছেলেটা তখনও জানত না তার কপালেও কত 'আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব', কত 'আঘাত গোপন', কত 'অপমান ভার', কত 'অনাদর', 'অবিশ্বাস', 'অন্যায় বিচার', 'অভাব কঠোর ক্রুর', 'নিদ্রাহীন রাতি' অপেক্ষা করে আছে!

যদি কেউ তা জানতে চান তো তিনি যেন জার্মানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হাইনরিখ ক্লাইস্টের জীবনী পড়েন।

ক্লাইস্টের মা বাবা দু'জনেই তখন মারা গেছেন। লেখক হওয়ার আশায় ক্লাইস্ট তখন মিলিটারির সরকারি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে। রুশোর বই পড়ে তার মনে হয়েছে জীবনের সাতটা বছর তার নষ্ট হয়েছে। কিন্তু আর নয়, আর সে জীবনকে নষ্ট হয়ে যেতে দেবে না। চাকরি করা মানেই হ'ল জীবন অপচয় করা। তা থেকে তার মুক্তি চাই।

চাকরি ছেড়ে দিয়ে ক্লাইস্ট অমানুষিক পরিশ্রম করতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যে বেশি লিখে খ্যাতি পাওয়ার উচ্চাশা তাঁকে পাগল করে তুলল। তাঁর কোনও দল নেই, তাঁর কোনও বন্ধু নেই, তাঁর কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী নেই। বন্ধুরা বলত—ওর দ্বারা কিস্যু হবে না।

সত্যিই যাকে কিছু হওয়া বলে তা কখনও তাঁর হয়নি। যে মানুষ জীবনে সাকসেসফুল তারই মোসাহেব জোটে, তারই চাটুকার জোটে, পদলেহীর দল তাকেই সবসময় ঘিরে থাকে।

কিন্তু ক্লাইস্টের মহা সৌভাগ্য যে তিনি সাকসেসফুল লেখক হননি। হলে তাঁরও মোসাহেব জুটত। তাঁরও চাটুকার জুটত, তাঁকেও পদলেহীর দল সবসময় ঘিরে থাকত। তাহলে তিনি আর অপ্রিয় সত্য লিখতে পারতেন না। তাহলে আর তিনি বিশ্ব-সাহিত্যে অমর হতে পারতেন না।

মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সের পরমায়ু। সেই চৌত্রিশ বছরের পরমায়ু নিয়েই তিনি যা করে গেলেন আশি বছরের পরমায়ু নিয়েও তা কেউ করতে পারেননি। তাঁর একমাত্র কামনা ছিল জার্মান সাহিত্যের গ্যেটে আর শীলারের পায়ের তলায় তিনি একটু ঠাঁই পাবেন। জার্মানিতে গ্যেটে আর শীলার তখন বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের মত দুই উজ্জ্বল স্তম্ভ। তাঁরা তাঁকে সেই সম্মান দেননি। ক্লাইস্ট তাঁর প্রথম

নাটক ‘পেনথেসিলিয়া’ গ্যেটেকেই পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু গ্যেটে তার প্রাপ্তির স্বীকৃতিটুকু পর্যন্ত দেননি।

যেকোন মেয়ের সঙ্গেই ক্লাইস্ট মিশেছেন, তাকেই বলেছেন—তুমি আমার মৃত্যুতে একটু সঙ্গ দেবে? আমার জীবনের সঙ্গে তোমার জীবন মেলাতে বলছি না, আমি চাই তুমি শুধু আমার মৃত্যুর সঙ্গে তোমার মৃত্যু মিলিয়ে দাও—দেবে?

কে এমন পাষান আছে যে ক্লাইস্টের এই কথায় রাজি হবে? তার প্রস্তাব শুনে সবাই ভয় পেয়েছে, ভয় পেয়ে সবাই তাকে পরিত্যাগ করছে।

কিন্তু একজন মেয়ে তার প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হ'ল। আগে ক্লাইস্ট যে অফিসে চাকরি করত সেই অফিসের এ্যাকাউনটেন্টের স্ত্রী হেনরিয়েটা। তখন হেনরিয়েটা ক্যানসার রোগে আক্রান্ত। ক্লাইস্টের অনুরোধে এক কথায় রাজি হতেই দু'জনে বার্লিন শহর থেকে অনেক দূরে একটা হোটেলে উঠে খুব আনন্দে একটা দিন কাটালো। আর তার পর দিনই পিস্তলের গুলিতে দুটো জীবন শেষ হয়ে গেল।

খবরের কাগজে যখন খবরটা পরের দিন ছাপা হ'ল তখন ক্লাইস্টের যত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-শত্রু ছিল তারা সবাই ‘ছি-ছি’ করে উঠল। লজ্জায় তাদের মুখ-চোখ কালো হয়ে গেল। কেউ ক্লাইস্টের নাম উচ্চারণ করলে তারা বলত—ওর নাম আমাদের সামনে উচ্চারণ করবে না। ও একটা অপদার্থ, ও বংশের কুলাঙ্গার। তাই যার কাছে তাঁর যত চিঠিপত্র, অপ্রকাশিত রচনা ছিল সবকিছু তারা পুড়িয়ে ছাই করে ফেললে।

তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পরে তাঁর নাটক ‘প্রিন্স অব্ হামবুর্গ’ ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর প্রায় একশো বছর পরে তাঁর সমস্ত রচনাবলী চার খণ্ডে প্রকাশিত হওয়ার পর সমালোচকরা উচ্ছ্বসিত হয়ে বিস্মৃতির অতল গর্ভ থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন। তখন তাঁর ‘আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব’, ‘আঘাত গোপন’, ‘অপমান ভার’, ‘অনাদর’, ‘অবিশ্বাস’, ‘অন্যায় বিচার’, ‘অভাব কঠোর ক্রুর’, ‘নিদ্রাহীন রাতি’—সব কিছু সার্থক হ'ল। গ্যেটে, শীলার বা জার্মানির মানুষ ক্লাইস্টকে যে সম্মান দেয়নি, একশো বছর পরে সেই দেশেরই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক টমাস মান তাই দিলেন। তিনি লিখলেন—“He was one of the greatest, boldest, and most ambitious poets Germany has produced, a play-wright and story-teller of the first order; a man unique in every respect, whose

achievements and career seemed to violate all known codes of patterns''.

জার্মানির আর একজন প্রতিভাধর সাহিত্যিক ফ্রানজ কাফকা স্বীকার করে গেছেন যে ক্লাইস্টের কাছ থেকেই তিনি তাঁর লেখার প্রেরণা পেয়েছেন।

লেখাগুলো পড়ে সেই ছেলেটা আশ্বস্ত হ'ল। তাহলে তো তার হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। তাহলে জীবন দিলে জীবন তো পাওয়া যায়। সে কি সাহিত্যের জন্যে তুচ্ছ জীবনটাও দিতে পারবে না ?

১৭৫০ সালে ফ্রান্সে একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা হয়েছিল। প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার বিষয়টি ছিল নতুন ধরনের। "Has the progress of the sciences and arts contributed to the improvement or deterioration of the human-kind''.

অর্থাৎ "বিজ্ঞানে এবং শিশপকলায় যে এত উন্নতি হয়েছে তাতে মানুষের পক্ষে কল্যাণ হয়েছে না মনুষ্যত্বের অবমূল্যায়ণ ঘটেছে !"

বিষয়টি আজ এই প্রায় একশো বছর পরেও মনে হয় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ চাঁদে পদার্পণ করেছে। হিরোশিমায় অণুবোমা ফেলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করাও সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, নিজের শারীরিক সম্ভোগের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই মানুষের করায়ত্ব হয়েছে। একদিন ষোড়শ শতাব্দীতে আকবর বাদশা যে-আরামের কল্পনাও করতে পারেননি, আজকালকার যুগের একজন মধ্যবিত্ত মানুষ সেই আরাম ভোগ করতে পারছে। কলকাতার বাড়িতে বসে ব্রেকফাস্টের টেবিলে ক্যালিফোর্নিয়ার আপেল, ব্রেজিলের কফি, ইরাকের খেজুর, বেলুচিস্থানের আঙুর খাওয়া খুবই সাধারণ ঘটনা। এত বিলাস-বৈভব এত আরাম-আয়েশ যে সম্ভব হয়েছে সে কেবল একমাত্র তো বিজ্ঞানের কল্যাণেই।

কিন্তু মানুষ ? মানুষ কি মানুষ হয়েছে ?

সেনেকারের একটা কথা আছে —'Since learned men have appeared, good men have become rare : অর্থাৎ 'যেদিন থেকে শিক্ষিত লোকের

সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করেছে, সেইদিন থেকেই ভালো মানুষদের সংখ্যা দুষ্প্রাপ্য হতে আরম্ভ করেছে।'

কথাটা কি একেবারেই অসত্য ?

ছোট বেলাতে সেই ছেলেটাও দেখতে পেতো চারদিকের সমস্ত লোকজন কেবল টাকাকেই মূল্য দেয়। যে-লোক বেশি টাকার মালিক লোকে তাকেই বেশি সম্মান দেয়। বাড়িতে যে-ছেলে বেশি টাকা রোজগার করে বাপ-মা তাকেই আদর করে। যে-ছেলে কম রোজগার করে বাপ-মা তাকে কম খেতে দেয়। ভারতচন্দ্র লিখে গেছেন 'কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কদ্যাপি নয়।' কিন্তু এ-যুগে মায়ের ভালবাসাতেও কি তাহলে খাদ ঢুকেছে ? টাকার কি এতই মহিমা ? ভালবাসাও কি এ-যুগে পণ্য হয়ে দাঁড়ালো ?

ক্রমে ক্রমে বাড়ির ওপর সেই ছেলেটার বিতৃষ্ণা এল। যে-বাড়িতে তাকে কেবল অবহেলা পেতে হয় সে-বাড়ির আকর্ষণ যে সেই ছেলেটার কাছে কমে আসবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বাড়ি তাকে অবহেলা করলে সেই ছেলেটাও তাহলে বাড়িকে অবহেলা করবে। সেও এর প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু কী করে প্রতিশোধ নেবে। অনেক টাকা উপায় করে ? না, টাকা উপায় করে প্রতিশোধ নেওয়াটা ছেলেমানুষী পরিকল্পনা।

সেই অতো কম বয়েসেই সে বুঝে গিয়েছিল যে, যে-টাকার জন্য মানুষ এতো দৌড়ঝাঁপ করে, এতো হানাহানি করে, এতো মারপিঠ করে, যে-টাকার ওপরেই সমাজের মানুষের ব্যারোমিটারে সম্মান, অসম্মানের পারা ওঠা-নামা করে, সেই সমাজটাকেই ভাঙতে হবে। সেই সমাজটাকেই আঘাত করতে হবে।

কিন্তু কী করে আঘাত করবে ?

আঘাত করতে হলে তাকে লেখক হতে হবে। সমাজকে আঘাত করতে গেলে কলমকেই তার হাতিয়ার করতে হবে। 'Money makes a man'—এই কথাটাকেই মিথ্যে প্রমাণ করতে হবে।

এখন প্রশ্ন হ'ল মানুষ যে এমন করে টাকা চায়, এমন করে টাকাকেই পুজো করে, এর কারণ কী ? এর একমাত্র কারণ মানুষ মনে করে টাকা দিয়ে সব কিছু কেনা যায়।

কিন্তু সত্যিই কি টাকা দিয়ে সব কিছু কেনা যায় ? টাকা দিয়ে বিছানা কেনা যায় ঠিকই কিন্তু ঘুম ? ঘুম কি টাকা দিয়ে কেনা যায় ?

টাকা দিয়ে ওষুধ কেনা যায় কিন্তু স্বাস্থ্য কি কেনা যায়? টাকা দিয়ে বাড়ি কেনা যায়, কিন্তু গৃহ-সুখ যাকে বলে তা কি কেনা যায়? টাকা দিয়ে ধর্ম কেনা যায় কিন্তু মুক্তি বা মোক্ষ কি কেনা যায়? টাকা দিয়ে স্নো-ক্রীম-পাউডার কেনা যায় কিন্তু গায়ের কালো রং কি সাদা করা যায়?…

একদিন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক অমলচন্দ্র রায়চৌধুরি ক্লাসে রোল কল করতে করতে ডাকলো—রোল নম্বর সিক্স—

কে একজন যথারীতি উত্তর দিলে—ইয়েস্ স্যার—

—কে রোল নম্বর সিক্স্? কোথায় রোল নম্বর সিক্স্?

তখন আর কেউ সাড়া দেয় না। অধ্যাপক অনেকক্ষণ পর্যন্ত ক্লাসের ছেলেদের মুখের ওপর চোখ বোলালেন। কোথাও রোল নম্বর সিক্স্ নেই। বললেন—দেখো, রোল নম্বর সিক্স্‌কে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বোল তো! আমি তাকে বকবো না, কিছু না। শুধু যেন আমার সঙ্গে একবার দেখা করে।

সেই ছেলেটা তখন সামনের হাজরা পার্কের ঘাসের ওপর বসে বসে অনুপমের ভীমপলশ্রী রাগের গান শুনছে আর তবলার বদলে বই-এর ওপর 'ঠেকা' দিচ্ছে। গানটা গাইছে অনুপম ঘটক। সেই ছেলেটার ক্লাস ফ্রেণ্ড। দু'জনেই প্রক্সির পাকা ব্যবস্থা করে তবে পার্কের নিরিবিলিতে এসে সঙ্গীত চর্চা করছে।

পরের ক্লাসে যেতেই দিলীপ দুঃসংবাদটা দিলে। অধ্যাপক অনুপমের সম্বন্ধে কিছু বলেননি, শুধু বলেছেন সেই ছেলেটার সম্বন্ধে, রোল নম্বর সিক্সের সম্বন্ধে! তাহলে কী হবে! যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই কি সন্ধে হতে হয়! সে ঠিক করলে জীবনে আর হিস্ট্রির ক্লাস করা নয়। কোনও দিনই আর যাবে না সে ক্লাসে। তাতে যা হয় তা হোক।

এর পর অনেক কাল কেটে গেছে। হিস্ট্রি ক্লাসে আর যায় না সে-ছেলেটা। হঠাৎ একদিন এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

কলেজের সামনে একটা বাগানের মধ্যে সেই ছেলেটা আরও কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। পেছন থেকে কখন অমলবাবু ঢুকলেন তা দেখতে পায়নি সে। হঠাৎ একটা কথা তার কানে গেল—রোল নম্বর সিক্স, একবার লাইব্রেরিতে আমার সঙ্গে দেখা কোর তো…

বলতে বলতে তিনি যেমন ভাবে কলেজে ঢুকেছিলেন তেমনি ভাবেই সোজা সামনের দিকে গিয়ে লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়লেন।

সেই ছেলেটার মাথায় তখন বজ্রপাত হয়েছে। প্রথমেই মনে হ'ল তিনি রোল নম্বর সিক্সকে চিনলেন কী করে? কিন্তু সে-সব ভাবনা করবার আর সময় নেই। বুক দুর-দুর করছে, পা কাঁপছে। 'প্রক্সি'র ব্যবস্থা করায় এবার তাকে শাস্তি পেতেই হবে! কিন্তু প্রশ্নটা হ'ল অমলবাবু তাকে চিনলেন কী করে! কলেজে এত ছেলে থাকতে তার মুখটাই বা মনে রাখলেন কী করে? সে তো জীবনে এবং কলেজে বরাবর 'ব্যাক-বেঞ্চার'। সে তো কখনও কারো সামনে যায় না। সে তো আড়ালে থাকতেই বেশি ভালবাসে। সে তো কখনও নিজেকে কারো সামনে জাহির করে না। লিখে নিজেকে জানবার চেষ্টাতেই সে তো বিভোর। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথাটা বললেই ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে—"এই নিস্তব্ধ-প্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ লাজুক নীরব নিশ্চঞ্চল···আমি ইস্কুল পালানো ছেলে পরীক্ষা দিইনি, পাস করিনি, মাস্টার আমার ভাবীকালের সম্বন্ধে হতাশ। ইস্কুল ঘরের বাইরে যে অবকাশটা বাধাহীন সেইখানে আমার মন হা-ঘরেদের মতো বেরিয়ে পড়েছিল···সে হচ্ছে একটি বালক, সে কুনো, সে একলা, সে একঘরে, তার খেলা নিজের মনে।" (আত্মপরিচয়)

আর আশ্চর্য, রুশোও ঠিক তাই। সেই রুশোও 'ইস্কুল পালানো ছেলে','পরীক্ষা দেয়নি','পাস করেনি', তার অভিভাবকও তার 'ভাবীকালের সম্বন্ধে হতাশ', 'হা-ঘরে', 'কুনো', 'একলা', 'একঘরে', 'তার খেলা তার নিজের মনে'। একেবারে হুবহু মিল; কোনও তফাৎ নেই। জন্মের কয়েক বছর পরেই মা মারা গেছে। লেখা-পড়ার কোনও সুযোগই পায়নি সে। মা মারা যাওয়ার জন্য বাবা ছেলের ওপরে ক্ষুব্ধ। যেন তার মায়ের মৃত্যুর জন্য ছেলেই দায়ী। তার বাইরেও তার কোনও বন্ধু নেই, বাড়িতেও সে পর। তাহলে সে বাঁচবে কী নিয়ে?

তাই কাউকে না জানিয়ে একদিন রুশো বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। পেছনে পড়ে রইলো তার জন্মস্থান জেনেভা, পেছনে পড়ে রইলো ঘড়ি মেরামতের মিস্ত্রী, তার বাবা।

তারপর শুরু হ'ল তার সংগ্রাম। কোথাও সে কারো বাড়ি ভৃত্য, কোথাও কোনও বড়লোকের ঘোড়ার গাড়ির সহিস। আরও কত রকমের ঘৃণ্য সব কাজ! আমাকে শুধু দু'টো খেতে দাও, আর কিছু আমি চাই

না। কোথাও একটু স্নেহ, কোথাও প্রহার, আবার কোথাও জামাই-আদর। কোথাও বেশিদিন টিকতে পারে না সে, কিংবা কোথাও টিকতে চায় না। তার মন কেবল বলে 'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনখানে'। চরৈবেতি চরৈবেতি। এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো—

রুশোর মনের কথা তখন রবীন্দ্রনাথের 'অঞ্জলি' কবিতার ভাষায় এই রকম:

> "তোমরা এসেছ এ জীবনে
> কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ বরিষণে।
> কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
> এনেছিল মোর ঘরে, দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা বার বার
> এনেছ প্রাঙ্গণে"...

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারোর কবিতা দিয়ে রুশোর তখনকার মানসিক অবস্থা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। মাদাম ওয়ারেন্স তো তাকে সোনার শেকলে বাঁধতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রুশো? মাদাম বয়েসে তার চেয়ে অনেক বড়ো হলেও তিনি ছিলেন বিধবা এবং রূপসী। এবং অনেক টাকার মালিক। কিন্তু তার রূপ আর টাকার কি এত ক্ষমতা যে রুশোর মতো মানুষকে এক জায়গায় বেঁধে রাখতে পারবে? এও সেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে?'

রুশো বললেন—না, আমি প্যারিসে যাবো।

মাদাম বললেন—প্যারিসে গিয়ে কী হবে? প্যারিসে তো লোকে টাকা উপায় করতে যায়। তোমার যত টাকা লাগে সব আমি দেব—তুমি আমার বাড়িতেই থাকো—

না, রুশো কোথাও বাঁধা থাকতে রাজি নয়। রুশো কারোর একার সম্পত্তি নয়, রুশো সকলের।

শেষ পর্যন্ত মাদাম প্যারিসের একজনের নামে একটা পরিচয় পত্র দিলেন। সেখানা নিয়ে রুশো প্যারিসে চলে এলো। সেখানেই দিন কাটতে লাগলো রুশোর। এক অদ্ভুত জীবন রুশোর। যার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে এক ছাদের তলায় বাস করতে লাগলো তাকে কখনও বিয়ে করলে না। সে একটা হোটেলের ঝি-এর মেয়ে। চারটে ছেলে হ'ল তাদের। একটাকেও বাড়িতে রেখে মানুষ করলে না। চারটি ছেলেকেই গীর্জার দাতব্য-আশ্রমে মানুষ হতে পাঠিয়ে দিলে, ভবিষ্যতে যে মানুষটা সারা

দেশটাকে আগুন জ্বালিয়ে দেবে তার চরিত্রের মধ্যে এই স্ববিরোধিতা একটা বিস্ময়ের বস্তু, এই স্ববিরোধিতা অনেকেরই মধ্যে দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—What is the greatest strength of your character ?

রবীন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছিলেন—Contradictions.

আবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—What is the greatest weakness of your character ?

রবীন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছিলেন—Contradictions.

কিন্তু এ-সব তো পরের কথা। পরের কথা আগে বলছি কেন? তা সেই সময়েই প্যারিসে একটা সরকারি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হ'ল। তার বিষয় বস্তু হ'ল এই যে, 'পৃথিবীতে বিজ্ঞান আর শিল্প-কলার যে এত উন্নতি হয়েছে তাতে কি মানুষের উন্নতি হয়েছে, না অবনতি হয়েছে'? রুশো ঠিক করলেন যে তিনি এই প্রতিযোগিতায় নাম দেবেন। কিন্তু প্রতিযোগিতায় নাম দিলে তো লেখা-পড়া করতে হবে। কোথায় বই-পত্র পাবেন? তাই তিনি প্যারিসের ন্যাশনাল লাইব্রেরি 'বিব্লিওথেক ন্যাশনেলে' গিয়ে বই পড়তে লাগলেন সেইদিন থেকে।

সেদিন রোল নম্বর সিক্সও লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢুকলে, অমলবাবু আসামীর দিকে চেয়ে বললেন—তুমি 'ভারতবর্ষে' একটা গল্প পাঠিয়েছ?

সর্বনাশ! এক পোস্টাফিস ছাড়া আর কারো তো তা জানবার কথা নয়। অমলবাবু সে-খবর কী করে জানলেন?

—তোমার গল্পটা ছাপা হবে। তুমি টাকাও পাবে।

তারপরে একটু থেমে আবার বললেন—কলেজ ম্যাগাজিনে তোমার গল্পটা পড়লাম। ওটা কিন্তু হয়নি। তুমি কিছু মনে কোর না। অচিন্ত্য, প্রেমেন, মনোজ আমার ছাত্র ছিল, তাদেরও আমি ডেকে এই সব কথা বলেছি। তোমাকেও বলছি, কিছু মনে কোর না—

রোল নম্বর সিক্স কী আর বলবে। সেই ছেলেটা যে অচিন্ত্য, প্রেমেন বা মনোজ হতে চায়নি সে কথাটা সে মুখ ফুটে কেমন করে বলবে। তাই শুধু চুপ করে রইলো। কোনও উত্তর দিলে না।

অমলবাবু আবার বললেন। তুমি আমার বাড়িতে একদিন এসো। আমি থাকি ছ'নম্বর স্টেশন রোড, বালিগঞ্জে। সামনের মাসে কলেজে গরমের ছুটি পড়বে। সেই সময়ে—তারপরে একটু থেমে আবার বললেন—দেখ, অনেকে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ে উপলক্ষে আমার কাছে পদ্য লেখাবার

জন্যে আসেন। পদ্য লেখার জন্যে তাঁরা কিছু কিছু টাকাও দিয়ে থাকেন। তাও তোমাকে পাইয়ে দিতে পারি···

এখনও কথাগুলো মনে পড়লে সেই ছেলেটার চোখে জল আসে! সেই ছেলেটাকে তিনি সেদিন কেন অতো ভালবাসতেন? যে ছেলেটা কারোর কাছে ভালবাসা পায়নি, তার জন্যে কেন তাঁর অতো মমতা! সে তো জীবনে কোনওদিন কারো কাছে গিয়ে কোনও আর্জি পেশ করেনি! একমাত্র সে নিজের লেখা পোস্টাফিস মারফৎ সম্পাদকের কাছে পাঠিয়েছে তাঁর পত্রিকায় ছাপাবার জন্যে। সেটা যদি অপরাধ হয় তো সে নিশ্চয়ই অপরাধী। কিন্তু সে তো স্বার্থসিদ্ধির জন্যে বা কার্য উদ্ধারের জন্যে কোথাও কখনও দরখাস্তও করেনি। বা তাঁদের সঙ্গে দেখাও করতে চায়নি। অমলবাবুর কাছেও তো সে কখনও কোনও সুযোগ কোনও সুবিধে আদায় করতে চায়নি। সে তো ক্লাসের 'ব্যাক্-বেঞ্চার'। সে তো 'প্রক্সি'র ব্যবস্থা করে ক্লাসে গরহাজির হওয়ার অপরাধে ধরা-পড়া আসামী। সেই ছেলেটার ওপর তাঁর মতো দেব-পুরুষের কেন এত মমতা?

আর টাকা?

তিনি কেমন করে অনুমান করলেন যে তাঁর 'রোল নাম্বার সিক্স' টাকার প্রত্যাশী? কই কখনও তো সে কারো কাছে তার আর্থিক-অভাবের কথাও বলেনি। বলতে গেলে অর্থ তো তার জীবনে কখনও সমস্যা হয়েও ওঠেনি! অর্থের অভাব কাকে বলে তা সে কখনও জানেনি। অথচ সে তো সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। তার পক্ষে অর্থাভাব হওয়াটাই তো অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল।

তখন বিলিতি জিনিস বয়কটের যুগ। যেমন বিলিতি-কাপড়, বিলিতি-সাবান, বিলিতি-প্রসাধন দ্রব্য, বিলিতি সমস্ত কিছু বর্জনের যুগ। আবার সেটা তখন মদের দোকানে পিকেটিং করে ছেলেদের জেল খাটার যুগও বটে। অথচ সেই ছেলেটা যাদের সঙ্গে মিশতো তারা সবাই মদ খেতো। বিলিতি মদ নয়, দিশি মদ। খবরের কাগজে একবার খবর ছাপা হলো যে হাইকোর্টের চিফ-জাস্টিস স্যার মন্মথ নাথ মুখার্জি সিগারেট ছেড়ে বিড়ি খেতে আরম্ভ করেছেন। বন্ধুরাও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সিগারেট ছেড়ে বিড়ি খাওয়া শুরু করলে। তারা সেই ছেলেটাকেও দিশি মদ আর বিড়ি খেতে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। কিন্তু ভবিষ্যতে যে-ছেলেটা মেসে থেকে মাত্র পঁচিশ টাকা উপার্জন করে সাহিত্যকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করবার সংকল্প করেছে তার পক্ষে ও-সব তো বিলাসিতা। তার

পক্ষে ও-সব বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া তো পাপ।

তারা বলতো—তুই মদ খাস না, সিগারেট বিড়ি খাস না, তোর দ্বারা লেখক হওয়া হবে না। জানিস, বঙ্কিম চাটুজ্জে, শরৎ চাটুজ্জে সবাই মদ খেয়েই লেখক হতে পেরেছে, কথাগুলো সে-ছেলেটার ভালো লাগতো না। কোনও কিছুই তার যেন ভালো লাগতে নেই। তখন থেকে এখন পর্যন্ত বেঁচে থেকে সেই ছেলেটা অনেক কিছু দেখতে পেলে। যারা সেদিন মদের দোকানে পিকেটিং করে জেলে গিয়েছিল তারাই আবার একদিন মদ খেতে লাগলো, সেটাও সেই ছেলেটা দেখলে। আর তারাই আবার পরবর্তীকালে একদিন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'ফ্রীডম্ ফাইটারস্ পেন্শন্' পেতে লাগলো। সেটাও সে দেখছে এখন।

সেই ছেলেটা কিন্তু তার সেই লেখার বদ-অভ্যেস আর জীবনে ছাড়তে পারলে না। টাকার প্রলোভন অনেক বার তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে চেয়েছে, রোগ-শোক তাকে অনেকবার মৃত্যু যন্ত্রণা দিয়েছে। তার ভাগ্যদেবতা তার একটা চোখও নষ্ট করে দিয়েছে, কিন্তু তবু সে তার বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা থেকে এক-পাও টলেনি। সিনেমা-নাটক-যাত্রা তাকে কখনও পথভ্রষ্ট করতে পারেনি।

বসওয়েল সাহেব স্যামুয়েল জন্সনের জীবনী লিখে পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি পেয়েছেন। তাতে তিনি স্যামুয়েল জনসনের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—'No man but a blockhead ever wrote except for money.' অর্থাৎ 'একমাত্র নির্বোধ ছাড়া আর সবাই-ই টাকার জন্যে লিখেছেন।' এই কথা পড়ার পরও সে হতাশ হয়নি। কিম্বা হয়তো নির্বোধ বলেই সে কখনও টাকার জন্যে লেখেনি। তার অনেক প্রকাশকরা তাকে বরাবর ঠকিয়েছে, তার নামে পাঁচ-ছ'শো জাল উপন্যাস ছেপে বহু প্রকাশক বহু লক্ষ টাকা উপায় করেছে এবং এখনও পর্যন্ত তা অবিরাম অব্যাহত গতিতে চলছে। তবু চিরকালকে ছেড়ে কখনও তো সে ক্ষণকালকে প্রশ্রয় দেয়নি, প্রীতিকে ছেড়ে কখনও তো সে প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়নি। স্যামুয়েল জনসনের চেয়ে আরও বেশি ভয়ের কথা শুনিয়েছেন ভলটেয়ার।

ভলটেয়ার বলেছেন "The only reward to be expected from the cultivation of literature is contempt if one fails and hatred if one succeeds."

তার মানে হলো—'লেখক হতে গিয়ে যদি কেউ ব্যর্থ হয় তো সে পাবে

অবজ্ঞা, আর লিখে যদি কেউ বিখ্যাত হয়, তো তার কপালে জুটবে নিন্দে —সব লেখকদের কেবলমাত্র এই একটিই পুরস্কার।'

সেই ছেলেটার এখনও মনে আছে সেই সময়কার শরৎচন্দ্রকে নিয়ে ইনটেলেকচুয়াল সাহিত্যিক-মহলে কী ধরনের নিষ্ঠুর বিষোদ্গার চলতো। দিলীপ কুমার রায় মাসিক 'পুষ্পপাত্রে' একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে বুদ্ধদেব বসুর একটি চিঠির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু দিলীপ কুমারকে লিখেছিলেন, "আই য়্যাম্ অল্ ফর রিয়্যালিজম্। কোনও কুৎসিত জিনিস যদি দেখাতেই যাই, তবে চরম দেখিয়ে ছাড়বো। সেখানে লেখকের যদি দয়া থাকে তবে সেইটেই হবে তার দুর্বলতা। কিন্তু আমাদের দেশের সাহিত্যে কী দেখতে পাই? একটা কথা যদি বলি তো কিছু মনে করবেন না, শরৎচন্দ্রের আঁকা বেশ্যার চরিত্র আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। এমন প্রচণ্ড মিথ্যা আর কিছুই হতে পারে না। কলকাতার কোনো মেসে সাবিত্রীর মত ঝি যদি থাকতো তবে আমরা সবাই বাড়ি ভুলে মেসে পড়ে থাকতুম। মেসের ঝি'রা যে-ভাষায় কথা কয় তার একটা লাইন তুলে দিলে আপনি কানে আঙুল দেবেন।···"

এর উত্তরে ১৩৪০ সালের ৫ই জৈষ্ঠ তারিখে শরৎচন্দ্র দিলীপ কুমারকে লিখছেন 'বুদ্ধদেব বসু লিখেছে সাবিত্রীর মত মেসের ঝি থাকলে আমরা মেসেই পড়ে থাকতুম। কিন্তু মেসে পড়ে থাকলেই হয় না—সতীশ হওয়া চাই, নইলে সাবিত্রীর হৃদয় জয় করা যায় না। সারা জীবন মেসে পড়ে থাকলেও না। তাছাড়া ছেলেটি এটুকু বোঝে না যে সাবিত্রী সত্যিই ঝি-শ্রেণীর মেয়ে নয়। পুরাণে আছে লক্ষ্মীদেবীও দায়ে পড়ে একবার এক ব্রাহ্মণ-গৃহে দাসীবৃত্তি করেছিলেন। পঞ্চপাণ্ডবের অর্জুন উত্তরাকে যখন নাচগান শেখাতেন তখন তাঁর কথা শুনে একথা বলা চলে না যে এ রকম ভেয়ড়ুয়া পেলে সব মেয়ে নাচগান শেখার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠতো। সকল সম্প্রদায়ের মতো বেশ্যাদের মধ্যেও উঁচু নিচু আছে। বেশ্যার কাছে যে বেশ্যা দাসী হয়ে আছে তার চাল-চলন এবং তার মনিবের চাল-চলন এক না হতেও পারে। এদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে আট আনা এক টাকা খরচ করলেই চলে কিন্তু ওদের জানবার অনেক ব্যয়। সহজে তাদের দেখা মেলে না, তারা রঙ মেখে বারান্দায় মোড়া পেতে বসে না।···গরিবের অভিজ্ঞতা নীচের স্তরেই আবদ্ধ থাকে। তাই ও শ্রীকান্তের টগর ও বাড়ি-উলিকেই চেনে। এসব উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন, লিখতেও লজ্জাবোধ হয়, কিন্তু যারা

স্ত্রীজাতির গ্লানি প্রচার করাটাকেই রিয়েলিজম্‌ ভাবে তাদের আইডিয়েলিজম্‌ তো নেই-ই, রিয়েলিজমও নেই। আছে শুধু অভিনয় ও মিথ্যে স্পর্দ্ধা—না জানার অহমিকা। মেয়েদের বিরুদ্ধে কোঁদল করার স্পিরিট থেকে কখনও সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না।'

এ চিঠির তারিখ আজ এই ১৩৯৩ থেকে তেষট্টি বছর আগেকার দিনের। এরপর কত লেখক রবীন্দ্র-পুরস্কার পেয়েছেন। কত লেখক বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, সাহিত্য অ্যাকাডেমি, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। শরৎচন্দ্রের কত চরম নিন্দুকও শরৎ পুরস্কার পেয়ে ধন্য হয়েছেন, অথচ কোথায় আছেন শরৎচন্দ্র আর কোথায় গেলেন সেই বুদ্ধদেব বসু অ্যাণ্ড কোং !!

সেই জন্যেই ভল্‌টেয়ারের বলা কথাগুলো আবার নতুন করে স্মরণ করতে হলো। লিখে যদি কেউ ব্যর্থ হয় তাহলে মানুষ তাকে করবে অবজ্ঞা, আর লিখে যদি কেউ বিখ্যাত হয় তো তার কপালে জুটবে নিন্দে। শরৎচন্দ্রের কপালে তাই-ই হয়েছিল। তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন বলেই বুদ্ধদেব বসু অ্যাণ্ড কোং তাঁকে নিন্দে করেছিল।

ভলটেয়ারের কথা উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল রুশোর কথা। রুশোর অবস্থা ছিল শরৎচন্দ্র থেকে আরও করুণ। বুদ্ধদেব বসু শরৎচন্দ্রকে যত গালাগালি দিয়েছেন তার চেয়ে রুশোকে হাজার গুণ বেশি আঘাত দিয়েছেন ফ্রান্সের তৎকালীন ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালরা। রুশোর অপরাধ কী? না, তিনি সেই ১৭৫০ সালের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

হঠাৎ, নাম নেই ধাম নেই ডঃ নয়, আই সি এস নয়, এমন একজন মানুষ প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়ে গেলেই হলো? এটা তো ঠিক নয়। এটা অন্যায়! আমরা সার্টিফিকেট দিলুম না, আর তুমি বিখ্যাত হয়ে যাবে, এটা তো মোটেই বরদাস্ত করা যায় না। এটা অসহ্য!

তাই সেই ১৭৫০ সালে রুশোর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত শত্রুতা শুরু হয়ে গেল। তখন তাঁর বয়েস মোটে আটত্রিশ। একজন আটত্রিশ বছরের ছোকরা কিনা আমাদের মাথার ওপর চড়ে বসলো। বুদ্ধদেব বসু অ্যাণ্ড কোংরা প্রবোধ কুমার সান্যালরা, অন্নদাশঙ্কর রায় আই-সি-এস্‌রা পৃথিবীর সব দেশেই থাকে। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন—তোমার বাবা কে? তিনি কী করেন?

রুশো বললেন—আমার বাবা ঘড়ি মেরামতের মিস্ত্রি।

—ঘড়ি মেরামতের মিস্ত্রি? ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতি নও তুমি?

—না, আমার বাবার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি খুব গরিব লোক ছিলেন। আমার লেখাপড়াও বেশিদূর হয়নি।

—জন্ম?

—হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে।

—কতদূর লেখা-পড়া করেছ?

—টাকার অভাবে আই-এ পরীক্ষা দিতে পারিনি—

তখন ফ্রান্সের ইনটেলেকচুয়ালরা বিক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলো। ওর প্রাইজ কেড়ে নাও, ওই প্রাইজটা বাতিল করো। ও লেখা-পড়া শেখেনি। বড়লোকের ছেলেও নয়। ও, ডঃ নয়। এমন কি আই-সি-এসও নয়।

কিন্তু সব দেশেই কিছু-না-কিছু ভদ্রলোক তো থাকে। সবাই তো আর ইনটেলেকচুয়াল নয়। তাই সে-দেশেও রমেশচন্দ্র মজুমদার, কালিদাস রায়, দিলীপ কুমাররা যেমন শরৎচন্দ্রের পক্ষে ছিলেন, তেমনি ফ্রান্সেও কিছু ভদ্রলোক ছিল। তারা রুশোর ভক্ত হয়ে পড়লো। তারা বললে—আপনি ওদের কথায় ভয় পাবেন না। আমরা আপনাদের পাশে আছি। আপনি যে-সব কথা আপনার প্রবন্ধে লিখেছেন ওই কথা আরও বিস্তারিতভাবে লিখুন।

রুশো তাঁর প্রবন্ধে লিখেছিলেন—মানুষ যখন জন্মায় তখন সে স্বাধীন থাকে কিন্তু এই বিজ্ঞান, এই সাহিত্য, এই শিল্পকলা, সব কিছুই তার পায়ে লোহার শেকল পরিয়ে তাকে বন্দী করে রেখেছে। আদিম পৃথিবীতে যখন এ-সব কিছুই ছিল না তখন মানুষ সুখী ছিল।

যেদিনই তিনি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন সেই-দিনই তিনি হাতের ঘড়িটা বিক্রি করে দিলেন। মনে মনে বললেন—যাক্, ল্যাটা চুকে গেল। আর আমার সময় জানবার দরকার নেই, আমি স্বাধীন।

ভদ্রলোকরা বললেন—আপনি এবার আর একটা বই লিখুন। আগে যে প্রবন্ধটা লিখেছেন সেইটে আরও বিস্তারিতভাবে লিখুন—

রুশো বললেন—আমি কি পারবো? ওই ইনটেলেকচুয়ালরা যদি আবার গালাগালি দেয়?

ভদ্রলোকরা বললেন—ওদের কথা ছেড়ে দিন, ওরা আপনাকে যদি

সেবারের মতো গাল-মন্দ করে তবেই বুঝবেন আপনার লেখা ঠিক হয়েছে। আর প্রশংসা করলে বুঝবেন আপনার লেখা মোটেই ঠিক হয়নি।

এরপরে তার দু'টো উপন্যাস ছাপা হলো। দু'টোরই নিন্দে হলো। আর 'The Social Contract' বইটা প্রকাশিত হলো ১৭৬২ সালে। জেনেভার কাউন্সিল নিজের দেশে বইগুলো বাজেয়াপ্ত করে দিলেন। আর হুকুম বেরিয়ে গেল যে জেনেভাতে ঢুকলেই রুশোকে গ্রেপ্তার করা হবে। আর ফ্রান্সে? ফ্রান্সের ইনটেলেকচুয়ালরাও এমন ব্যবস্থা করলে যাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে বন্দী করা হয়। তাঁর বইগুলোও পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হলো।

দেশের সরকার তাঁর বিরুদ্ধে, দেশের ইনটেলেকচুয়ালরাও তাঁর বিরুদ্ধে। তাহলে তিনি কোথায় কার কাছে আশ্রয় নেবেন? তিনি ইংলণ্ডে পালিয়ে গিয়ে দার্শনিক 'হিউমে'র বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেইখানেই তাঁর এক দুরারোগ্য রোগ দেখা দিল। তাঁর সব সময়ে মনে হতো কারা যেন তাঁকে সব সময় খুন করবার ফন্দি আঁটছে। তারা তাঁকে দেখলেই খুন করে বসবে। তাঁর মনে হতো সব মানুষ যেন তাঁর শত্রু!

শেষ জীবনে তিনি যখন দেশে ফিরলেন তখন তিনি বদ্ধ উন্মাদ। কেউ কেউ বলে তিনি নাকি আত্মহত্যা করেছিলেন। সেটাই স্বাভাবিক। একটু মিষ্টি কথা, এক ফোঁটা স্নেহের কাঙাল ছিলেন তিনি। কিন্তু কেউ তা তাঁকে দেয়নি। পৃথিবীতে যাঁরা মহাপুরুষ হয়ে জন্মান তাঁরা কেউ হয়তো তা পানও না।

তাঁর মৃত্যুর এগারো বছর পরে তাঁর 'Social Contract' বইটার জন্যেই ১৭৮৯ সালে যে বিপ্লবটা হলো তার নামই "French Revolution". এই 'ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশনের ইতিহাস' লিখেই টমাস কার্লাইল অমর হয়ে গেলেন। আর রুশোর জন্মের একশো বছর পরে ১৮১২ সালে জন্মে চার্লস ডিকেন্স 'A Tale of Two Cities' উপন্যাস এই ফরাসী বিপ্লবকে ভিত্তি করে লিখেই তাকে পৃথিবীর সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন। আর কাউণ্ট লিও টলস্টয়? রুশোর কুড়ি ভলিউম বই পড়েই কাউণ্ট টলস্টয় ঋষি টলস্টয় হয়ে গেলেন। আর রাশিয়ার সেই ঋষি টলস্টয়ের বই পড়েই ইণ্ডিয়ার ব্যারিস্টার এম কে গান্ধী মহাত্মা গান্ধী হয়ে গেলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর আশ্রমের নাম দিলেন 'টলস্টয় আশ্রম'। আর তার চেয়েও বড় কথা রাজতন্ত্রের দেশ ফ্রান্স, তাঁর বই পড়েই সেই রাজা-রানী সকলের গলা কাটা গেল। সেই রুশোর একখানা বই পড়েই

'লিবার্টি ইকোয়ালিটি আর ফ্রেটারনিটি'র স্লোগান নিয়ে রাজতন্ত্রের দেশে আস্তে আস্তে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলো।

বলতে বলতে অমলবাবু থামলেন। বললেন—রুশোর 'কনফেশন' বইটাও পড়ো, তাঁর মৃত্যুর পরে ওই আত্মজীবনীটা বাজারে' বেরিয়েছিল। লেখক হতে গেলে ও-বইটা পড়তেই হবে। দেখবে বইটার প্রথম পাতার দ্বিতীয় লাইনে রুশো লিখেছেন যে 'এই বই পড়বার সময় যদি কোনও পাঠকের মনে হয় যে লেখক আমার চেয়ে বেশি বিদ্বান বা বেশি বুদ্ধিমান তাহলে আমার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হলো বলে মনে করবো।' কথাটা খুব দামী···মনে রেখো···

তারপর হঠাৎ বললেন—তুমি 'ভারতবর্ষ' অফিসে গিয়েছিলে? টাকা আনতে?'

সেই ছেলেটার টাকা পাওয়া নিয়ে যেন ছেলেটার চেয়ে অমলবাবুরই বেশি মাথা-ব্যথা!

হায় রে, আজ সেই রুশোও নেই, সেই অমলবাবুও নেই, সেই শরৎচন্দ্রও নেই। সেই বুদ্ধদেব বসু অ্যান্ড কোংও নেই।

অথচ শরৎচন্দ্রের পর বাংলা-উপন্যাস সাহিত্য কি এক ইঞ্চিও এগিয়েছে? তাঁর মৃত্যুর পর আজ আটচল্লিশ বছর তো কেটে গেল। ইতিমধ্যে রবীন্দ্র পুরস্কার, অ্যাকাডেমি পুরস্কার কতো কী পুরস্কার দেওয়া হয়ে চলেছে। তাই বলছি প্রতিভার কারবারে আগাম-শোধের নিয়ম নেই। আগাম-শোধের ব্যবস্থা হলে সন্দেহ জন্মায়। তার হিসেবটা চিত্রগুপ্তের খাতাতেই লেখা থাকে। সেখানে ভুল প্রায় হয়ই না। তাই রুশোও বেঁচে থাকতে কিছু পাননি। শরৎচন্দ্রও পাননি। পাচ্ছেন এখন।

ভবিষ্যতে যার কপালে অনেক দুঃখ আছে সে-ই কেবল সাহিত্যকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে। কারণ ভলটেয়ার তো অনেকদিন আগেই বলে গিয়েছিলেন যে সাহিত্য করতে গিয়ে তুমি যদি ব্যর্থ হও তো তোমার কপালে জুটবে অবহেলা। আর যদি তুমি সার্থক হও তো তোমার কপালে জুটবে নিন্দে।

কিন্তু লেখক আছে দু'রকমের। কিছু আছে শখের লেখক আর কিছু আছে পেশাদার লেখক।

শখের লেখকরা সাহিত্য করার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্থায়ী চাকরি বা ব্যবসা করে জীবন চালান। তাঁদের কোনও ঝুঁকি থাকে না। তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকে এই ভেবে যে চাকরিটা তো তাঁর রইলোই, বই লিখে যে টাকাটা আসবে সেটা ফাউ। তা আসুক আর না আসুক তাঁদের জীবিকার ব্যাপারে তাতে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। যে চাকরিতে আবার পেনশনের সুবিধে আছে সেটা হলে তো সোনায় সোহাগা।

কিন্তু যাঁরা পেশাদার লেখক ?

ইংরেজি সাহিত্যের লেখক যাঁরা তাঁদেব অনেক সুবিধে। পৃথিবী জোড়া বাজার তাঁদের। তাঁরা একটা ভাল বই লিখে সারা জীবনের ভরণ-পোষণের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। তাঁদের আবার পরবর্তী বইটা খারাপ হলেও তাঁদের অর্থাভাবের কোনও আশংকা থাকে না। আবার আর একদল লেখক আছেন যাঁরা শখের লেখকও নন, আবার পেশাদারী লেখকও নন। তাঁরা নিজেরা বই লেখেন এবং নিজেদের প্রকাশনার ব্যবসাও চালান। তাঁরা এ আলোচনার বিষয়বস্তু নন।

তবু পেশাদার লেখকদের কাছে টাকাটা তো মুখ্য জিনিস নয়। লেখার আসল উদ্দেশ্য তো টাকা উপার্জন নয়। টাকা, খ্যাতি, সম্মান বা পুরস্কারও তাঁদের আসল উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হ'ল নিজেকে জানা। অর্থাৎ নিজেকে আবিষ্কার করা। নিজেকে জানতে পারলে বা নিজেকে আবিষ্কার করতে পারলে নিজের ওপর বিশ্বাসটা বাড়ে। আত্ম-বিশ্বাস জন্মালে সামনে এগিয়ে চলবার সাহস জাগে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে তাতে নিজের চেয়ে যে বড় তাঁকে জানা যায়। মানুষের কাছে তার চেয়ে বড় কাম্য আর কী হতে পারে তা সংসারে কারো জানা নেই। নিজের চেয়ে যা বড় তাঁকে জানতে পারলে টাকা, খ্যাতি, পুরস্কার সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়।

কিন্তু নিজেকে জানবার এই অবিরাম সংগ্রামে কোথাও যদি একটু ফাঁকি থাকে তাহলে কেউ আর তাকে ক্ষমা করবে না। সেই কথাটি মনে রেখেই ছোটবেলায় সেই ছেলেটা তার একটা বইয়ের আরম্ভতেই এই কথাগুলো লিখে দিয়েছিল—"লেখক জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি এই যে তাকে সারা জীবনই লিখে যেতে হবে। একখানা ভাল বই লিখে থেমে গেলে চলবে না। সারা জীবনই তাকে ভাল বই লিখে যেতে হবে। ঘটনাচক্রে যদি একখানা ভাল বই লিখে ফেলেও তার পরের বইটা আরও ভাল হওয়া চাই। পরের বইটা যদি তত ভাল না হয় তো কেউ তাকে

ক্ষমা করবে না। একটার পর একটা ভাল বই লিখে যেতে হবে। আরও ভাল বইই শুধু নয়, উত্তরোত্তর ভাল বই। এই ভাল বইয়ের চেয়ে আরও ভাল, উত্তরোত্তর ভাল বই লেখবার সংগ্রামে যতক্ষণ না লেখক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ছে যতক্ষণ না পাঠক লেখককে চিবিয়ে ছিবড়ে করে ফেলছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাকে রেহাই দেবে না।"

এসব জেনেও কে এমন পাগল আছে যে স্বেচ্ছায় পেশাদার লেখক হতে এগিয়ে আসবে? কে এই অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিতে রাজি হবে? কিন্তু এতদিন যেসব লেখকের লেখা সেই ছেলেটা পড়ে এসেছে তাঁদের জীবনী পড়ে দেখেছে তাঁরাও পাগল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁরা জেনে শুনে এই বিষ পান করেছিলেন বলেই মৃত্যুর পর অমৃত পেয়েছিলেন।

অবশেষে একদিন সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে সেই ছেলেটা সাইকেল নিয়ে সোজা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অফিসে গিয়ে হাজির হল। মানিকতলা আর সাবেক কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের মোড়ের কাছাকাছি ছিল গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স-এর অফিসটা। সেখান থেকেই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাটা প্রকাশিত হত। অফিসের উল্টোদিকে একটা মণিহারি দোকানের সামনেই লাইটপোস্টের সঙ্গে শেকল দিয়ে তালা বন্ধ করে রেখে দোকানীকে অনুরোধ করলে যেন তিনি একটু নজর রাখেন সেটার ওপর। দোকানদার ভদ্রলোক রাজি হওয়াতে সেই ছেলেটা দুরুদুরু বুকে 'ভারতবর্ষ' অফিসে ঢুকলো। একতলায় তাঁদের প্রকাশিত সমস্ত বই-র প্রদর্শনী। যেদিকে চায় সেদিকেই কেবল বই আর বই। একজন মান্যগণ্য প্রবীণ ভদ্রলোক দেখে সেই ছেলেটা জিজ্ঞেস করলে—'ভারতবর্ষ' সম্পাদক জলধর সেন কোথায় বসেন?

ভদ্রলোক আঙুল দিয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে নির্দেশ করে বললেন —ওপরে—

ওইটুকু ভদ্রতার ইঙ্গিতই যথেষ্ট। তার বেশি ভদ্রতা সে ছেলেটা কারো কাছ থেকে কখনও আশা করে না।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই একটা বড় আকারের ঘরের ভেতরে তখন দুটো ইজিচেয়ারে দুজন বৃদ্ধ খালি গায়ে শুয়ে আছেন। গ্রীষ্মকাল। বাইরে প্রচণ্ড গরম। দুজনের দুটো পাঞ্জাবি পাশের দেয়ালে হুকের গায়ে ঝোলানো ছিল। সেই ছেলেটাকে দেখে দুজনেই চঞ্চল হলেন। তাঁরা কিছু বলবার আগেই সেই ছেলেটা জিজ্ঞেস করলে—জলধর সেন মশাই আছেন?

বৃদ্ধ দুজন কোনও জবাব দিলেন না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। আবার সেই ছেলেটা একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে। সেবারেও কোনও জবাব দিলেন না তাঁরা। তারপর আবার প্রশ্ন, আবার তাঁরা নিরুত্তর। এরকম অস্বস্তিকর অবস্থায় সেই ছেলেটা আগে আর কখনও পড়েনি।

একজন বৃদ্ধ তখন চেয়ার ছেড়ে ছেলেটার মুখের সামনে এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন—নাম কী?

ছেলেটা নিজের নাম বলতেই তিনি শশব্যস্ত হয়ে তাঁর দেয়ালের হুকের গায়ে ঝোলানো পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—তুমি আসতে এত দেরি করলে কেন? তোমার দেরি দেখে আমি তো টাকাটা নিয়েই নিচ্ছিলুম—

ছেলেটা আর কী বলবে। সে ভাবলে হয়তো টাকাটা প্রাপ্তির ব্যাপারে কোথাও কোনও খাতায় একটা সই-সাবুদ করতে হবে। যেমন 'প্রবাসী' অফিসে হয়েছিল।

কিন্তু না, সেসব বালাই নেই 'ভারতবর্ষ' অফিসে। কত টাকা সেই ছেলেটা পেলে আর কত টাকা তার লেখার বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছিল তার কোনও রেকর্ডও রইলো না কোথাও। টাকাটা নিয়ে সেই ছেলেটা আবার সেই একই সিঁড়ি দিয়ে নিচের রাস্তায় এসে নামলো। কেউই বাধা দিলে না।

মানুষের জীবন মানেই হল তেতো বড়ি। আগে এই ধারণাটাই তার ছিল। কিন্তু পরে যখন সেই ছেলেটা লেখক হ'ল তখন জানতে পারল যে লেখকের জীবন মানে বিষের বড়ি। বিশেষ করে পেশাদারি লেখকদের জীবন। একাধারে তাদের নির্ভীক হতে হবে, সৎ হতে হবে, অক্লান্ত পরিশ্রমী হতে হবে, সংযমী হতে হবে, নির্লোভ হতে হবে, আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচারবিমুখও হতে হবে এবং যথাসাধ্য ভাল লিখতে হবে। নইলে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার মালিক বেছে বেছে ওই দুজন লোককেই বা ওইরকম দায়িত্বশীল পদে রেখেছিলেন কেন? সম্পাদক জলধর সেন কানে কম শুনতেন, আর সহ-সম্পাদক বীরেন্দ্রকুমার বসু ততোধিক। দুজন বধির লোককে ওই পদে রাখার পেছনে কি মালিকের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল?

অমলবাবু সেদিনও জিজ্ঞেস করলেন—তুমি 'ভারতবর্ষ' অফিসে গিয়েছিলে?

সেই ছেলেটা বললে—হ্যাঁ স্যার।

—টাকা দিয়েছে ?

—হ্যাঁ স্যার।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন—কত ? পঁচিশ ?

টাকার আসল অঙ্কটা শুনে তাঁর মুখটা এক মুহূর্তের জন্যে শুধু কালো হয়ে গিয়েছিল। কেন যে তাঁর মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল তা সেই ছেলেটা আজও অনুমান করতে পারেনি। হয়তো এই ভেবে কালো হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর প্রিয় ছাত্রকে কেউ ঠকাল বলে। তিনি কেমন করে কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে সেই ছেলেটা অর্থাভাবগ্রস্ত ? কারণ শুধু তো 'ভারতবর্ষ' নয়। তখন অনেক পত্র-পত্রিকাতেই সে লিখছে। 'গল্প-লহরী', 'পুষ্পপাত্র', 'পঞ্চপুষ্প', 'আত্মশক্তি'। আর তাছাড়া তার তো কোনও বাজে খরচই নেই। লেখকের যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেটা হল একটা মাথা গোঁজবার আশ্রয়। পৈতৃক প্রাণটার মত পৈতৃক একটা বাসভবন কলকাতা শহরে থাকতে আর তার ভয়টা কীসের ? একজন লেখকের পক্ষে মাথা গোঁজবার মত একটা আশ্রয় ছাড়া আর কীই বা অপরিহার্য ?

আর দরকার কাগজ আর কলম। বলতে গেলে এখনকার মত তখনও সে দুটোর কোন দামই ছিল না।

কিন্তু লেখকের পক্ষে সবচেয়ে যেটা অপরিহার্য সেটা হচ্ছে বই। সারা পৃথিবীর সমস্ত লেখকের লেখা বই। এমন সব বই যা দু'তিনশ' বছর আগে লেখা হয়েছে কিন্তু তবু তা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আজও অম্লান হয়ে আছে। একশ' দুশ' বছর আগে লেখা হলেও তাতে কী এমন রত্ন আছে যে সেগুলো তাদের লেখকদের অমর করেছে ? বইতে কী থাকলে বই আর লেখক অমর হয় তা না জানলে লেখক হয়ে লাভটা কী ? শরৎচন্দ্রের আগে এবং পরে আরও অনেক লেখক-লেখিকা ছিলেন তাঁদের নাম কেন মানুষ ভুলে গেল ? সেসব প্রশ্নের উত্তরের জন্যে তো লাইব্রেরী আছে।

সেই প্রশ্নটাই সেই ছেলেটাকে পাগল করে তুলল। সেই প্রশ্নের উত্তরের আশায় সে রোজই লাইব্রেরীতে যেতে লাগলো। সেখানে গিয়ে সে দেখলে মানুষ সর্বাধিক মাথা ঘামায় রাজনীতি নিয়ে। কিন্তু রাজনীতি এমন এক পেশা যাতে কোনও লেখা পড়া জানার বাধ্যবাধকতা নেই। তারপরে যে দ্বিতীয় জিনিসটা নিয়ে সবাই মাথা ঘামায় সেটা হচ্ছে খেলাধুলা। সেই স্পোর্টসও এমন এক জিনিস যাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হলে বিদ্যাবুদ্ধির

প্রয়োজন অনিবার্য নয়। তারপরে যে পেশাটি তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছে সেটা হচ্ছে সিনেমা। তাতেও বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন অপরিহার্য নয়। এই তিনটে জিনিসের ওপরই জনতার মানুষের বেশি আগ্রহ। কারণ এই তিনটে জিনিসের গ্ল্যামার আছে। আর যাঁরা এই কাজে নিযুক্ত তাঁরাও অনেক অর্থের মালিক হওয়ার সুযোগ পান।

রাজনীতিকদের প্রধান গুণ হ'ল বক্তৃতা দিতে পারা। বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে হাসানো কাঁদানো, ভোট পাওয়ার ফাঁদ পাতা তাঁদের কাজ। সেই ভাল ভাল বলা কথাগুলো নিজের জীবনে পালন না করলেও চলে। খেলোয়াড়দের কাজ একটা বলকে নিয়ে যথাইচ্ছে ঘোরানো। এর মধ্যে একটা উত্তেজনা ছাড়া আর কিছু নেই। আর সবাই-ই জানেন যে জনতা উত্তেজনারই ভক্ত। আর তৃতীয় জনপ্রিয় জিনিসটি হচ্ছে সিনেমা। ওটা তো আর্ট নয়। যদিও বা আর্ট হয় তো সেটা কমার্শিয়াল আর্ট। সৃষ্টিশীল আর্ট নয়। সে আর্ট অমৃতের সন্ধান দেয় না।

কিন্তু সবচেয়ে অবহেলিত বা অপ্রয়োজনীয় যে জিনিসটা, সেটা হচ্ছে সাহিত্য। অথচ সেই অবহেলিত জিনিসটার দিকেই সেই ছেলেটার কেন এত আকর্ষণ?

কেন এত আকর্ষণ সেটা জানতে গেলে রবীন্দ্রনাথের একটা লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিতে হবে। তিনি লোকেন পালিতকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন "মানুষের প্রবাহ হু হু করে চলে যাচ্ছে ; তার সমস্ত সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর কোথাও থাকছে না---কেবল সাহিত্যে থাকছে। সঙ্গীতে চিত্রে বিজ্ঞানে দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই। এই জন্যই সাহিত্যের এত আদর। এইজন্যই সাহিত্য সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার। এইজন্যেই প্রত্যেক জাতি আপন আপন সাহিত্যকে এত বেশি অনুরাগ ও গর্বের সহিত রক্ষা করে।" রবীন্দ্রনাথ যাকে 'মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভান্ডার' বলেছেন তারই জন্যে সেই ছেলেটা তার জীবন বিসর্জন দেবে ঠিক করলে।

ইংরেজ কবি 'অডেন' তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন 'Time worships language.'

তার মানে হ'ল---'মহাকাল ভাষাকে পুজো করে'। সেই ছেলেটা ঠিক করলে যাকে মহাকাল পুজো করে সে তাকেই পুজো করবে।

কয়েক বছর আগে একটা বিলিতি পত্রিকার পক্ষ থেকে একটা বই বেরিয়েছিল। বইটির নাম 'Writers at work'. কয়েকজন লেখকের

সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সংকলন। তাতে উইলিয়াম ফকনারকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। সেই ছেলেটা সেই সাক্ষাৎকারের বক্তব্যের সঙ্গে একমত বলেই সেটা সে এখানে উদ্ধৃত করছে :

"ফকনার : শিল্পে যে পূর্ণতার স্বপ্ন আমরা দেখি তা আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি। সকল সৃষ্টির মধ্যে অপূর্ণতা রয়ে যায় বলেই শিল্পী ও লেখক তাঁদের সাধনা অব্যাহত রাখে। হয়তো পরবর্তী সৃষ্টি আরও ভাল হবে—এই আশা। প্রতিভা নিষ্ঠা ও পরিশ্রম করবার ক্ষমতা—প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের এই গুণগুলি থাকা চাই। অন্যের চেয়ে বড় হবার কথা ভেবে লাভ নেই। নিজে যা করেছ তার থেকে আরও উন্নতি করবার স্বপ্ন দেখবে। শিল্পী সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেন অদৃশ্য এক দৈত্যের তাড়নায়। তার আদেশ না মেনে উপায় নেই। কেন যে দৈত্য তাকেই নির্বাচন করেছে শিল্পীর তা জেনে লাভ নেই, তা ভাববার তার সময়ও নেই : চুরি করে হোক, ডাকাতি করে হোক, ভিক্ষে করে হোক শিল্পীকে দৈত্যের সেই আদেশ পালন করতেই হবে।

প্রশ্ন—তাহলে লেখক কি নির্মম হবে ?

উত্তর—হ্যাঁ, হবে বৈকি। লেখকের একমাত্র দায়িত্ব তার সৃষ্টি। সৃষ্টির স্বপ্ন সফল করবার জন্যে তাকে নির্মম হতে হবে। যতক্ষণ স্বপ্নকে শিল্পের মধ্যে মূর্ত করে তুলতে না পারবে ততক্ষণ তার শান্তি নেই। উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তাকে সম্মান, গর্ব, ভদ্রতা, নিরাপত্তা, সুখ—সবকিছু ধুলোর মত উড়িয়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন—লেখকের কি তাহলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন নেই ?

উত্তর—না, নেই। তার শুধু পেনসিল আর কাগজের প্রয়োজন। আর্থিক সাহায্য পেয়ে লেখা উন্নত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত জানি না। সত্যিকারের ভাল লেখক কখনও সাহায্যের জন্যে কোনও প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন করে না। এসব কথা ভেবে-চিন্তে কাজ করবার সময় তার নেই। নির্বোধ হলেই সে দারিদ্র্যের অজুহাত তুলবে। মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনও কিছুই সত্যিকার ভাল লেখকের শিল্পসত্তাকে ধ্বংস করতে পারে না। ভাল লেখক কখনও সাফল্য ও অর্থের জন্যে লালায়িত হয় না। জীবনের সাফল্য হল আদরলোভী মেয়ের মত—একটু আদর পেলেই সে মাথায় চড়ে বসে, তখন আর তাকে নামানো ভার, তাকে মাথায় ওঠাবার অর্থ জীবন থেকে শিল্পকে তাড়ানো। সুতরাং সফলতাকে কাছে ঘেঁষতে দেবে না,

দূরে দূরে রাখবে। তাহলে সে তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে।”
(চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ‘লেখার কথা’)

আশ্চর্য আজ থেকে ষাট বছর আগে সেই ছেলেটা যেসব সমস্যা ভেবে ভেবে সমাধান করেছিল, এত বছর পরে উইলিয়াম ফক্‌নারের কথায় তার সত্যতা বর্ণে বর্ণে প্রমাণিত হ’ল। অথচ আজকের দিনে এসব কথা কোন লেখকই বা জানে আর কোন লেখকই বা অনুসরণ করে ?

আই. এ. পরীক্ষার দিন একই সেণ্টারে সিট পড়েছে অনুপমের সঙ্গে। কিন্তু অনুপম গর-হাজির, কী হল ? অনুপম পরীক্ষা দিতে আসেনি কেন ? তার কি অসুখ করল ? পরীক্ষাটা কোনওরকমে দিয়েই একেবারে সোজা তার বাড়িতে গিয়ে হাজির। দেখে সে হারমোনিয়াম নিয়ে গলা সাধছে। জিজ্ঞেস করলে—কী রে এগজামিন দিলি না তুই ?

অনুপম বললে—দূর, এগজামিন দিয়ে কী হবে ? আমি হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস-এ গানের ট্রেনার হয়েছি। আমার গানের রেকর্ড বেরিয়েছে—শুনবি।

সেই ছেলেটা শুনলো। এক নম্বর রেকর্ডটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের গলায় গাওয়া গান—‘তবু মনে রেখো’। দু’নম্বর রেকর্ড রেণুকা সেনগুপ্তার গাওয়া গান—‘যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এলো’। আর তিন নম্বর রেকর্ড অনুপম ঘটকের গান—“মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে”। সাতমাত্রার যৎ-এর তালে টপ্পা অঙ্গের সঙ্গীত। অনুপম বললে —একদিন আয় না। ৬/এ অক্রুর দত্ত লেন। আমি রাত আটটা পর্যন্ত থাকি—

সেই ছেলেটার জীবনে ৬/এ অক্রুর দত্ত লেনের ঠিকানাটা একটা স্মরণীয় সংবাদ। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের যে সংগঠনগত সাযুজ্য আছে তা সেই ঠিকানায় না গেলে ছেলেটা জানতেই পারতো না। হাজরা পার্কে ঘাসের ওপর বসে অনুপমের গলায় ভীমপলশ্রী রাগের আলাপ শোনা এক জিনিস আর অক্রুর দত্ত লেনের হিন্দুস্থান কোম্পানির স্টুডিওর ভেতরে বসে বিভিন্ন বাদ্য-যন্ত্রের সঙ্গে বড় বড় ওস্তাদদের গলায় বিভিন্ন রাগের গান-শোনার আনন্দ আসমান জমিন ফারাক।

সেই ছেলেটার তখনও কোনও নিজস্ব পরিচিতি নেই। একমাত্র পরিচিতি এই যে সে গান শুনতে ভালোবাসে। সাহিত্যের চেয়েও ভালোবাসে সে সঙ্গীতকে। বিশেষ করে রাগাশ্রয়ী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। কলেজ থেকে দু’জনে পালিয়ে তারা কতোদিন তারাপদ চক্রবর্তীর ভবানীপুরের

কাঁসারী পাড়া রোডের বাড়িতে গিয়ে ঢুঁ দিয়েছে। তখন হয়তো তারাপদ-বাবু দিবানিদ্রা দিচ্ছেন। তাঁকে জাগিয়ে তুলে অনুপম বলেছে—নাকুদা, একটা গান শোনান—

আর নাকুদাও তেমনি নিপাট ভদ্রলোক। তাঁর গান শুনে সেই ছেলেটা মুগ্ধ হয়ে গেছে। শুধু গানই নয়, তাঁর গায়কীও তাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের এমন একটা আত্মীয়তা ছিল যা তাঁর চরিত্রের ওপর একটা বিশিষ্টতা প্রদান করেছিল।

আর শুধু কি তারাপদ চক্রবর্তী? হর্ষদেব রায়ও এমন এক গায়ক যাঁর বাড়িতেও তারা দু'জনে কলেজ পালিয়ে মাঝে মাঝে ঢুঁ মারতো।

এসব কলেজের প্রথম আর দ্বিতীয় বর্ষের ব্যাপার। কিন্তু হঠাৎ কী হলো কে জানে সে দক্ষিণ কলকাতার আশুতোষ কলেজ ছেড়ে উত্তর কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে গিয়ে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হলো। কলকাতার দক্ষিণে এত কলেজ থাকতে হঠাৎ উত্তর কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ কেন? কেন নয় ভালো ছেলেদের জন্যে বরাদ্দ প্রেসিডেন্সি কলেজ?

এর কারণ সে মানুষ হিসেবেও যেমন মধ্যবিত্ত, ছাত্র হিসেবেও তেমনি মধ্যবিত্ত। সারা বছর, সে কেবল সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাতো, কেবল সঙ্গীত নিয়ে মাথা ঘামাতো। আর কলেজের লেখাপড়া? ওটা পরীক্ষার আগে এক মাস দিন-রাত জেগে সমাধা করলেই যথেষ্ট। কারণ সে বরাবরই জানতো যে সে আই সি এস হবে না, বি সি এস হবে না, আই ই এস বা আই পি এসও হবে না। এমন কি পি আর এস, পি এইচ ডি, ডি-লিট্ও হবে না। যারা ভবিষ্যতে ভালো চাকরি পেতে মনস্থ করে তারাই কলেজের লেখাপড়া মন দিয়ে করে। সে তো তা হবে না। সে তো কোনও দিন চাকরি করবে না। সে তো সারা জীবন লিখে পঁচিশ টাকা আয় করে মেসে থেকে দিন কাটাবে।

এছাড়া উত্তর কলকাতার কলেজে পড়বার আগ্রহের পেছনে আরো একটা আকর্ষণ ছিল তার। সেটা অর্থকরী আকর্ষণ নয়, কারণটা হলো অপার্থিব আকর্ষণ। এ আকর্ষণের কারণটা কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে কিনা তা সে জানে না। সেই আকর্ষণটা হচ্ছে এই যে তার মনে হতো উত্তর কলকাতার বাতাস শুধু নয়, উত্তর কলকাতার রাস্তার ধুলো, ময়লা, নর্দমাগুলো পর্যন্ত পবিত্র। কারণ রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, কেশব চন্দ্র সেন, শরৎচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি

সমস্ত মহাপুরুষ "সবার পরশে পবিত্র করা" উত্তর কলকাতা। তাই সেই অঞ্চলের আকর্ষণটা কী করে ছেলেটা এড়িয়ে যাবে? আর তা ছাড়া সমস্ত প্রকাশকদের দোকান তো ওখানে। বই-এর সুগন্ধ কি তার কাছে কম আকর্ষণীয়?

সেই উত্তর কলকাতায় যেতে আসতে সময় এবং পয়সা, দুটোই বাড়তি-খরচ। কলেজের মাইনে ছাড়া প্রত্যেক মাসে বাসের মান্থলি টিকিটের দাম ছ'টাকা। সেই ছ'টা টাকাও তো বাড়তি অপব্যয়। সে-টাকাটাই বা কোথা থেকে আসে?

অতো দূরে কলেজের অবস্থিতি হওয়ার ফলে দক্ষিণ কলকাতার প্রান্তে বাড়িতে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যায়। প্রথম প্রথম বিকেল ছ'টার পর বাড়ি ফিরলে গৃহস্থের দুশ্চিন্তা হতো। ছেলে কলেজ থেকে এখনও ফিরলো না কেন? কোথাও কোনও দুর্ঘটনা হলো না তো! তারপর হলো সন্ধে সাতটা। সন্ধে সাতটার পর ছেলে বাড়ি না ফিরলে দুশ্চিন্তা। তারপর সেই সময়টা বেড়ে গিয়ে হলো রাত আটটা। তারপর রাত ন'টা, তারপর রাত দশটা। তখনও যদি বেয়াড়া ছেলেটা বাড়িতে না ফেরে তো তার রাত্রের খাবারটা ঢাকা রেখে দিয়ে সবাই শুয়ে পড়তো। তারপর রাত এগারোটায় গিয়ে দাঁড়ালো তার বাড়িতে ফেরার টাইম টেবল। তার পর হলো রাত বারোটা। রাত বারোটা থেকে গিয়ে দাঁড়ালো একটাতে। রাত বারোটা থেকে ক্যালেন্ডারের তারিখ বদলে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেই ছেলেটা তখনও আড্ডায় মত্ত। তার তখন সন্ধে। তারপর রাত দুটোতে গিয়ে ঠেকলো তার বাড়ি ফেরার টাইম টেবল। তারপর রাত তিনটে, তারপর ভোর চারটে। তারপর একদিন সেই ছেলেটা যখন বাড়িতে ফিরলো তখন দেয়াল ঘড়িতে ভোর পাঁচটা। ভোর পাঁচটায় ছেলেটার অভিভাবক প্রাতঃভ্রমণের জন্যে নিয়ম মতো বাইরে বেরোচ্ছেন, ছেলে তখন সারা রাত আড্ডা দিয়ে ঘুমোবার জন্যে বাড়ি ফিরছে।

অভিভাবক খুবই রুষ্ট। তবু গলাটা যথাসম্ভব নরম করে বিরক্তির স্বরে বললেন—এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাকো?

কোথায় যে ছেলেটা অতো রাত পর্যন্ত থাকে তার কৈফিয়ত দেবার দায়িত্ব বোধ তার নেই। সে তখন বাড়ির ভেতরে ঢুকে তার বরাদ্দ ঢাকা দেওয়া খাবারটা পাশের বাড়ির ছাদের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আশা—ভালো করে ভোর হওয়ার আগেই পাড়ার কাকের দল সেগুলো খেয়ে নিঃশেষ করে দিয়ে ছেলেটার সব অপরাধের চিহ্ন লোপাট করে দেবে।

কেউই আর জানতে পারতো না যে সেই ছেলেটা পাঞ্জাবীর দোকান থেকে রুটি-তড়কা খেয়ে পেট ভরিয়ে এসেছে।

একদিন অভিভাবক জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কলেজের মাইনে তো চেয়ে নিচ্ছ না—

ছেলেটা বললে—সে আমি নিজেই চালিয়ে নিচ্ছি—

কোনও অভিভাবকের পক্ষেই কোনও ছেলের তরফ থেকে এই ধরনের বেয়াদপি ব্যবহার বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু তবু সেই ছেলেটা তার নিজের লক্ষ্যে অচল অটল থাকবে। তার বাড়ি ঘর লেখাপড়া চুলোয় যাক, গুরুজনরা যত ইচ্ছে অসন্তুষ্ট হোক, সে তার নিজের অভীষ্ট সন্ধানে নির্মম হবে। তার লক্ষ্য-স্থলে পৌঁছবার জন্যে সে যতরকম কৃচ্ছ্রসাধন সমস্ত মাথা পেতে নেবে, কোথাও কখনও কারো সঙ্গে সে আপোস করবে না। তা সে গুরুজনরাই হোক আর বন্ধুবান্ধবরাই হোক। তা ছাড়া সে মনে মনে শপথ গ্রহণ করে ফেলেছে যে সে সাহিত্যকে তার পেশা করে নেবে। আর পৃথিবীর সমস্ত প্রথম শ্রেণীর লেখকদের জীবনী পড়ে যে চারটি প্রধান দুর্বলতা লক্ষ্য করেছে সেই চারটি হলো (১) নারী, (২) সুরা, (৩) অর্থ আর (৪) আত্মপ্রচার প্রবণতা। এই চারটি দুর্বলতাই বেশির ভাগ প্রতিভাধর লেখককে পথভ্রষ্ট করে। সেই ছেলেটা তা থেকে পুরোপুরি দূরে থাকবে।

সমারসেট মমের লেখা একটি বই আছে। বইটির নাম "Ten great Novels of the world and their Novelists". সেই বইটির প্রথম পাতার প্রথম লাইনটি বড়ো চমৎকার। তিনি লিখছেন "Perhaps 'War and Peace' is the greatest novel of the world but Balzac is the greatest novelist."

এর তাৎপর্য হলো যদিও টলস্টয়ের লেখা 'যুদ্ধ ও শান্তি' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, তবু বালজাকই হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক।

কথাটার মধ্যে যদিও খানিকটা বিরোধাভাস রয়েছে, বা কথাটা স্ববিরোধী, কিন্তু তবু উক্তিটা অর্থবহ। মম সাহেব কেন যে এই ধরনের স্ববিরোধী উক্তি করলো তার একটা ব্যাখ্যা দরকার। তিনি বলতে চান যে একটা প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস লিখলেই কোনও লেখক শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক আখ্যা পাবেন না। একাধিক প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস লিখতে হবে লেখককে। তবেই তিনি শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলে বিবেচিত হবেন। বালজাক তাই-ই লিখতে পেরেছিলেন। সেই জন্যেই হয়তো বালজাকের

জীবনীকার স্টিফান জ্বইগ বালজাক সম্বন্ধে লিখে গেছেন—"Balzac was the greatest creator of human characters next to god." তার মানে হলো 'ঈশ্বরের পরে বালজাকই হলেন সর্বাধিক সংখ্যক মানব চরিত্রের স্রষ্টা।'

মম সাহেব বইটির শেষে কয়েকটা কথা জ্বড়ে দিয়েছেন, সেই কথাগ্বলোও অন্বধাবনযোগ্য। তিনি লিখছেন—"এই যে দশটি উপন্যাস আর দশজন ঔপন্যাসিকের কাহিনী লিখলাম এ'রা কেউ পিতা হয়ে পিতার কর্তব্য করেননি, স্বামী হয়ে স্বামীর কর্তব্য করেননি, সন্তান হয়ে সন্তানের কর্তব্য করেননি, দেশের নাগরিক হয়ে নাগরিকের কর্তব্য করেননি। কিন্তু একটা কাজ তাঁরা ঘড়ি ধরে করেছেন সেটা হচ্ছে নিয়ম করে লেখা। They used to go to their writing tables punctually like a shipping clerk".

কিন্তু সেই ছেলেটা ভাবলে যে শ্বধ্ব ভালো লেখক হলেই তার চলবে না। তাকে প্ৃথিবীর অন্য লেখকদের মতো শ্বধ্ব ঘড়ি ধরে কাঁটায়-কাঁটায় লিখলেই চলবে না। তার সঙ্গে সঙ্গে সন্তান হয়ে সন্তানের কর্তব্যও করে যেতে হবে, পিতা যদি সে হয় কখনও তো তখন পিতার কর্তব্যও করতে হবে, স্বামী যদি সে কখনও হয় তো স্বামীর কর্তব্যও সে করে যাবে, নাগরিক হয়ে নাগরিকের কর্তব্যও সে বরাবর করে যাবে। আর তার সঙ্গে নিয়ম করে লিখে যেতেও হবে। সেই জন্যেই সে বহ্বদিন আগে একটা বই-এর প্রথম প্যারাগ্রাফেই লিখে দিয়েছিল যে "লেখক জীবনের সব চেয়ে বড়ো ট্রাজেডি এই যে তাকে সারা জীবনই ভালো লেখা লিখতে হবে। একখানা ভালো বই লিখে থেমে গেলে চলবে না। ভালোর চেয়ে আরো ভালো, উত্তরোত্তর ভালো বই লিখতে হবে। এই ভালো লেখার সঙ্গে উত্তরোত্তর ভালো লেখার সংগ্রামে যতক্ষণ না সে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে, যতক্ষণ না পাঠক তাকে চিবিয়ে ছিবড়ে করে ফেলছে ততক্ষণ তাকে কেউ রেহাই দেবে না।'

তা করতে গেলে তাকে কী করতে হবে ? তাকে সৎ হতে হবে, তাকে নির্ভীক হতে হবে, তাকে নির্লোভ হতে হবে, তাকে সংযমী হতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে আত্মপ্রচার বিম্বখও হতে হবে। তাকে (১) নারী, (২) স্বরা, (৩) টাকা আর (৪) জনতার মান্বষের অন্তরালে থাকতে হবে। অর্থাৎ আজকাল যেমন সব লেখক বইমেলায় গিয়ে নিজের বই বিক্রি করবার ফন্দিতে 'অটোগ্রাফ' দিয়ে থাকে, বা খবরের কাগজের

প্রথম পাতায় নিজের পকেটের পয়সায় স্বরচিত বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে, তা থেকে তাকে বিরত থাকতে হবে। শরৎচন্দ্রের একটা মূল্যবান কথায় আস্থা রাখতে হবে যে "বর্তমান কালই সাহিত্যের সুপ্রীম কোর্ট নয়।" তাকে মনে রাখতে হবে যে জীবদ্দশায় লেখক যা পায় তা টি. এ. ডি. এ.। সেটা খোরাকি। আসল বেতনটা মাস না গেলে পাওয়ার নিয়ম নেই। সেটার হিসেব চিত্রগুপ্তের খাতাতেই লেখা থাকে। সেখানে হিসেবের ভুল কখনও হয় না! লেখক মৃত্যুর পরই সেই বেতনটা হাতে পেয়ে থাকে। তাই টলস্টয়, ডিকেন্স, বালজাক, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এতদিন পরে সেই বেতনটা পাচ্ছেন। সেদিন অনুপম বললে—কাল কলেজ থেকে একটু সকাল-সকাল চলে আসিস—ছেলেটা জিজ্ঞেস করলে—কেন?

—কাল রবীন্দ্রনাথ আসছেন রেকর্ডিং করতে—

আবার তাঁর গান রেকর্ডিং হবে?

অনুপম বললে—না, এবার গান নয়। তিনি নিজের কবিতা নিজের গলায় আবৃত্তি করবেন।

—কোন্ কবিতাটা?

—অনুপম বললে—সেই 'বহুদিন মনে ছিল আশা...'

সেই ছেলেটা অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কি? সেটা যে সেদিন শিশির ভাদুড়ী রেকর্ডিং করে গেলেন। সেটা তো বাজারে বেরিয়েই গেছে।

অনুপম বললে—সে আবৃত্তিটা কবির পছন্দ হয়নি। তাই ওই কবিতাটাই কবি আবার নিজের গলায় রেকর্ডিং করতে চান...

এই ঘটনার সঙ্গে আগেকার একটি দুর্ঘটনার যোগসূত্র আছে। সেই দুর্ঘটনার যোগসূত্রটি এখানে না বললে ব্যাপারটা ঠিকমত পরিষ্কার হবে না।

একদিন হিন্দুস্তান কোম্পানির ৬/এ, অক্রূর দত্ত লেনের সামনে একটি ট্যাক্সি এসে থামলো। ট্যাক্সির ভেতরে বসে আছেন একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। তাঁর নাম শিশির ভাদুড়ী। এক ডাকে তখন সবাই তাঁকে চেনে। স্বনাম-খ্যাত অভিনেতা তিনি তখন। তাঁর অভিনয় দেখবার

জন্যে তখন থিয়েটারের দরজার ঝাঁপ খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই 'হাউস ফুল' হয়ে যেত, রাস্তার ওপর ট্রাম-বাসে জট পাকিয়ে যেতো, তখন এমনি তাঁর খ্যাতির মহিমা।···

সেই মানুষটি ট্যাক্সির ভেতরে তখন একলা বসে আছেন। ওদিকে ট্যাক্সির মিটারে তখন টাকার অঙ্কের হিসেব উঠেছে পঞ্চাশ। সে যুগের হিসেবে পঞ্চাশ টাকার দাম মানে এখনকার দিনের প্রায় তিনশো টাকার মতন।

ট্যাক্সি ড্রাইভার ভদ্রলোককে ডাকতে লাগলো—বাবুজী, বাবুজী—

সে জানে না তার ট্যাক্সির ভেতরে যে প্যাসেঞ্জার বসে আছে তিনি বাঙলা দেশের একজন স্বনামখ্যাত লোক। তা অবশ্য তার জানবার দরকারও ছিল না কারণ তার কাছে টাকাই হচ্ছে ধ্যান-জ্ঞান সব কিছু। টাকা দিয়েই সে 'জীবন-যৌবন-ধন-মান'কে মাপে।

ট্যাক্সি ড্রাইভারের ডাকে প্যাসেঞ্জারের তখন বোধহয় চৈতন্য ফিরলো। বললে—হুঁ—

প্যাসেঞ্জারটি ঘুম ভেঙে উঠে চারদিকে চেয়ে একবার দেখে নিলে। তারপর বললে—কত টাকা ভাড়া উঠেছে ?

ড্রাইভার জানালো—পঞ্চাশ রুপাইয়া—

প্যাসেঞ্জার বললে—তুমি একটু দাঁড়াও সর্দারজী, আমি আসছি—

হিন্দুস্তান রেকর্ডিং কোম্পানির ভেতরের অফিসে তখন অফিস চালাচ্ছেন যামিনী মতিলাল মশাই। তিনিই টাকা-কড়ির লেন-দেন চালাতেন। তিনি শিশির ভাদুড়িকে চিনতেন। তাঁকে দেখেই যামিনীদা উঠে দাঁড়ালেন। অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে বললেন—আরে আপনি ? আপনি হঠাৎ এলেন··· ?

শিশির ভাদুড় বললেন—ভাই, আমার ট্যাক্সি বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চাশ টাকা ভাড়া উঠেছে মিটারে, আমার কাছে একটা পয়সাও নেই···

সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির মালিক চণ্ডীদা'র কাছে খবর চলে গেল যে শিশির ভাদুড়ী মশাই হঠাৎ অফিসে এসেছেন। 'চণ্ডীদা' মানে 'সি-সি-শা'। চণ্ডীচরণ সাহা। তিনি খবর শুনে দৌড়তে দৌড়তে দোতলা থেকে নিচে নেমে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে যামিনীদা'কে ট্যাক্সির পঞ্চাশ টাকা ভাড়া মিটিয়ে দিতে হুকুম দিলেন। আর শিশিরবাবুকে রবীন্দ্রনাথের যে-কোনও একটি কবিতা আবৃত্তি করতে অনুরোধ করলেন

একটা রেকর্ডের দু'পিঠের জন্যে। শিশিরবাবু তো রাজি হয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। তাঁকে 'চণ্ডীদা'র গাড়িতে করে তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তার পরের দিনই তাঁকে আবার ডেকে আনিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'বহুদিন মনে ছিল আশা···' কবিতাটা তাঁর গলায় রেকর্ড করিয়ে নিলেন হিন্দুস্তানের রেকর্ডিস্ট গণেশবাবু।

কিন্তু রেকর্ডটা বাজারে বেরোবার পরে রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হলো না শিশিরবাবুর আবৃত্তি। তিনি তখন প্রস্তাব দিলেন যে তিনিও ওই কবিতাটিই আবার রেকর্ডবদ্ধ করতে চান। সেই সূত্রেই সেই ছেলেটা সেদিন কলেজ পালিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখবার জন্যে হিন্দুস্তান কোম্পানির স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলো। স্টুডিও তখন অনেক শিল্পীর ভিড়ে জম-জমাট। আশালতা, রাধারাণী, বুলা মহলানবিশ, গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, ভোম্বলদা, সজনী মতিলাল, নিতাই মতিলাল, শচীন দেববর্মন, সায়গল, রামকিষেণ মিশ্র আর অনিল বাগচী প্রভৃতি সমস্ত শিল্পীরা তো ছিলেনই। তাঁদের সঙ্গে ছিল অনিল বিশ্বাস, পান্না ঘোষ, অনুপম ঘটক, প্রফুল্ল মিত্র—যিনি চণ্ডীদার সমস্ত কাজের বিশ্বস্ত-সহায়ক। আর ছিলেন সেকালের প্রখ্যাতা অভিনেত্রী এবং গায়িকা কানন দেবী।

এই সূত্রে একটা তুচ্ছ কিন্তু উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা সেই ছেলেটার এখনও মনে আছে। যখন সবাই ভিড় করে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ রেকর্ডস্থ করার আয়োজন দেখতে ব্যস্ত, তখন কানন দেবী পাশের একজন দায়িত্ব-পূর্ণ সঙ্গীকে খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন—এখন কবির বয়স কত ?

কানন দেবী ভেবেছিলেন কবি যখন এত বৃদ্ধ হয়েছেন তখন তাঁর কথা তিনি শুনতে পাবেন না। কিন্তু ওই বৃদ্ধ বয়সেও কবির পঞ্চেন্দ্রিয় যে কত তীক্ষ্ম ছিল তা কবির নিজের জবাবেই বোঝা গেল। কানন দেবীর প্রশ্নের উত্তরে তাঁর সঙ্গীর বদলে কবিই জবাব দিলেন—আমি গয়লা হলে তোমরা বলতে আমার এখন বুদ্ধিই হয়নি।

ঘটনাটি যত তুচ্ছই হোক কিন্ত এই কারণেই সেটা উল্লেখযোগ্য যে সেই বৃদ্ধ বয়েসেও কবির রসবোধ এবং শ্রুতিশক্তি কত তীক্ষ্ম ছিল এটা তারই প্রমাণ।

এর পরেও আরো অনেক ঘটনার কথা সেই ছেলেটার আজও মনে আছে। তার কেবল মনে হতো যে, যে জিনিসটা খেলে পা এবং মস্তিষ্কের ওপরে মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমে যায় তা কেন লোকে সাধ করে

খাবে ? দেশে স্বাধীনতার আগে তবু মদ্যপান নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই সীমিত ছিল, কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে এই মদ্যপান একটা আভিজাত্যের লক্ষণ হিসেবে পরিগণিত হলো। তখন তার নাম দেওয়া হলো 'কক্‌টেল্‌ পার্টি'। ইণ্ডিয়ার সমস্ত রাজ্যে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে এবং বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাসে নিমন্ত্রিত হয়ে সে গিয়ে দেখেছে যে সেখানেও আভিজাত্যের এই 'কক্‌টেল্‌'-কালচারের চক্রান্ত। সে এও শুনেছে যে ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর পতনের মূলের নাকি অন্যতম কারণ এই 'ককটেল-কালচারের' বিরোধিতা।

আর বিখ্যাত গায়ক কে এল সায়গল ? কুন্দনলাল সায়গল ? তাঁকে দিয়ে গানের রেকর্ড করিয়ে নেওয়ার জন্যে প্রধান অস্ত্র এবং আকর্ষণ ছিল টাকার নয় বোতলের প্রলোভন। চণ্ডীদা'র বেসরকারী সহায়ক প্রফুল্ল মিত্র নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে সায়গলকে টেলিফোন করে জানাত, 'সায়গল চলে এসো বোতল রেডি'। আর সায়গলের মতন প্রতিভাধর গায়ক সেই আকর্ষণে সব কাজকর্ম ফেলে চলে আসত হিন্দুস্তান স্টুডিওতে। ওই জিনিসটা পেটে না পড়লে সায়গলের গলায় গান বেরোত না।

আর একদিনের ঘটনা সেই ছেলেটা জীবনে কোনও দিনই ভুলবে না। তখন বোধহয় ঘড়িতে রাত আটটা। বালিগঞ্জের সর্দার শঙ্কর রোড দিয়ে যেতে যেতে একদিন হঠাৎ সে দেখলে ফুটপাথের ওপর একটা বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে একজন লোক। সেই ছেলেটা প্রথমে বুঝতে পারেনি কে ওখানে পড়ে আছে। একটা জোয়ান পুরুষ শুয়ে পড়ে আছে দেখে সে প্রথমে ভেবেছিল কোনও মাতাল-টাতালের হয়তো ওই দুরবস্থা হয়েছে। এ দৃশ্য কলকাতার মতো শহরে হামেশাই ঘটছে। তেমন নতুন কিছু দৃশ্য নয়। কিন্তু হঠাৎ একটা অবাক কাণ্ড ঘটলো। ঠিক সেই সময়ে রাস্তা দিয়ে একজন রূপোপ-জীবিনী রিকশায় চড়ে বোধহয় নিত্য-কর্মের তাগিদে খদ্দের পাকড়াতে বেরিয়েছিলেন। তিনি রিকশা থামিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন—আমার বাবু, আমার বাবু—

বলে কাঁদতে কাঁদতে তিনি সেই অচৈতন্য মানুষটার পাশে এসে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ডাকতে লাগলেন—বাবু অ বাবু, বাবু—

সেই ছেলেটা মহিলাটির কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলে—কে আপনার বাবু ? কাকে ডাকছেন ?

মহিলাটি বললেন—সায়গল সাহেব, আমার বাবু—ওঁকে ধরাধরি

করে আমার রিকশায় তুলে দিন না—

আগে অন্ধকারে ছেলেটা সায়গলকে চিনতে পারেনি। এবার মহিলাটির কথায় ভালো করে নজর দিয়ে দেখলে। তাই তো বটে! এ তো সেই কে এল সায়গলই! যার গানকে সেই ছেলেটা পুজো করে।

একজন শিশির ভাদুড়িকে আগেই সে দেখেছিল, এবার সে দেখলে সায়গলকে। প্রতিভাধর শিল্পীদের এই নৈতিক অপচয়ের জন্যে কে দায়ী? সেই ছেলেটা নিজেকেই কেবল সেই প্রশ্নটা করেছে বার বার। কিন্তু আজও তার কোনো উত্তর মেলেনি।

মদের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক কথা তার শোনা আছে। আজকাল তো প্রখ্যাত চিকিৎসকরা পর্যন্ত অনেক রোগীকে অল্পমাত্রায় 'অ্যালকোহল' খেতে পরামর্শ দেন। সেই অল্প মাত্রাটা কে মেপে ঠিক করে দেবে? রোগী নিজেই না তার কোনো সেবক? এমন সেবক কোথায় আছে যে তার মনিবের হুকুমকে অগ্রাহ্য করবে?

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ম এখন একটি বিশ্ববিদিত নাম। ওমর খৈয়ম কয়েকশো বছর আগে ওই 'রুবাইয়াৎ' লিখে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ। এবং একজন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকও বটে। অবসর সময়ে তিনি নিজের মনের ইচ্ছেগুলো নিজে পড়ে আনন্দ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই কবিতাগুলো মাতৃভাষায় লিখে গিয়েছিলেন। কোনোদিন তিনি কল্পনাও করেননি সেগুলো ছাপা হয়ে একদিন বিশ্বের মানুষকে আনন্দ দেবে। তার পর কিভাবে ঘটনাচক্রে একদিন হঠাৎ ওটা ফিট্‌জারেল্‌ড্‌ সাহেবের নজরে পড়ে যায়। তিনি সেগুলোর ইংরিজি অনুবাদ করে বই হিসেবে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। সেই ফিট্‌জারেল্‌ড্‌ সাহেবও নিজের জীবদ্দশায় দেখে গিয়েছিলেন যে সে-বই কেউ ছুঁলোও না। তারপরে একশো বছর কেটে গেল, কেউ ওই বইয়ের নাম-গন্ধও করলে না। কিন্তু হঠাৎ এই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ওই কবিতাগুলোর মধ্যে কে একজন সমালোচক 'দেবত্ব' আবিষ্কার করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীতে হৈ চৈ পড়ে গেল।

সবাই জানেন 'ওমর খৈয়মে'র রুবাইয়াতে 'সাকী' আর 'সুরার' ছড়াছড়ি আছে। তার মানে 'নারী' আর 'মদ'। যে-দুটোর সম্বন্ধে বিদগ্ধ জনের খুব বিরাগ আছে। কিন্তু সেই সমালোচক যখন লিখলেন যে ওই 'সাকী' মানে 'ভক্ত' আর 'সুরা' মানে 'ভক্তি' তখনই পৃথিবীময় বইটার ওপরে প্রশংসার বন্যা বয়ে গেল। তাঁরা যখন বললেন ওটা একটা

উচ্চাঙ্গের প্রতীকী কাব্য, তখন এড্‌ওয়ার্ড ফিট্‌জারেলড্‌ আর পারস্য ভাষার দার্শনিক বৈজ্ঞানিক এবং গণিতজ্ঞের নাম বিশ্বের লোক জানতে পারল। অমর হয়ে গেলেন পারস্যের কবি ওমর খৈয়ম আর তার অনুবাদক এড্‌ওয়ার্ড ফিট্‌জারেল্‌ড্‌। কিন্তু তাঁরা কেউই তাঁদের কীর্তি জীবদ্দশায় ভোগ করে যেতে পারেননি যা খুবই স্বাভাবিক। বাঙলার কবি রামপ্রসাদও সুরার ভক্ত ছিলেন। কিন্তু সে অন্য 'সুরা'। তাঁর লেখা গান এখনও অনেকে নিশ্চয়ই শুনেছেন। সেই গানটিই সে আংশিক উদ্ধৃত করে দিচ্ছে ঃ

ওরে সুরা পান করিনে আমি
সুধা খাই জয় কালী বলে
মন-মাতালে মাতাল করে,
মদ-মাতালে মাতাল বলে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা,
শোধন করি বলে তারা।
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা
খেলে চতুর্বর্গ মেলে।

ভারতবর্ষের তান্ত্রিক সাধনায় তো সুরা পানে উৎসাহই দেওয়া হয়েছে। সুরা পান এ-দেশে তো ধর্মেরই অঙ্গ হয়ে গেছে সুতরাং সেই ছেলেটা যে মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে বলবে এমন সাহস তার নেই। শুধু এই প্রসঙ্গে ফরাসি দেশের প্রখ্যাত নোবেল পুরস্কার পাওয়া লেখক আলবেয়র কামুর একটা কথা সে তুলে দিচ্ছে। কামু বলে গেছেন "Drink drives out the man and brings out the beast (Note books-page 10) তার মানে হলো—'মদ মানুষের ভেতর থেকে মনুষ্যত্বকে তাড়িয়ে দিয়ে তার ভেতরের পশুত্বকে টেনে বাইরে তুলে আনে।'

যা হোক, সেদিন দুজনে মিলে সায়গলকে রিকশার ওপর উঠিয়ে দেওয়াতে মহিলা তাঁর বাবুকে নিয়ে কোথায় চলে গেলেন তা সেই ছেলেটা জানতে পারলে না, জানতে চাইলেও না। তার তখন কেবল মনে হতে লাগলো প্রতিভাধর মানুষদের সঙ্গে বিধাতা পুরুষের এ কেমন তামাশা! মনুষ্যত্বের সঙ্গে পশুত্বের এ কেমন বিসদৃশ সহাবস্থান! সেই ছেলেটা সেদিন আকাশের অদৃশ্য দেবতাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করতে লাগলো—এর উত্তর দাও ভগবান, এর উত্তর যা-কিছু একটা দাও, নইলে যে আমার লেখক হওয়া হবে না—

সেদিন আকাশের অদৃশ্য দেবতা সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি। দিয়েছিলেন বহুদিন পরে ঈশ্বরের হয়ে মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজী ঈশ্বরের হয়ে সেই ছেলেটাকে বলে গিয়েছিলেন--"You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty."

তার মানে হলো এই যে—'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিও না খোকা। মানবতা হলো একটি সমুদ্র। সমুদ্রের কয়েক ফোঁটা জল যদি ময়লাও হয় তো তাতে সমুদ্র কখনও অপবিত্র হয় না।'

যা হোক, এর পরে সেই ছেলেটার জীবনে এমন একটা স্মরণীয় ঘটনা আবার ঘটলো যাতে সে কলকাতার শহর-জীবনের উল্টো পিঠটাও দেখবার সুযোগ পেয়ে গেল। সেও এই গানেরই সূত্রে যে হতভাগা ছেলেটা ততদিনে এক আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক অমল রায়চৌধুরি ছাড়া আর কারো কাছ থেকে ভালবাসা পায়নি সে হঠাৎ অগাধ নিঃস্বার্থ ভালোবাসা পেয়ে গেল আর একজনের কাছ থেকে। সেইটে এবার বলি—

সেদিন সেই ছেলেটা যথারীতি বাস থেকে নেমে শংকর ঘোষ লেন দিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে কলেজের দিকে যাচ্ছে। সব কাজে বরাবর সে যেমন লেট-লতিফ, সেদিনও তেমনি কলেজে পেঁছিতে তার দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই সামনের দিকে চেয়ে হন্‌হন্‌ করে সে চলেছে। হঠাৎ সামনের দিক থেকে তার দিকে একটি ছেলে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো, বললে--আপনার খোঁজেই আমি কলেজে গিয়েছিলুম। আপনাকে না পেয়ে বাড়িতে ফিরে যাচ্ছিলাম। দেখা হয়ে গেল তাই ভালোই হ'ল। আপনি এখন একবার আমাদেব বাড়িতে আসতে পারেন ?

সেই ছেলেটা ভাবলে--এ বলে কী ? তার সঙ্গে তার জানাশোনা নেই, তার বাড়ি কোথায় তাও সেই ছেলেটা জানে না, আর তাদের বাড়িতে যাবে ?

সেই ছেলেটা জিজ্ঞেস করলে—আপনাদের বাড়ি কোথায় ? আপনি কে ?

সে উত্তর দিলে—আমাদের বাড়ি এই কলেজের পেছনেই। আমাদের

বাড়ির ঠিকানা ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট। আমার নাম সতু লাহা। সতীন্দ্র নাথ লাহা। ঠিক 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে'র মন্দিরটার উলটো দিকের বাড়িটা। আমি এই কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ি—

সেই ছেলেটা জিজ্ঞেস করলে—আপনাদের বাড়িতে আমাকে যেতে বলছেন কেন?

সতু লাহা বললে—আমাদের কলেজের বাংলার প্রফেসর পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। তিনিই আপনাকে কলেজ থেকে ডেকে আনতে বলেছিলেন। তাই আপনাকে ডাকতে গিয়েছিলাম আমি—তিনি আমাদের বাড়িতে বসে আছেন।

সেই ছেলেটা তো অবাক। পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস তো তাদের কলেজের বাঙলার অধ্যাপক, তা সে জানে। কিন্তু সেই ছেলেটা তো বরাবর কলেজে দেরি করে আসে। কারণ, সে জানে যে, সে দেরি করে এলেও তার কোনও ক্ষতি হয় না। বিদ্যাসাগর কলেজের নিয়ম ছিল অধ্যাপকরা ক্লাস আরম্ভ হওয়ার সময় 'রোল কল' করতেন না। ক্লাস শেষ হওয়ার শেষের দিকে রোল কল করতেন যাতে দেরি করে আসা ছাত্ররা উপস্থিতির প্রমাণ দাখিল করতে পারে। আর সে দেরি করে ক্লাসে আসে বলে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পেছনের বেঞ্চিতেই বসে। অর্থাৎ এখনও যেমন সে সাহিত্যের জগতে 'ব্যাক-বেঞ্চার', ছাত্র জীবনেও সে বরাবরই ছিল তেমনি 'ব্যাক বেঞ্চার'। এখনকার মতো তখনও সে সকলের চোখের আড়ালে থাকতেই স্বস্তি পায়, আরাম পায়, শান্তি পায়। যে স্রষ্টা হতে চাইবে তাকে বরাবর আড়ালেই থাকতে হবে—এই বিশ্বাস নিয়েই সে বড়ো হয়েছে।

সেই ছেলেটা বললে—আমি ক্লাসটা এ্যাটেণ্ড করেই আসছি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন—বলে কলেজের দিকে চলে গেল।

ক্লাসটা শেষ করে যখন সে বাইরে এলো তখন দেখলে সেই সতু লাহা তার জন্যে তখনও অপেক্ষা করছে। সতু লাহার চেহারার বর্ণনা না দিলে তার চরিত্রের বিশিষ্টতা স্পষ্ট হবে না। একটা সোনালি রং-এর মুগার শার্ট। মুগার পাড়ওয়ালা চুনোট করা কোঁচানো ধুতি। পায়ে হরিণের চামড়ার চটি। আর গায়ের রং? দুধে আলতা টুসটুসে গায়ের রং। দেখেই মনে হয় যেন একটু টোকা দিলেই সেখান থেকে লাল রক্ত ঝরে পড়বে টস্‌টস্‌ করে।

বাইরে এসে সে জিজ্ঞেস করলে—পূর্ণবাবু আমাকে ডেকেছেন কেন? কারণটা কী?

সতু বললে—কালকে আপনি কলেজের মিটিং-এ গান গেয়েছিলেন, তাই···

ঘটনাটা স্পষ্ট করে খুলে বলা দরকার। ছোটবেলা থেকে সেই ছেলেটা সঙ্গীত আর সাহিত্য দু'টোরই ভক্ত ছিল। সাহিত্যের কথা তো আগেই অনেক বলা হয়েছে। এবার সঙ্গীতের কথা বলা যাক। ১৯২৮ সালে যখন প্রায় কোনও বাড়িতে রেডিও সেট ছিল না, তখনই তাদের বাড়িতে তার মেজদাদা জার্মানি থেকে ফেরার সময় একটা রেডিও সেট নিয়ে আসে। তখন বোধহয় সবে মাত্র কলকাতা আর বোম্বাই শহরে বেসরকারি ব্রডকাস্টিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তারও আগে গ্রামোফোনের রেকর্ডে কে মল্লিক, আঙুরবালা, ইন্দুবালা সকলেরই গান সে শুনেছে। আর শুধু যে শুনেছে তাইই নয়, ঠিক তাঁদের গানগুলো অনুকরণ করে সেই ছেলেটা আড়ালে-আবডালে গেয়েওছে। তাঁরা যেমন-যেমনভাবে গেয়েছেন সেও ঠিক ঠিক সেইভাবে গানগুলো গলায় তুলে নিতে পেরেছে। তাঁদের পরেই এসেছেন অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে। মালকোশ রাগের ঠাটে গাওয়া গান 'দীনতারিণী তারা' গানটা তখন বাজার মাৎ করে দিয়েছে। সেই ছেলেটাও ঠিক সেইভাবে গলায় তুলে নিয়েছে সেই গানটা। তারপর যে গায়িকা সেই ছেলেটাকে খুব বেশি প্রভাবিত করেছে তিনি হলেন কমলা ঝরিয়া, আর তার পরে কণক দাস। তিনিই রবীন্দ্রসঙ্গীতে সব চেয়ে বেশি পারদর্শিনী তখন। তার পরেই কলকাতার বিখ্যাত রেডিও শিল্পী কালিপদ পাঠক। নিধুবাবুর টপ্পা অঙ্গের গানে ভূভারতে তাঁর জুড়ি নেই। তাঁর গাওয়া সেই অমৃতলাল বসুর লেখা গানটা এখনও সে ভোলেনি। গানটি হ'ল :

এ আদর দু'দিন বই তো নয়।
বলছো যে নতুন গুড়ের নামটি নলিন
পোষ পোহালে হবে মলিন
তখন আখের রসে পরাণ বশে
তাকেই লাগে মধুময়।
এ আদর দু'দিন বই তো নয়॥

শাস্ত্রকাররা সঙ্গীতকে বলেছেন, 'ব্রহ্মস্বাদ' আর সাহিত্যকে বলেছেন, 'ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর'। অর্থাৎ শাস্ত্রকাররা সাহিত্যের একধাপ ওপরে স্থান দিয়েছেন সঙ্গীতকে। রসবিচারে তাই সঙ্গীত সমস্ত রসের ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছে। তার পরে সাহিত্যের স্থান। রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন। 'সকলের সব হইবাব অধিকার নাই'। সেই ছেলেটার দ্বারা তাই সঙ্গীত

হয়নি। তার কারণ, সে লাজুক। গান গাইতে গেলে সশরীরে হাজার হাজার লোকের সামনে গিয়ে উপস্থিত হতে হয়। আর বাড়িতে বসে সঙ্গীতের রেওয়াজও করতে হয়। হাজার দরজা-জানলা বন্ধ করা থাকলেও তাতে প্রতিবেশীদের বিরক্তি উৎপাদনের আশঙ্কা থাকে—বিশেষ করে শিক্ষানবীশির সময়ে। কিন্তু সাহিত্যের শিক্ষানবীশকালে ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে ছেলেটা বই পড়ছে, না ঘুমোচ্ছে, না লেখার হাত-মকশো করছে তা কারো জানবার উপায় থাকে না।

একটা ঘটনার কথা পড়া আছে শরৎচন্দ্রের জীবনীতে। কবি নবীনচন্দ্র সেনের বর্মা-মুলুকে যাওয়া উপলক্ষ্যে একরাব বর্মা-প্রবাসী বাঙালিরা তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেই সভায় পর্দার আড়ালে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন যিনি তিনি হলেন শরৎচন্দ্র। গান শুনে নবীনচন্দ্র সভার উদ্যোক্তাদের প্রশ্ন করেন—যে গানটি গাইলে সে কে? তার জবাবে উদ্যোক্তারা বললেন—ছেলেটি ভারি লাজুক, তাই পর্দার আড়াল থেকে গান গেয়েছে, প্রকাশ্যে আসতে চায়নি। প্রথমে গান তো গাইতেই চায়নি, অনেক পীড়াপীড়ির পরে পর্দার আড়াল থেকে গান গাইতে রাজি হয়েছিল—

নবীনচন্দ্র জিজ্ঞেস করেছিলেন--অত ভালো গান গায়, অথচ এত লাজুক? ছেলেটির নাম কী?

তাঁরা বললেন--এর নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এখানকার এ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেলস্ অফিসের ক্লার্ক।

নবীনচন্দ্র বললেন--একবার ওকে আমার সামনে নিয়ে আসুন তো। এমন গায়ককে একবার আমি নিজের চোখে দেখতে চাই—

উদ্যোক্তারা শরৎচন্দ্রকে ডেকে আনতে গেলেন, কিন্তু কোথায় শরৎচন্দ্র! তিনি কখন এর আঁচ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই নিরুদ্দেশ! সেদিন আর কেউ তাঁকে খুঁজে পায়নি। কিন্তু নবীনচন্দ্র যেন তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে 'রেঙ্গুন-রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করে গিয়েছিলেন। এ কথা শরৎচন্দ্রের জীবনী গ্রন্থ যাঁরাই পড়েছেন তাঁদেরই জানা আছে।

তখন সেই ছেলেটা এসব জানতো না। কিন্তু তার দুর্ভাগ্যেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। তখন যে সে শুধু আড়ালে আবডালে গান গাইতো তাইই নয়, গান আবার লিখতোও। 'মাসিক বসুমতী', 'বেণু', 'শিশুসাথী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তখন তার অনেক কবিতা বেরিয়েও গিয়েছে। অনুপমের অনুরোধে কয়েকটা গানও লিখতে হয়েছিল। এবং

তার জন্যেই এক-একটা গান পিছু বারোটা করে টাকাও তার হাতে এসে যেতো। এ রকম প্রতি মাসে কখনও তিনটে, কখনও চারটে কি পাঁচটা গানও তাকে লিখতে হয়েছে। তখন 'কলম্বিয়া' কোম্পানিও গানের রেকর্ডের কারবারে নেমে গেছে। তাঁদের গানেরও ট্রেনিং হয় হিন্দুস্থান স্টুডিওতে। অনুপম তাদেরও ট্রেনার। তখন আরো গানের তাগাদা আসে। আরো আর্টিস্ট লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের গান রেকর্ড করবার জন্যে। তাদের গান কে লিখবে? আবার কে, সেই ছেলেটা।

একদিন হঠাৎ অনুপম বললে—হ্যাঁরে, তুই গান রেকর্ড করবি?

কোথায় সেই ছেলেটা সাহিত্যিক হবে, লেখক হবে, কোথায় সেই ছেলেটার নাম ছাপা হয়ে বই বেরোবে, তা নয় গান? আর শুধু গান নয়, গানের রেকর্ড?

একবার সত্যযুগে কবে দশচক্রে পড়ে ভগবানকে ভূত হতে হয়েছিল। আর এই কলিযুগেও কি সেই ছেলেটা তার সাহিত্যের অঙ্কলক্ষ্মীকে ত্যাগ করে এই সঙ্গীতকে অঙ্কলক্ষ্মী করে নেবে নাকি?

সেদিন দ্বন্দ্ব বাধলো সেই ছেলেটার মনে। সঙ্গীত, না সাহিত্য, কোনটা? সেই ছেলেটার কাছে তখন সঙ্গীত অনেক সহজ। একটা গান হাজার জায়গায় গাইলেও কেউ তাকে দোষী করবে না। কিন্তু সাহিত্যের একটা গল্প তো দু'বার লেখা চলবে না। তাকে প্রত্যেকবারই তো নতুন কাহিনী বানাতে হবে আর লিখতে হবে।

তা কি সোজা?

ইংরেজি সাহিত্যের বা পৃথিবীর সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলতে গেলে 'রবিনসন্ ক্রুসো'। বইটার নাম সবাই-ই জানে। কিন্তু লেখকের নাম কী? লেখকের নাম ড্যানিয়েল ডিফো। ড্যানিয়েল ডিফো নিজের জীবনকালে প্রায় ২৯টি বই লিখেছিলেন কিন্তু অন্য সব বই-এর নাম মুছে গেছে মাত্র 'রবিনসন ক্রুসো'র নামটা কেউ ভোলেনি বা ভুলতে পারেনি। তিনি জমি, গেঞ্জি, কাপড়, ইট, টালি আরও কত কী'র ব্যবসা করেছেন, কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যে কোনও ব্যবসাতে তেমন ভালো করে মন দিতে পারেননি। তার ফলে কোর্ট থেকে তাঁকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হ'ল। তখন তাঁর দেনার পরিমাণ ছিল আজকালকার টাকার মূল্যের অনুপাতে চার-পাঁচ লক্ষ টাকার মতো। সে দেনাও তিনি শোধ করে দিতে পারতেন। তখনকার দিনে 'দেউলিয়া' হলেই ধার শোধ করার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যেত না। কিন্তু গ্রেপ্তার

না হলে তিনি সেই ঋণের টাকাও শোধ করে দিতে পারতেন।

তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার কারণ তাঁরই একটা বই। সেই বইটি লেখার জন্যেই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরোল।

ইংল্যাণ্ডের রাজা উইলিয়াম দি থার্ডের পরামর্শদাতা ছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ রাজার মৃত্যু হওয়ায় তাঁর জীবনে দুর্দিন ঘনিয়ে এল। এতদিন রাজার প্রিয় পাত্র হওয়ায় যারা হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরতো, তারা এবার তার শোধ নিতে লাগলো। চাকরির তো এই জ্বালা। তিনি গ্রেপ্তার এড়াবার জন্যে চার মাস আত্মগোপন করে রইলেন। কিন্তু শেষকালে ধরা পড়লেন এবং তাঁর বিচার হ'ল। বিচারে তাঁর জরিমানা হ'ল, সাত বছর সৎভাবে জীবন যাপনের প্রতিশ্রুতি দিতে হ'ল। আর একটা যা শাস্তি দেওয়া হ'ল তাঁর নাম 'পিলোরি'। সেই 'পিলোরি'তে গিয়ে তিনদিন দাঁড়িয়ে থাকা মানে এক অমানুষিক শাস্তি। একটা খোলা জায়গায় আসামীর হাত-পা গুলো এমনভাবে আটকে দেওয়া হয় যে সে নড়া-চড়া করতে পারে না। মাথার ওপরে লিখে দেওয়া হয়, আসামীর অপরাধের বিবরণ! কৌতূহলী দর্শক ভিড় জমায় সামনে। তারা আসামীর গায়ে ঢিল ছুঁড়ে মজা পায়। রক্ষীরা তাদের বাধা দেয় না। ডিফোকেও এই শাস্তি মাথা পেতে গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনদিন তিনি এইভাবে এক নাগাড়ে দাঁড়িয়ে এই শাস্তি গ্রহণ করেছিলেন। তার বদলে জীবনে তিনি কী প্রতিদান পেয়েছিলেন? পেয়েছিলেন রাজরোষ, ঘৃণা, অপমান, সমস্ত কিছু। ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল প্রকাশিত হয়েছিল 'রবিনসন ক্রুসো'—পৃথিবীর প্রথম প্রকৃত উপন্যাস। একটা নিঃসঙ্গ দ্বীপের মধ্যে একটি মানুষের বাঁচবার জন্যে অক্লান্ত সংগ্রামের কাহিনী হ'ল 'রবিনসন ক্রুসো'র বিষয়বস্তু। একমাত্র বাইবেলের পর আর কোন লেখকের বই এমনভাবে এত বিক্রি হয়নি। কিন্তু বই বিক্রির কোন টাকাই কোনও দিন তাঁর হাতে আসেনি। বই বিক্রি করে প্রকাশকরা যা দিচ্ছেন সমস্তই নিয়ে যাচ্ছেন তার পাওনাদাররা। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হচ্ছে তাঁর বই, কিন্তু তিনি তাঁর জীবন-ধারণের জন্যে একটা পয়সাও পাচ্ছেন না, গোর্কি তার এই বই সম্বন্ধে বলেছেন—'রবিনসন ক্রুসো' হচ্ছে 'The Bible of the unconquerable'। আলবেয়ার কামু তাঁর 'প্লেগ' বইটি লিখতে গিয়ে ড্যানিয়েল ডিফোর লেখা 'A journal of the plague year' নামের বইটি থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছেন।

অক্রুর দত্ত লেন থেকে দমদমের H. M. V. স্টুডিওতে নিজের গলার গান রেকর্ড করতে যাওয়ার পথে সেই ছেলেটার কেবল এই সব কথাই মনে পড়ছিল। সাহিত্য ছেড়ে সঙ্গীতকে অঙ্কলক্ষ্মী করা অবশ্যই ভালো। কিন্তু অমরত্ব? অমরত্ব পেতে গেলে তো ড্যানিয়েল ডিফোর যন্ত্রণাটাও বরণ করে নিতে তৈরি থাকা চাই। তাহলে সে কোনটা বেছে নেবে? সাহিত্যের যন্ত্রণা আর অমরত্ব, না সঙ্গীতের গ্ল্যামার, কোনটা?

সেসব দিনের কথাও সেই ছেলেটার মনে আছে। মনে আছে, বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে তার স্বর্ণপদক পাওয়ার কথা। মনে আছে সেই কলেজের আরো কী একটা সাংস্কৃতিক উৎসবে গান গেয়ে সকলকে স্তব্ধ করে দেওয়া সকলের হাততালি পাওয়ার সেই গ্ল্যামার! সেই সভার সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস। তাই তিনি সতু লাহাকে পাঠিয়েছেন সেই ছেলেটাকে দেখবার জন্যে। শরৎচন্দ্র নবীনচন্দ্রের সঙ্গে দেখা না করে পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছিলেন, কিন্তু সেই ছেলেটা তো পালাতে পারলে না। সতু লাহা তাকে নিয়ে ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো। ছেলেটা অবাক হয়ে দেখতে লাগলো চারদিকে—এ কোথায় এল সে, লোহার গেটের পাশে সেই দারোয়ান। সামনের দিকে ঘোড়ার আস্তাবল। বাঁদিকে ঘুরেই চক্‌মিলান বাড়ির বার-বাড়ির উঠোন। সেই ছেলেটার মনে হল সেটা যেন ১৩ নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়ি নয়। সেটা যেন বনমালী সরকার লেনের 'বড়বাড়ি'। ঠিক সেই রকম পশ্চিম-মুখো পুজোর দরদালান। যেখানে 'সিংহ-বাহিনী'র পুজো হয়। আর তখন সেই ছেলেটাও যেন আর সেই ছেলেটা রইলো না। সে নিজেই যেন ভূতনাথ হয়ে গেল হঠাৎ। ভূতনাথই যেন বনমালী সরকার লেনের 'বড়বাড়ি'র ভেতরে ঢুকছে বংশীর পেছন পেছন। বড়বাড়ির বার-বাড়িতে ঢুকেই ডানদিকে দু'ধাপ উঠে রোয়াক। তার ওপর দিয়ে যেতে যেতে একটা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেলে সেই ছেলেটা। একজন চাকর একজন বৃদ্ধের হাতে জল ঢেলে দিচ্ছে হাত পরিষ্কার করবার জন্যে। বৃদ্ধ মানুষটি বসে বসে তাঁর দুটো হাত ধুচ্ছেন সাবান দিয়ে, আর চাকরটি তাঁর হাতে মগে করে জল ঢেলে দিচ্ছে। বৃদ্ধ মানুষটির পাশে অনেকগুলো সাদা রং-এর চৌকো চৌকো সব জিনিস পড়ে রয়েছে।

দু'পা এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে বেঁকতে হবে। সেখানে ওপরে দোতলায় ওঠবার কাঠের সিঁড়ি। সেখানে গিয়ে সেই ছেলেটা আর

কৌতূহল দমন করতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—উনি কে? উনি কী করছেন?

সতু লাহা বললে—চৌষট্টি বার না ধুলে আমার মেজকাকার হাত পরিষ্কার হয় না। পাছে যোগে ভুল হয়ে যায় তাই একটা সাবানকে ওইরকম চৌষট্টি টুকরো করে কেটে গুণে গুনে পাশে রাখা হয়েছে। একটা করে টুকরো দিয়ে মেজকাকা হাত ধোবেন আর সেই টুকরোটাকে উঠোনে ফেলে দেবেন। সব টুকরোগুলো যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তিনি নিশ্চিত হবেন যে ও'র হাত সত্যিই পরিষ্কার হয়েছে, তার আগে নয়। গুণতিতে একটু ভুল হলেই সর্বনাশ।

ভূতনাথের মতো সেই ছেলেটাও সতু লাহার কথাগুলো শুনে অনেকক্ষণ হতবাক হয়ে রইলো···ঠিক অনেককাল পরের ভূতনাথের মতোই···

ঈশ্বরের মনে কী অভিপ্রায় ছিল কে জানে, নইলে সেদিন তিনি সেই ছেলেটাকে ওই রকম অচেনা অদেখা প্রাসাদে পেঁছিয়ে দিলেন কেন? এখনকার মতো দশ-পনেরো তলা মালটি-স্টোরিড ফ্ল্যাট বাড়ির যুগের ছেলেমেয়েরা সে বাড়ির কল্পনা পর্যন্ত করতে পারবে না। আর সেই হতভাগা ছেলেটা কিপলিং-এর সেই 'কলকাতা' নামের বিখ্যাত কবিতাটা আগেই পড়ে ফেলেছিল। তিনি কলকাতাকে 'chance erected chance directed' শহর বলেছিলেন। তার মানে 'হঠাৎ তৈরি করা হঠাৎ গজিয়ে গঠা' শহর। তার দু-তিন লাইন পরেই আবার বলেছিলেন 'Palace, byre, hovel, poverty and pride, side by side' অর্থাৎ 'প্রাসাদ, গরুর খাটাল, ঝুপড়ি, দারিদ্র্য আর অহঙ্কারের সহাবস্থানে'র শহর কলকাতা। সেই ছেলেটার সেই উনিশ-কুড়ি বছর বয়েসের পরমায়ুতেই গরুর খাটাল, ঝুপড়ি, দারিদ্র্য আর অহঙ্কারও দেখা ছিল। সেই ছেলেটা পরে লেখকদের অহঙ্কারও অনেক দেখেছে। মাত্র কয়েক বছর আগে তিনি পরলোকগমন করেছেন। এখন তাঁর বই বিক্রিও হয় না। মৃত্যুর আগেই তিনি দেখে গেছেন যে তাঁর খ্যাতি-প্রতিপত্তি সবই চলে গেছে, শুধু আছে তাঁর নিজের টাকায় তৈরি করা বাড়িটা। তাঁর বাড়ির একতলার সদর দরজার কড়া কেউ নাড়লেই তিনি দোতলার বারান্দা থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করতেন—কে?

আগন্তুক বলতেন—আমি কলেজ স্ট্রিট থেকে আসছি, একজন প্রকাশক—

'প্রকাশক' শব্দটা শুনেই তিনি ওপর থেকে বলতেন—চেক-বই এনেছেন ?

প্রকাশক ভদ্রলোক বলতেন—হ্যাঁ –

এই জবাবটা শোনার পর তবে সেই প্রকাশকের ভেতরে ঢোকবার অনুমতি মিলতো। তারপর ওপরে আসার পর লেখক জিজ্ঞেস করতেন-– শ্বেত হস্তী পুষতে পারবেন ?

এমন নির্লজ্জ অহঙ্কার যদি কোনও মানুষ করেও, তবু একজন লেখক কেন করবে ? যদি কোনও মানুষ এই অহংকারের ওপরেই তার জীবনের সমস্ত কাজকর্মের প্রতিষ্ঠা করতে চায় তো সে বালির ওপরে ঘর বাঁধে। যারা এটা জানে না তাদের মৃত্যুর আগেই তাদের সমস্ত কিছুই ধুলোর ওপরে পড়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

বাকি ছিল 'প্যালেস' দেখা, সেদিন সেই ছেলেটার তাও দেখা হল। সত্যিই 'প্যালেস'। প্রকৃত অর্থে প্যালেস। সেই বিদ্যাসাগর কলেজের সঙ্গীত প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে সেই ছেলেটার বন্ধুরা যদি তার নাম দিতে বাধ্য না করতো তা হলে তো সে সেই তেরো নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়ির ভেতরে প্রবেশাধিকার পেত না।

দোতলায় উঠে বাঁ দিকের ঘরটিই সাবেক আমলের নাচঘর। আগেকার কালে নাকি নাচঘরটা লম্বায় আরো আরো অনেক বড় ছিল। পরবর্তীকালে নাচঘরের প্রয়োজন নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার ফলে মাঝখানে দেওয়াল তুলে তুলে তাকে ছোট-ছোট ঘরে পরিণত করা হয়েছে। ঘরের ভেতরে ঢুকলে প্রথমেই যেটা নজরে পড়ে সেটা হলো কালো মার্বেল পাথরের টেবিলের ওপরে বিরাট একটা দাঁড়া-আয়না। তার সামনে দাঁড়ালে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব দেখা যাবে। দক্ষিণ দিকে একটা দরজা। তার বাইরে ঝুল বারান্দা। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে নিচেয় একটা বাগান দেখা যাবে। আর ঘরের মেঝেতে ফরাসের ওপর জাজিম পাতা। আর তার ওপরে এধারে-ওধারে ছড়ানো-ছিটানো কয়েকটা সাদা ওয়াড় পরানো তাকিয়া। ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, রামমোহন রায়, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি যে যুগে ওখানে ঘুরে বেড়াতেন, ওই বাড়িটাও ঠিক সেই যুগের সহযাত্রী ছিল এককালে। সেই ছেলেটা সেই মহাপুরুষদের দেখেনি, শুধু নাম শুনেছে। কিন্তু ওই বাড়িটাকে দেখে যেন তাঁদেরই স্পর্শ পেলে সে। ঘটনাচক্রে আশুতোষ কলেজ ছেড়ে বিদ্যাসাগর কলেজে এসে সঙ্গীত

প্রতিযোগিতায় নাম না দিতে বাধ্য হলে, আর ঘটনাচক্রে প্রথম স্থান অধিকার না করলে কি তার এই সৌভাগ্য হতো! বাড়িটার মোটা মোটা কাঠের কড়ি বরগা, মোটা মোটা কাঠের জানালা-দরজাগুলো সব মিলিয়ে পলাসির যুদ্ধের না হোক, সিপাহী-বিদ্রোহের সাক্ষ্য বহন করছে। বাড়িটা শুধু যে অতীতের রাজনৈতিক ইতিহাসেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাই-ই নয়, সাক্ষ্য দিচ্ছে বাঙলার সাংস্কৃতিক নব-জাগরণেরও। যখন মাইকেল মধুসূদন, ডিরোজিও, রাম গোপাল ঘোষ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি সবাই মিলে হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের বেড়াজাল ভাঙবার চেষ্টা করছেন, সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধনের জন্যে সংগ্রাম করছেন, তখন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হরিশ চন্দ্র মুখার্জির মতন লোক প্রাণ দিচ্ছেন। তিনি সমস্ত দিন অফিসে কলম চালিয়ে বাড়িতে এসেও আবার কলম চালাতেন তাঁর 'Hindu Patriot' পত্রিকার জন্যে রাত তিনটে আর কখনো বা ভোর চারটে পর্যন্ত জেগে জেগে। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে তাঁর অক্লান্ত লেখনী তখন শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনে যেমন বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছিল, তেমনি আবার অন্যদিকে ইংরেজ নীলকর সাহেবদের মনেও প্রতিশোধ-স্পৃহার আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছিল। তারা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করছিল—আচ্ছা, দেখে নেব এই লোকটাকে—

মা ছেলের এই পরিশ্রম দেখে ভয় পেতেন! বলতেন—ওরে, মানুষের শরীরে এত কষ্ট সইবে না, ওরে মারা পড়বি, কলম রাখ, কলম রাখ, একটু বিশ্রাম নে—

কিন্তু কে শোনে কার কথা! শরীর যায় যাবে। শরীর আগে, না কাজ আগে? তিনি যদি নীলচাষীদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবার চেষ্টা না করেন তো কে চেষ্টা করবে? নিজের সুখ-সুবিধার কথা তো সবাই ভাবে। তিনি যদি কেবল নিজের সুখ-সুবিধের কথাই ভাবেন তো অন্য দুঃখী মানুষদের কথা ভাববে এমন মানুষ কোথায়?

ঠিক সেই সময়ে ১৮৬০ সালে 'নীলদর্পণ' নামে একটি নাটক ছাপা হয়ে বেরোল। সে বই ঘরে ঘরে ইংরেজ নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুনে ইন্ধন জোগালো। সে বই যাতে সাহেবরা পড়ে বুঝতে পারে তার জন্যে নাটকটি ইংরেজি ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিতও হলো। কিন্তু কোথাও লেখকের বা অনুবাদকের নামগন্ধ নেই। তবু বইটার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা রুজু করলো ইংরেজরা। তার ফলে 'ইণ্ডিগো কমিশন' বসানো হলো সরকারের পক্ষ থেকে। সে অন্য প্রসঙ্গ। আর

হরিশ মুখার্জি ? তাঁর শেষ পর্যন্ত কী হলো ? তাঁর সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা বই থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃতি দিলেই বোঝা যাবে—"এরূপ শুনিয়াছি যে ইহার কিছু পূর্বে তাঁহার প্রথম পত্নীর মৃত্যু হয়। সেই শোকের অবস্থাতে তাঁহার নব পরিচিত ধনী বন্ধুগণ তাঁহাকে সুরাপান ও অন্যান্য নিন্দিত আমোদে লিপ্ত করিয়া তাঁহার শোকাপনোদনের চেষ্টা পান। তাহা হইতেই তাঁহার সর্বজন-প্রশংসিত চরিত্রে কালির রেখা পড়ে। তাহা হইতেই তাঁহার পানাসক্তি প্রবল হয়। এই বিবরণ যখন শুনি তখন চক্ষে জল আসে আর বলি—হায়! স্কচ্ কবি বারনস যদি লাঙ্গল ফেলিয়া এডিনবরা নগরে না আসিতেন তাহা হইলে যেমন ভাল হইত, তেমনি আমাদের দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান হরিশের যদি পদবৃদ্ধি না হইত, তিনি যদি কলিকাতার ধনীদের আদুরে ছেলে হইয়া না দাঁড়াইতেন, তবে বুঝি ভাল হইত। ধনীরা কয়েক দিনের জন্য তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া নাচিয়া গেলেন, দিয়া গেলেন মদের বোতল আর দারুণ পীড়া। ক্ষতি যাহা হইবার হরিশের পরিবার-বর্গের হইল এবং সর্বোপরি হতভাগিনী বঙ্গভূমির হইল।"

সেদিন সেই ছেলেটারও ১৩ নম্বর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের সেই বাড়িটার 'নাচঘরে' ঢুকে শিবনাথ শাস্ত্রীর সেই কথাগুলো মনে পড়লো। এই ঘরটা এককালে যখন 'নাচঘর' ছিল তখন বোধহয় এখানেও ওইসব কাণ্ড হতো। এখানেও হয়ত মদের ফোয়ারা ছুটতো আর সামনের দাঁড়া-আয়নার সামনে কতজন বাঈজী গাইতো 'বাজু বন্ধ খুলু খুলু যায়'··· কিম্বা 'চামেলি ফুলি চম্পা'···। আর কতজন বাঈ-এর সেই নাচ আর গানের আসরে কলকাতার 'বাবু-কালচার' বোধহয় নির্লজ্জের মতোই আত্ম-সমর্পণ করতো।

ফরাসের ওপর পূর্ণবাবু সেই ছেলেটার জন্যে একলা-একলা অপেক্ষা করছিলেন। সতু লাহা, সেই ছেলেটার নামটা বলতেই সে পূর্ণবাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে।

পূর্ণবাবু বললেন—বোস বোস, কালকের মিটিং-এ বক্তৃতা শুনতে-শুনতে আমার খুব ঘুম আসছিল, এমন সময়ে তোমার গান শুনে আমি জেগে উঠলুম। তাই তোমাকে ডেকে পাঠালুম।

লাজুক লোকদের প্রশংসা করলে তারা আনন্দের বদলে আরো লজ্জা পায়, আরো ঘেমে নেয়ে ওঠে। সেই ছেলেটারও সেই অবস্থা হলো। পাখার তলায় বসেও সে আরো ঘামতে লাগলো।

—তোমাদের দেশ কোথায় ?

সেই ছেলেটার জবাব শুনে পূর্ণবাবু বললেন—আরে তোমাদের গ্রামের পাশের গ্রামেই তো আমার শ্বশুর বাড়ি। আমার বিয়ে হয়েছে পেঁপুলবেড়ের 'গণে'দের বাড়িতে—

আশুতোষ কলেজে যেমন অমল রায় চৌধুরিকে পাওয়া গিয়েছিল, এই বিদ্যাসাগর কলেজে এসেও তেমনি পাওয়া গেল পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাসকে।

তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—তুমি তো গল্পও লেখ। এদিকে আবার গানও গায়। তুমি গায়ক হতে চাও না লেখক? কী?

সেই ছেলেটা বললে—গান আমার হবে না স্যার—,

—কেন?

সেই ছেলেটা বললে—গান গাইতে গেলে আমি বড়ো মুশকিলে পড়ি। অনেক লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে আমি বড় ঘাবড়ে যাই। আমার বুক দুরদুর করে, পা থরথর করে কাঁপে। তবলার তাল বেতালা হয়ে যায়। তাই লেখা আমার কাছে খুব সহজ। ঘরের দরজা বন্ধ করে একলা-একলা যে কাজ তাতে আমার কোনও কষ্ট হয় না—

কথাটা পুরোপুরি সত্যি। যতোবার সে ভিড়ের মধ্যে গান গেয়েছে, শ্রোতারা মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। তারা হাততালি দিয়ে মনের আনন্দও প্রকাশ করেছে। কিন্তু সেই ছেলেটার বুকের ভেতরে যে কী নিদারুণ তোলপাড় চলেছে তা বাইরের কেউই বুঝতে পারেনি। পরবর্তী জীবনে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে গ্রামে হাজার-হাজার শ্রোতার সামনে হিন্দী ভাষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান গাওয়ার বদলে তাকে বক্তৃতাও দিতে হয়েছে। কিন্তু সেই বক্তৃতা দিতে গিয়ে তার বুকের ভেতরে যে কী মৃত্যু-যন্ত্রণা হয়েছে তা বাইরের কেউই বুঝতে পারেনি, বুঝেছে কেবল সে নিজেই।

সেই তার পরদিন থেকে সেই সতু লাহাদের বাড়িটাই হয়ে গেল তার 'কমন রুম'। অন্য কলেজের মতো তখন বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রদের জন্যে কোনও 'কমন রুম' ছিল না। কলেজে যাওয়া আর আসার আগে আর পরে সেই সতু লাহার ঘরখানাই ছিল তার বিশ্রাম স্থল। আর সতুর মুখ থেকে সেই পুরনো কলকাতার 'বাবু কালচারের' গল্প শোনা। এ-রকম সুযোগ সেই ছেলেটার কপালে কেন জুটলো? পরবর্তীকালে তাই নিয়ে সে উপন্যাস লিখবে বলেই কি এমন সুযোগ করে দিলেন ঈশ্বর? আর আশ্চর্য, সেই 'বড়বাড়ি'র ঠিক উল্টোদিকে কিনা থাকতে হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সেই বড়ো-বড়ো থামওয়ালা মন্দিরটা! এই 'বাবু-কালচারের' সঙ্গে ওই ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসটা জড়িয়ে যদি কোনও দিন সে একটা

উপন্যাস লেখে তাহলে কেমন হয়? তার সঙ্গে সে রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, অগ্নিযুগের ইতিহাসটাও মিশিয়ে দিতে পারে। সে-রকম উপন্যাস তো আগে কেউই লেখেনি। যদি সেই ছেলেটা ভবিষ্যতে কোনওদিন সেরকম উপন্যাস লেখে তাহলে কি লোকে তাকে 'Escapist' বা পলায়নবাদী বলবে? Charles Dickens ফরাসি বিপ্লবের ওপর ভিত্তি করে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'A Tale of two cities' লিখে নিয়েছেন। Dickens-এর জন্ম-সাল ১৮১২, আর 'ফরাসি বিপ্লবে'র সাল হচ্ছে ১৭৮৯। তাঁকে কেউ যদি 'Escapist' বা পলায়নবাদী না বলে থাকে তাহলে ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার ইতিহাস নিয়ে সেই ছেলেটাকেই বা পলায়নবাদী বলবে কেন?

প্রশ্নটা সে নিজেকেই করলে। কিন্তু কোনও উত্তর পেলে না। তবে উপন্যাস কী করে লিখতে হয় তাও তো সে জানে না। কিন্তু সেটাও জানা হয়ে গেল একটা অদ্ভুত ঘটনায়। সেই ১৯৩৬ সালে কলকাতায় এসে হাজির হলেন একজন গায়ক। তিনিই সেই ছেলেটাকে উপন্যাস লেখবার কৌশল শিখিয়ে দিয়ে গেলেন। ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ সাহেব।

সেদিন সেই ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ সাহেব কলকাতায় না এলে বা তাঁর গান না শুনলে সেই ছেলেটার জীবন চিরকালের মতো ব্যর্থ হয়ে যেত। কিম্বা অন্য সবাই যেমনভাবে চাকরি বা ব্যবসা করে টাকা উপায় করে, আবার যেমন যথাসময়ে একদিন মারাও যায়, সেই ছেলেটার দশাও ঠিক তাই-ই হতো। জন্ম আর মৃত্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কোটি কোটি লোক যেমন জীবন কাটায় তেমনি তারও জীবন সেই একই পরিণতিতে পূর্ণচ্ছেদ ঘটত। উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে 'ঘরানা' বলে একটা শব্দ আছে। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি ছিলেন 'বিষ্ণুপুর ঘরানা'র গায়ক, ধীরেন্দ্র মিত্র হচ্ছেন 'গোয়ালিয়র ঘরানা'র গায়ক। ঘরানা মানে হচ্ছে 'School' সঙ্গীতের বিভিন্ন 'ঘরানা' মানে বিভিন্ন 'School'-এর সঙ্গীত পরিবেশন। একই রাগ একই 'আরোহন' একই 'অবরোহন' কিন্তু ভঙ্গী আলাদা-আলাদা। এছাড়া আর যে দুটি প্রধান ভঙ্গী আছে তা হলো (১) উত্তর ভারতীয় (২) দক্ষিণ ভারতীয়।

এসব কূট প্রশ্নের মধ্যে গিয়ে লাভ নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ সাহেব ছিলেন 'কিরানা ঘরানা'র উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী। ষোল বছর বয়েসেই তিনি জুনাগড় রাজ-

পরিবারের সঙ্গীত শিক্ষকের চাকরি পেয়েছিলেন। তারপর বরোদা মহারাজের সভা-গায়ক হন। 'কিরানা' গ্রামে জন্ম হয় বলে তাঁকে বলা হতো 'কিরানা ঘরানা'র গায়ক।

সেই ১৯৩৬ সালে চণ্ডীদা'র নিমন্ত্রণে তিনি সদলবলে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। তাঁর গলার গানও রেকর্ড বন্ধ হলো তখনকার দিনের তিন মিনিটের ডিস্ক-এ। কিন্তু তিন মিনিটের গানে কি তৃষ্ণা মেটে? তখন ঠিক হলো যে তখনকার 'ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট'-এর একটা বিশালাকায় হল-এর মধ্যে ওই গানটাই তিনি পূর্ণ সময় নিয়ে গাইবেন। সেই ছেলেটাও সেদিন অন্য সকলের সঙ্গে গিয়ে সেখানে হাজির হলো। সে এক চিরস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। শুধু অভিজ্ঞতা নয়, উপলব্ধিও। আর শুধু অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি নয়, আবিষ্কারও। বলতে গেলে সেও এক রকম নিজেকে আবিষ্কার।

গানটা তো মাত্র তিন লাইনের।

যমুনা কে তীর
গোকুল ঢুঁড়ি বৃন্দাবন ঢুঁড়ি
কৌন্ কৈসে লাগে তীর ॥

রাগ ভৈরবী, চাল 'ঠুমরি'। ভৈরবী আর মালকোষ দুটোরই ঠাট ভৈরবী, দু'টোরই বাদী 'মধ্যম' আর সম্বাদী 'সা'। দুটো রাগেই 'গান্ধার', 'ধৈবত' আর 'নিখাদ্' কোমল। কিন্তু তফাৎও আছে। মালকোষে 'রেখাব' আর 'পঞ্চম' বর্জিত। 'ভৈরবী' রাগ ভোরবেলায় গাওয়ার রাগ আর মালকোষ গাওয়ার সময় রাত তৃতীয় প্রহর। একটার প্রকৃতি চঞ্চল আর দ্বিতীয়টার প্রকৃতি শান্ত এবং গম্ভীর। ভোরবেলাকার রাগ তিনি গাইতে আরম্ভ করলেন বিকেলে। এক-পা এক-পা করে তিনি এগোচ্ছেন আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভেঙে পড়ছেন। মনে হচ্ছে একটি ভৈরবী মেয়ে যেন পাহাড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সোজা ওপর দিকে উঠতে কষ্ট হচ্ছে বলে যেন একটু নিচেয় নেমে অন্য পথ দিয়ে আবার সোজা সামনের দিকে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভৈরবী যতবার ওপরের দিকে এগোবার চেষ্টা করছে, ততবার সোজা না উঠতে না পেরে আবার নিচেয় নেমে আরো ওপরে ওঠবার চেষ্টা করছে। শ্রোতারা মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে কতক্ষণে ভৈরবী চুড়ায় উঠবে, কতক্ষণে ওস্তাদজী সুর সপ্তকে গিয়ে পৌঁছবেন। শ্রোতাদের মধ্যে সে কী আনন্দ, সে কী বিস্ময়, সে কী উৎকণ্ঠা, সে কী স্বর্গীয় প্রতীক্ষা, সে

কী অসহ্য উল্লাস। অথচ যদিও বা ওস্তাদজী একবার 'সা' ছুঁলেন কিন্তু সেও এক মুহূর্তের জন্যে। ছুঁয়েই আবার নিচেয় 'নিখাদে' নেমে গেলেন। আবার সেই উৎকণ্ঠা, আবার সেই প্রতীক্ষা, আবার সেই বিস্ময়, আবার সেই আপ্রাণ আরোহণের প্রচেষ্টা। একবার মনে হয় ভৈরবী মেয়েটা বুঝি গড়িয়ে নিচেয় পড়ে গেল, আবার তখনই মনে হয়—না, এবার ঠিক উঠে দাঁড়াবে, এবার ঠিক সুর-সপ্তকে গিয়ে স্থায়ী হবে। এ যেন ঠিক সেই গ্রীক দেবতা 'সিসিফাসে'র আজীবন আরোহণ আর অবরোহণের সংগ্রাম ও শাস্তির পরিক্রমা।

এই রকম করতে করতে যখন ওস্তাদজী গান গাইছেন সেই ছেলেটার তখন মনে হচ্ছে সে যেন গান শুনছে না, উপন্যাস পড়ছে। কখনও মনে হচ্ছে চার্লস ডিকেন্সের 'A tale of Two Cities' পড়ছে, কখনও মনে হচ্ছে সে লিও টলস্টয়ের 'War and peace' পড়ছে, আবার কখনও মনে হচ্ছে রমা রোঁলার 'Jean Christophe' পড়ছে! সেই ছেলেটার ধারণা, যদি পৃথিবীর কেউ ঔপন্যাসিক হতে চায় তো এই তিনটে এপিক উপন্যাস তাকে পড়তেই হবে। এই তিনটে উপন্যাস যদি কেউ না পড়ে তাহলে সে জীবনে কোনওদিন ঔপন্যাসিক হতে পারবে না। ওই তিনটে উপন্যাস যখন সেই ছেলেটা পড়েছিল তখন বুঝতে পারেনি ওই বইগুলো পড়বার সময় কেন তার অত ভালো লাগছে। কেন পড়তে পড়তে সে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাচ্ছে, কেন দিনের পর দিন রাতের পর রাত সে অমৃতের স্বাদ পাচ্ছে, কেন সে মৃত্যু-ভয় থেকে মুক্তি পাচ্ছে। ওই বইগুলো পড়তে পড়তে তার বরাবর মনে হয়েছে সত্যিই তো বাঙলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত তো কোনও প্রকৃত উপন্যাস লেখাই হয়নি। ওস্তাদজীর গান শুনতে শুনতেই সে শিখে গেল কোনটা কখন কতটুকু বলতে হবে আর কোনটা কখন কতটুকু বলতে হবে না। কোথায় কতটুকু বলতে হবে আর কোথায় কতটুকু চেপে রেখে দিতে হবে পরে বলবার জন্যে। এই গ্রহণ আর বর্জনের সমন্বয়ই তো হলো সঙ্গীত আর সাহিত্য-পরিবেশনের মূল কথা। মানুষের সময় নেই, মানুষ বড় ব্যস্ত। সে ততক্ষণ টাকা উপার্জনের ধান্ধা করবে, সে ততক্ষণ সিনেমা থিয়েটার দেখবে, সে ততক্ষণ টেলিভিশন দেখবে, তাস খেলবে। সে ততক্ষণ ঘুমোবে। কিন্তু সেই ব্যস্ত মানুষের ধ্যান আকর্ষণ করতে হলে সাহিত্যিক বা গায়ককে আরো বেশি জট পাকাবার কৌশল শিখতে হবে। আরো বেশি জট ছাড়াবার অপ্রত্যাশিত কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। পাঠক-দের বা শ্রোতাদের নাকে দড়ি দিয়ে এক হাজার দু'হাজার পাতার বই-এর

শেষ লাইন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে হবে, কিম্বা শ্রোতাদের সমস্ত রাত জাগিয়ে রাখতে হবে। পাঠকদের ঘুম ভোলাতে হবে, ক্ষিদে ভোলাতে হবে, ট্রেন ফেল করাতে হবে। ওই চার্লস ডিকেন্স, ওই টলস্টয়, ওই রমা রোঁলা তো একদিন ছেলেটার সেই অবস্থাই করেছিলেন। তেমনি সেই ছেলেটাও কি অন্য পাঠকদের তা করাতে পারবে না? কী করলে তা করাতে পারা যায়?

সেই প্রশ্নের উত্তর সেদিন ওস্তাদজী দিয়ে গেলেন নিজে তিন লাইনের ভৈরবী রাগের ঠুংরি গানটা তিন ঘণ্টা ধরে গেয়ে। সেই ছেলেটার মনে হলো কেন গানটা এত কম সময়ে শেষ হলো। কেন ওই গানটা আরো তিন ঘণ্টা ধরে গাইলেন না ওস্তাদী। এত কম সময়ে যেন ঠিক তার উপন্যাস লেখার টেকনিক শেখা হলো না।

পরের দিন আবার স্টুডিওতে এলেন ওস্তাদজী। তখনও আগের রাত্রের সুরের ঘোর রয়েছে সেই ছেলেটার মাথায়। এক সময়ে সেই ছেলেটা সাহস করে ওস্তাদজীকে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, ওই তিন লাইনের গানটা আপনি তিন ঘণ্টা ধরে গাইলেন কী করে? আমরা তো একেবারে বুঝতেই পারিনি যে আপনি তিন ঘণ্টা ধরে গাইলেন। আমাদের মনে হলো যেন আপনি তিন মিনিট গাইলেন, এর যাদুটা কোথায়? আপনি কি অজান্তে আমাদের সকলকে আফিং খাইয়ে দিয়েছিলেন?

ওস্তাদজী প্রথমে খানিকটা হো-হো করে হাসলেন। তারপর বললেন—আরে বেটা তুই বুঝতে পারলি না। আমি যে 'সা' লাগাইনি রে। কী করে তুই উঠে পালাবি মেহফিল ছেড়ে? সেই ছেলেটা তবু কিছু বুঝতে পারলে না। বললে—তার মানে? ওস্তাদজী বললেন—যতক্ষণ 'সা' না লাগাচ্ছি ততক্ষণ ধরে তো লোক অপেক্ষা করবেই। আর আমিও কখনও 'সা' লাগাবো না। 'সা' কখনও লাগাবি না। 'সা' মানেই তো আল্লামিয়া। আল্লামিয়াকে অত সহজে পাওয়া যায় না। আল্লামিয়াকে একবার পেয়ে গেলে মানুষের আর কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না।

কথাটা আগে কখনও আর কারো থেকে এমন করে শোনেনি সেই ছেলেটা। সত্যিই তো, 'সা'-ই তো আল্লামিয়া বা পরমেশ্বর। পরমেশ্বরকে পেলে মানুষ আর কেন সংসারে জড়িয়ে থাকবে? সে তো তখন সংসার ছেড়ে বাণপ্রস্থে চলে যাবে। 'সা' পাওয়া কি অত সহজ রে?

ওস্তাদজী আবার বললেন—'সা' কখনও লাগাবি না। গান গাইতে

গেলে কখনও তাড়াহুড়ো করবি না। আস্তে আস্তে ধীরে-সুস্থে এগোবি। 'রেখাব্' পেরিয়ে যখন লোকে 'গান্ধার' আশা করবে, তখন তুই উদারার 'গান্ধার' লাগাবি। যখন লোকে 'নিখাদ' আশা করবে তখন তুই আবার 'রেখাব্' লাগাবি। এই রকম করে রাগকে দুমড়ে মুচড়ে নিঙড়ে সবকিছু আইন ভেঙে চুরমার করে দিবি। লোকে একবার ভাববে তুই 'ভৈরবী' গাইছিস, আবার কখনও ভাববে তুই 'মালকোষ' গাইছিস। ঠুমরির এই তো নিয়ম। তার পরে শেষ পর্যন্ত যখন অনেক কসরৎ করে 'সা' লাগিয়ে সেখানে স্থায়ী হয়ে যাবি তখনই আল্লামিয়াকে পেয়ে যাবি। আল্লামিয়াকে পাওয়া তো সহজ কথা নয়। তাই অত কষ্টে 'সা'-কে পেতে হয়, তাই ওই 'সা'-কে পেয়ে সবাই 'কেয়াবৎ' 'কেয়াবৎ' করে উল্লসিত হয়ে ওঠে। যা সহজে পাওয়া যায় তা লোকে সহজে হারায়। কিন্তু অনেক কসরৎ করে 'সা'-কে পেলে তবেই আল্লামিয়াকে বা পরমেশ্বরকে পাওয়ার মতো আনন্দ হয়। সেই আনন্দকেই বৌদ্ধধর্মের ভাষায় 'নির্বাণ লাভ' বলে। তখন গায়ক-শ্রোতা লেখক-পাঠক সবাই মৃত্যু ভয় থেকে মুক্তি পায়।

তখনকার দিনে যাঁদের লেখক হিসেবে খুব খ্যাতি বা খবরের কাগজের পাতায় যাদের নাম খুব আড়ম্বর সহকারে বিজ্ঞাপিত হতো তাঁদের কাছে গিয়ে সেই ছেলেটা জিজ্ঞেস করতো—আপনারা যে গল্প বা উপন্যাস লেখেন তার শেষটা কি লেখবার আগেই ভেবে নিয়ে তবে লিখতে আরম্ভ করেন?

এই রকম চার কি পাঁচজন তখনকার দিনের সুবিখ্যাত বা বহু বিজ্ঞাপিত এবং পরে বিস্মৃত লেখকরা একই উত্তর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—আগে শেষটা ভেবে নিয়ে লিখতে যাবো কেন। জীবন কি ফরমূলা হে? আমরা চরিত্রকে অনুসরণ করে লিখে চলি। তারপর যেখানে গিয়ে শেষ হয়...

উত্তর শুনে সেই ছেলেটা তখনই বুঝতে পেরেছিল যে তাঁরা দু'দিন পরেই বিস্মৃত হয়ে যাবেন। আর হয়েছেও ঠিক তাই। তাঁদের নামও আজ কেউ জানে না। রেলগাড়ির টিকিট কাটতে গেলে যে স্টেশনে সে যাবে সেই স্টেশনের নাম তো আগেই বলতে হবে। গন্তব্যস্থলটা আগে থেকে জানা থাকলে তবেই তো টিকিট কাটার কথা আসে। কিন্তু সেই ছেলেটা কথাটা কাকে বোঝাবে?

ওস্তাদজী পরের দিনই চলে গেলেন নিজের ডেরায়। বলে গেলেন—পরের বছরে ১৯৩৭ সালে আবার কলকাতায় আসবেন, আবার তাঁর গান

শোনাবেন। সেই ছেলেটাও ওস্তাদজীর দ্বিতীয়বার আসার প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

সেই ছেলেটা যখন 'আল্লামিয়া'-কে পাওয়ার আশায় অস্থির, ওদিকে বাড়িতে তখন তার অভিভাবক ছেলের ভবিষ্যতের চিন্তায় প্রায় উন্মাদ। ছুটি-ছাটার দিনে সতু লাহার সঙ্গে সুশীল রায়, সুধীর রায়রা সবাই যখন সেই ছেলেটার বাড়িতে আড্ডা দিতে আসে তখন তার অভিভাবক সতুকে একলা পেয়ে জিজ্ঞেস করেন সতু তোমরা তো ওর বন্ধু, তোমাদেরই জিজ্ঞেস করছি, বড় হয়ে ও কী করবে তা কি বলে তোমাদের? বি. এ. পড়ছে তো এখন, কিন্তু কোন লাইনে যাবে তা কি কিছু বলে? আমার সঙ্গে তো কথাই বলে না, বলতে গেলে ওর সঙ্গে দেখাই হয় না আমার। রাত তিনটে কি চারটের সময় বাড়ি ফেরে। কখনও হাত পেতে টাকাও নেয় না আমার কাছ থেকে—

তারপর একটু থেমে আবার বলতে থাকেন—আমার বড় ছেলেটা তো ডাক্তার হয়েছে। মেজ ছেলেটা ইঞ্জিনিয়র হয়েছে, কিন্তু ও? বি. এ. পাশ করেই বা কী করবে? ইস্কুল মাস্টারি ছাড়া অন্য কোন লাইনে তো যাওয়ার রাস্তা খোলা নেই। শেষকালে কি আমার ছেলে হয়ে ইস্কুল মাস্টার হবে?

সব বখাটে ছেলেদের অভিভাবকদের মনে নিজেদের ছেলেদের সম্বন্ধে যে দুশ্চিন্তা থাকে সেই ছেলেটার অভিভাবকেরও সেই একই দুশ্চিন্তা ছিল। তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। ছেলের ইজ্জৎ মানেই তো বাপেরও ইজ্জৎ। সে যুগে একই পরিবারে এক ছেলে ডাক্তার, এক ছেলে ইঞ্জিনিয়র, আর তৃতীয় ছেলেটা কী, না স্কুল মাস্টার। এর চেয়ে লজ্জার ঘটনা আর কী-ই বা হতে পারে? 'ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স' দেখেই তো মনুষ্যত্বের বিচার হয় সব দেশে সব সমাজে। ন্যাথালিয়ন হথর্ণের (১৮০৪-১৮৬৪) মা ছেলেকে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছিলেন সে বড় হয়ে কী হতে চায়। ছেলে জবাব দিয়েছিল—'মা, আমি ডাক্তার হতে চাই না। কারণ তাহলে মানুষের অসুখ-বিসুখকে মূলধন করে আমাকে জীবিকা অর্জন করতে হবে। আর আমি উকিল-ব্যারিস্টারও হতে চাই না, কারণ তাহলে মানুষের ঝগড়া-বিবাদকে মূলধন করে আমাকে জীবিকা অর্জন করতে হবে। আমি চাই লেখক হতে কারণ তাতে মানুষের অসুখ-বিসুখ বা ঝগড়া-বিবাদকে মূলধন করার প্রয়োজন হয় না, বরং মানুষের সামান্য কিছু উপকার করা সম্ভব হতে পারে।

অবশ্য সে যুগের তুলনায় বর্তমান যুগ আরো ঘোরালো হয়ে গেছে কারণ 'সাহিত্য আকাদেমি' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সাহিত্য পুরস্কার

দেওয়ার রীতির প্রবর্তন হওয়ায় মুড়ি-মিছরির একদর হয়ে গেছে। এক-কালে মানুষের জন্যে টাকার সৃষ্টি হয়েছিল, এখন টাকার জন্যে লেখকের সৃষ্টি হচ্ছে—

১৯৩৬ সালে বি. এ. পাশ করবার পরেই সেই ছেলেটার অভিভাবক বললেন—এবার তুমি চার্টার্ড এ্যাকাউনটেন্সি পড়, আমি তোমাকে বিলেতে পাঠাবো। নইলে শেষকালে একদিন তুমিই বলবে যে তোমার দাদাদের জন্যে আমি অনেক টাকা খরচ করেছি, আর তোমার জন্য এক পয়সাও খরচ করিনি—

কিন্তু ওদিক থেকে তখন আল্লামিয়াও ডাকছে। বলছে—ওরে ওদিকে যাস নে মারা পড়বি। আমার কাছে আয়, আমার কাছে আয়—নইলে মারা পড়বি···আমার কাছে আয়···ওই টাকা বাড়ি গাড়ি নাম খ্যাতি পুরস্কার, ওতে সুখ নেই রে, সুখ নেই···

কোন কিছু হতে চাওয়া আর হতে পারার মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। বিশেষ করে এই যন্ত্র-তাড়িত যুগে। তার মধ্যে আবার এই দ্বি-খণ্ডিত বাঙলা দেশে। সমস্ত ইণ্ডিয়ার মধ্যে এই একমাত্র ভূখণ্ড যেখানে কেউ কারো উন্নতিকে সহজ দৃষ্টিতে দেখে না। হেনরিক ইবসেন অবশ্য বহুকাল আগে বলে গেছেন—'To live is to war with friends' অর্থাৎ বেঁচে থাকা মানেই হলো বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া করে মরো!' কিন্তু সে-যুগ তো এখনকার মতো এত জটিল ছিল না। তখন সেই ১৯০১ সাল থেকে সবে মাত্র নোবেল পুরস্কার দেওয়ার রীতি শুরু হয়েছে। নোবেল প্রাইজ দেওয়ার কর্তাদের তখন তাঁর নাম মনে উদয় হওয়ার কথা নয়। তা না হোক, কিন্তু তখন তাঁর খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা বেশ ভালোভাবেই হয়েছে। চিরকাল দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়ে সবেমাত্র একটু সামলে নিয়েছেন। সেই সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটলো।

একদিন তাঁর বাড়িতে এসে হাজির হলেন নরওয়ের তরুণ বিখ্যাত ঔপন্যাসিক নুট্ হামসুন (১৮৫৯-১৯৫২)। তখন সবে মাত্র তাঁর হাঙ্গার উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়ে পৃথিবীর সাহিত্যের বাজার মাৎ করেছে। চারি-দিকে তাঁর জয়-জয়কার। তিনি ইবসেনকে একটি সভায় উপস্থিত হ—

নিমন্ত্রণ করলেন। হামসুন বললেন—আমি ওই সভায় সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেব, আপনি যদি সভায় হাজির থাকেন তো আমি খুব খুশী হবো—

ইবসেন তখন বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি নিমন্ত্রণ পেয়ে খুশী হলেন। বললেন, ঠিক আছে আমি নিশ্চয়ই যাবো। যথা সময়ে হেন্‌রিক ইবসেন সভায় গিয়ে হাজির হলেন। হামসুন, ইবসেনকে ডেকে মঞ্চের ওপর গিয়ে বসতে অনুরোধ করলেন। হামসুন তখন যুবক, তাঁর রক্ত গরম, আর ইব্‌সেন বৃদ্ধ। হামসুন বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। সে-বক্তৃতার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু ইব্‌সেনের নিন্দে। ইব্‌সেনের প্রত্যেকটা নাটকের নাম করে করে বলতে লাগলেন—ইব্‌সেন নাটক লিখতেই জানেন না। হামসুনের বক্তৃতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি ছিল এই—

সামনে হাজার হাজার দর্শক। তাঁরা সবাই নিস্তব্ধ হয়ে হামসুনের মুখ থেকে ইব্‌সেনের নিন্দে শুনতে লাগলেন। কেউই হামসুনের কথার ক্ষীণ প্রতিবাদও করলে না। আর ইব্‌সেন মঞ্চের ওপর বসে নিজের কানে নিজের নিন্দে শুনতে লাগলেন, মঞ্চ থেকে উঠে যেতেও তাঁর ভদ্রতায় বাধলো। নিন্দের শরশয্যায় বসে তাঁকে সব অপবাদ নিঃশব্দে হজম করতে হলো।

তরুণ সাহিত্যিকদের কাছে বয়োবৃদ্ধ সাহিত্যিকদের এই-ই হলো চিরন্তন প্রাপ্য। অথচ আজ সবাই জানে সেক্সপীয়রের পরে হেনরি ইবসেনই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার।

আর নুট হামসুন?

নুট হামসুন তো আর চিরকাল তরুণ হয়ে থাকতে পৃথিবীতে জন্মাননি। তিনিও একদিন বয়োবৃদ্ধ হলেন। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে একদিন তাঁর শরীরের রক্তও ঠাণ্ডা হয়ে এল। একদিন তিনি যেমন নিষ্ঠুর হয়ে ইব্‌সেনকে অপমান করেছিলেন, তখন তাঁরও অপমানিত হওয়ার লগ্ন এলো।

সেই সময়ে জার্মানির ফ্যুয়েরার হিটলার হঠাৎ একদিন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো নরওয়ের ওপর। সমস্ত দেশ বিভ্রান্ত! বেশিরভাগ মানুষই দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচলো। হিটলারের সৈন্য-সামন্তের সামনে কে রুখে দাঁড়াবে? যারা রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে তারা প্রাণ দিলে। হামসুন তখন সারা পৃথিবীময় খ্যাতি প্রাপ্ত সাহিত্যিক। সারা পৃথিবীতেই তাঁর বই 'হাঙ্গার' প্রায় সব প্রধান-প্রধান ভাষায় অনুদিত হয়ে হামসুনের

প্রশংসায় গদ্‌গদ্‌। রোজ তাঁর বাড়িতে পৃথিবীব্যাপী ভক্তদের কাছ থেকে গাদা গাদা প্রশস্তি পত্র আসে। সে সব চিঠি পেয়ে হামসুনও খুশী থাকেন।

হঠাৎ ঠিক সেই সময়ে তাঁর দেশের ওপর জার্মানির ওই আক্রমণ দেখে তিনি তখন ভয় পেয়ে গেলেন। কী করবেন তিনি? দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবেন? কিন্তু কোথায় পালাবেন তিনি? আর তারও তখন অনেক বয়েস। তিনি তখন নব্বুই বছরে পা দিয়েছেন। ওই বয়েসে কি ঘর-বাড়ি ছেড়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে পালানো সম্ভব?

তখন তার পক্ষে মাত্র দুটো পথ খোলা ছিল। একটা পথ হচ্ছে মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে জীবন বিসর্জন দেওয়া, আর দ্বিতীয় পথ হচ্ছে শত্রুর কাছে মর্যাদাহানিকর আত্মসমর্পণ করা। তিনি কোন্‌ পথটা বেছে নেবেন?

যাঁরা প্রকৃত জীবনবাদী সাহিত্যিক তাঁরা জীবন বিসর্জন দেবেন তবু শত্রুর সঙ্গে আপস করবেন না। কিন্তু তিনি সেইদিন সেই চরম ভুলটিই করে বসলেন। হিটলারের সামনে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। দু'হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন—হেইল হিটলার—

আর সেই খবর বাইরের পৃথিবীতে প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সমস্ত ভক্তবৃন্দরা তাঁর ঠিকানায় তাঁদের নিজস্ব হামসুনের লেখা সমস্ত বইগুলো রেজেস্ট্রি ডাকে ফেরৎ পাঠাতে লাগলেন। হামসুনের বাড়ি সেই রেজেস্ট্রি ডাকে ফেরৎ দেওয়া বইগুলো স্তূপীকৃত হয়ে পাহাড়ের রূপ ধারণ করলো।

আর শুধু কি তাই?

১৯৫২ সালে যখন তিনি প্রাণত্যাগ করলেন তখন তাঁর শবদেহে কবর-খানায় নিয়ে গিয়ে সমাধিস্থ করার জন্যে দেশে একজন বাহকও খুঁজে পাওয়া গেল না। কল্পনা করে নেওয়া যায় যে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্য-রসিক সমাজ মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলেন—আপদ গেল—যৌবনের গরম রক্তের অহঙ্কারে একদিন প্রকাশ্য সভায় হাজার হাজার মানুষের দৃষ্টির সামনে যে হামসুন, ইবসেনকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করেছিলেন, সেই অপমান বহুকাল পরে লক্ষগুণ হয়ে ফিরে এসে তাকেই আবার প্রত্যাঘাত করলো।

মানুষের সংসারে এইটেই ঘটে, কিন্তু শিল্পীদের সংসারে এইটে আরো বেশি করে ঘটে। এখনকার দিনে কোনও লেখকই জানে না বা

জানলেও স্বীকার করে না যে হওয়ার চেয়ে করাটা বড়ো। কাউকে কিছু হতে গেলে তাকে আগে কিছু করতে হবে।

একবার বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক ভিটে কাঁঠালপাড়ায় অনেক সাহিত্যিক জমা হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মতিথি পালন করবার উদ্দেশ্যে। অনেকেই বক্তৃতা দিলেন সেই অনুষ্ঠানে। সাহিত্যিকরা লিখতে পারুন আর না পারুন মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে তাঁরা খুব পটু।

সেই সময়ে একজন সাহিত্যিক সেই সভায় দাঁড়িয়ে উঠে মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে ভাষণ দিলেন। ভাষণের শেষে বললেন—আমিই সেই বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র উত্তরসূরী--

যাঁরা সেখানে শ্রোতার আসনে বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ফিস্-ফিস্ ফুস্-ফাস গুঞ্জন শুরু হলো। কিন্তু প্রকাশ্যে মুখে কেউ কিছু বললেন না--কারণ পৃথিবীর কোথাও তো মুখের কথার ওপরে এখনো ট্যাক্সো বসানোর আইন লাগু হয়নি। তেমন আইন লাগু হলে কী হতো তা বলা যায় না। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? এখনকার সাহিত্যিকের মানদণ্ড তো সাহিত্য পুরস্কার। সেই সাহিত্যিকের সাহিত্য করার ক্ষমতা থাক আর না থাক, সাহিত্যিক হওয়ার অর্থাৎ সাহিত্য-পুরস্কার পাওয়ার সবরকম কলাকৌশল তাঁর করায়ত্ত ছিল। সে কলায় তিনি অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাই সাহিত্য করাটা অন্য লোকের হাতে ছেড়ে দিয়ে 'সাহিত্য-পুরস্কার' করায়ত্ত করবার দিকেই তিনি বেশি নজর দিতেন। ঋষি-বাক্য অনুকরণ করে তিনি করার চেয়ে হওয়ার দিকেই বেশি মন-প্রাণ ঢেলে দিতেন। আর শেষ পর্যন্ত যা তিনি চেয়েছিলেন তা তিনি পেয়েও ছিলেন। দেশের কোনও পুরস্কার করায়ত্ত করতে তাঁকে বেশি বেগ পেতে হয়নি। রবীন্দ্র-শরৎ থেকে আকাদেমি, এমন কি জ্ঞানপীঠ পুরস্কারও তাঁর হস্তগত হয়েছিল। কিন্তু হায়, আজ কে তাঁকে জানে? কে তাঁকে মনে রেখেছে? তাঁর কোনও বই এখন কেউ ছোঁয়ও না। তার বিক্রি হওয়া দূরে থাক! পুনর্মুদ্রিতও হয় না। এর একমাত্র কারণ তার করার মধ্যে ফাঁকি ছিল বলেই শেষ-পর্যন্ত তাঁর হওয়াটা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

সেইসব দেখেই সেই ছেলেটার বন্ধু সুবোধ ঘোষ একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন—আসুন, আমরা মাসে মাসে ষাট টাকা মাইনে দিয়ে লেখার কাজটা একজনের ওপর ছেড়ে দিয়ে, নিজের তদ্বির-তদারকের দিকটায় লেগে যাই—

হাসির কথা হলেও এ-যুগে এমন কঠোর সত্য কথাও আর দ্বিতীয়টি

নেই। করার দিকে যদি ফাঁকি থাকে তাহলে হয়তো রাজনীতির ক্ষেত্রে মন্ত্রী, রাজ্যপাল, এম এল এ বা এম পি হওয়া যাবে, পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ বা ভারতরত্নও পাওয়া যাবে, খেলা ধুলোর জগতে সব কিছু সম্মান বা কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়া যাবে, সিনেমার জগতেও প্রচুর সুনাম বা অর্থ পাওয়া যাবে। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রের নিয়ম আলাদা। সেক্ষেত্রে করার সঙ্গে হওয়ার সামঞ্জস্য না থাকলেই সর্বনাশ। তাই শরৎচন্দ্রের একটি কথা সেই ছেলেটা সব সময়ে মনে রেখেছে। তিনি বলে গেছেন— 'বর্তমানকালই সাহিত্যের সুপ্রীম-কোর্ট নয় ?'

আর রবীন্দ্রনাথ ? তাঁর যখন পঞ্চাশ বছর বয়েস তখন সেই ১৩১৮ সালের ফাল্গুন মাসে তিনি বলে গেছেন—"সেই চিরদিনের প্রাপ্যটা বাঁচিয়া থাকিতেই আদায় করিবার রীতি নাই। এই বেতনটার হিসাব চিত্রগুপ্তের খাজাঞ্চিখানাতেই হইয়া থাকে। সেখানে হিসাবের ভুল প্রায় হয় না। কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতেই যদি আগাম শোধের বন্দোবস্ত হয় তবে সেটাতে বড়ো সন্দেহ জন্মায়। সংসারে অনেক জিনিস ফাঁকি দিয়া পাইয়াও সেটি রক্ষা করা চলে, কিন্তু যশ জিনিসটাতে সে সুবিধা নাই। উহার সম্বন্ধে তামাদির আইন খাটে না। যেদিন ফাঁকি ধরা পড়িবে সেইদিন ওটি বাজেয়াপ্ত হইবে। মহাকালের এমনই বিধি। অতএব জীবিতকালে কবি যে সম্মানলাভ করিল সেটি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই।"

কতদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরীর অন্দর মহলে ঢুকে সেই ছেলেটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেছিল। বঙ্কিম, রবীন্দ্র আর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সম-সময়ে বা পরে লক্ষ লক্ষ লেখক কত লক্ষ লক্ষ বই লিখে গিয়েছিলেন। সেই অম্বিকা গুপ্ত, মাণিক ভট্টাচার্য, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত, সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সমস্ত লেখকের বইতে ধুলো জমছে! কেউ তাঁদের নাম পর্যন্ত শোনেনি। মহাকাল তাঁদের সবাইকে কেন বাজেয়াপ্ত করলেন ? এমন কী অপরাধ তাঁরা করেছিলেন যে আজকের পাঠক তাঁদের নাম পর্যন্ত ভুলে গেল ? তাহলে সেই ছেলেটা যদি কখনও বই লেখে তাহলে তো তার নামও একদিন সবাই ভুলে যাবে। তাই-ই যদি হয় তাহলে লেখার জন্যে জীবন দিয়ে কী লাভ ? সেই সময়ে ১৯৩৬ সালে একদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলো। বিজ্ঞাপনটি বড় অভিনব। তাতে লেখা হয়েছে—"আগামী অমুক তারিখে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বার্ষিক সংখ্যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। উক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য

প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা আমন্ত্রণ করা হইতেছে। যাঁহারা উক্ত সংখ্যায় লিখিতে চান তাঁহাদের অমুক তারিখের মধ্যে নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় রচনাদি পাঠাইতে অনুরোধ করা হইতেছে—ইতি, বিভাগীয় সম্পাদক।"

এ-ধরনের রচনা আমন্ত্রণের বিজ্ঞাপন আজকের যুগে কল্পনাতীত। সেই ছেলেটার গল্প কবিতা তখনকার দিনের 'বঙ্গশ্রী' 'বসুমতী' 'ভারতবর্ষ' 'বিচিত্রা' প্রভৃতি পত্রিকায় অনেক প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তখন সেই ছেলেটার নাম পাঠক-পাঠিকাদের কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। তাই সেই দিন সমস্ত রাত জেগে সেই ছেলেটা একটা গল্প লিখে ফেললে। আনন্দবাজার পত্রিকা'র দফ্‌তর বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বেশি দূরে নয়। পরের দিনই কলেজ থেকে বেরিয়ে সে চিৎপুরের ১ নম্বর বর্মণ স্ট্রীটে গিয়ে উপস্থিত হলো। বিভাগীয় সম্পাদক তখন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর সামনে গিয়ে নিজের আর্জি সে জানালো। তারপর তিনি বসতে বললে সে সামনের চেয়ারে বসলো। গল্পটার পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে তিনি সেটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে বললেন—অমনোনীত হলে কিন্তু লেখাটা ফেরৎ পাঠানো হবে।

এর জবাবে ছেলেটার বলবার কিছুই ছিল না। তারপর বিবেকানন্দ-বাবু একটা অদ্ভুত কাজ করলেন। সামনের লেখার স্তূপ থেকে দুটি রচনার পাণ্ডুলিপি বার করে তাকে দেখালেন। বললেন—এই দেখুন, দু'জন বিখ্যাত লেখকের রচনা আমরা চেয়ে পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু আমার পছন্দ না হওয়াতে এ দুটো লেখকের কাছে ফেরৎ পাঠাচ্ছি—এর মধ্যে একটি রচনা বিখ্যাত লেখক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, আর একটি রচনা দিলীপ কুমার রায়ের। সেই ছেলেটা কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। নিমন্ত্রণ করে লেখা নিয়ে ফেরৎ দেওয়া? এ-যুগে এ-রকম ঘটনা কি কেউ কল্পনা করতে পারে? এ তো নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসে অপমান করার সামিল। কিন্তু সেই ছেলেটা সেদিন তার সেই অল্প বয়েসেই একটা অমূল্য শিক্ষা পেয়ে গেল যে জীবনের অন্য ক্ষেত্রে করার চেয়ে হওয়াটাই বড়ো কথা হতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে হওয়ার চেয়ে করাটাই বড়ো কথা। রাজনীতি, খেলাধূলা বা সিনেমাতে একবার বিখ্যাত হতে পারলেই হলো। তারপর থেকে সেই খ্যাতিটা ভাঙিয়েই সে সারাটা জীবন সুখে ভোগ করে যেতে পারে। কিন্তু সাহিত্যে সে নিয়ম নেই। যতোই সে খ্যাতিবান হোক সম্পাদক লেখকের খ্যাতি দেখে তাঁর বিচার করবেন না। বিচার করবেন তাঁর করা দিয়ে। আজকাল

অবশ্য বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতো সম্পাদক একজনও নেই। সমস্ত সম্পাদকরাই এখন লেখকদের হওয়া দেখেই বিচার করেন। করা দেখে নয়। সম্পাদক একদিন হেনরিক ইব্‌সেনকে অমনোনীত করে নুট হামসুনকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। কিন্তু মহাকাল? তিনি বড়ো নিরপেক্ষ নিষ্ঠুর, নির্বিরোধ সম্পাদক। তিনি তৎকালীন সম্পাদকের রায় খারিজ করে দিয়ে নুট হামসুনকে অমনোনীত করে হেনরিক ইব্‌সেন-কেই মনোনয়ন দিয়েছিলেন।

তাই শরৎচন্দ্রের কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হলো যে 'বর্তমানকালই সাহিত্যের সুপ্রিম কোর্ট নয়।' তাই রবীন্দ্রনাথের কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হলো যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'যশ জিনিসটাতে সে সুবিধা নাই। উহার সম্বন্ধে তামাদির আইন খাটে না। যেদিন ফাঁকি ধরা পড়িবে সেইদিনই ওটি বাজেয়াপ্ত হইবে। মহাকালের এমনই বিধি। অতএব জীবিতকালে কবি যে সম্মান লাভ করিল সেটি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই।'

লেখা তো পাঠকদের জন্য

গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিস তখন বৃদ্ধ হয়েছেন।

তাঁর ছেলেরা একদিন রাজদরবারে গিয়ে এক নালিশ পেশ করলে। বললে—হুজুর, আমাদের বাবার বিরুদ্ধে আমরা এক নালিশ পেশ করতে এসেছি। বাবা, আমাদের সংসারে কর্তা হয়েও সংসারের কোনও কাজকর্ম করেন না। চাষ-আবাদে হাত লাগান না! কেবল বসে বসে ভাত গেলেন আর কাগজ-কলম নিয়ে কী সব হিজিবিজি কাটেন আর ছাইভস্ম লেখেন। সংসারের অভিভাবকত্ব বাবার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আমাদের হাতে তুলে দিতে আদেশ হোক—

বাড়ির কর্তা হব, অথচ বাড়ির কারো জন্যে কিছু কাজ করব না, এমনকি চাষ আবাদের মত জরুরি কাজেও হাত লাগাব না, এ তো বড় জঘন্য অপরাধ।

হাকিম হুকুম দিলেন—ডাকো তোমাদের বাবাকে—

সফোক্লিস রাজ-বিচারকের শমন পেয়ে রাজ-দরবারে এসে হাজির হলেন।

বিচারক জিজ্ঞেস করলেন—তোমার ছেলেরা তোমার নামে নালিশ করেছে যে তুমি নাকি সংসারের কর্তা হয়েও সংসার দেখ না, চাষ-আবাদের কাজে হাত লাগাও না, আমার কাছে তারা আর্জি পেশ করেছে যে তোমার অভিভাবকত্ব কেড়ে নিয়ে তা তোমার ছেলেদের হাতে তুলে দিতে হবে—

সফোক্লিস এর জবাবে কী আর বলবেন, তাই চুপ করে রইলেন।

বিচারক জিজ্ঞেস করলেন—আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? যা শুনছি তা কি সত্যি? তা যদি হয় তো তোমার ছেলেরাই সংসারের অভিভাবক হোক—

সফোক্লিস বললেন—হুজুর, আমি এ ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনো কথাই বলব না। হুজুরের যদি সময় থাকে তো আমি কাগজ-কলম নিয়ে ছাইভষ্ম যা লিখি তা হুজুরকে পড়ে শোনাতে চাই। হুজুরের কি তা শোনবার সময় হবে?

বিচারপতির অনুমতি পেয়ে সফোক্লিস তাঁর নাটক পড়তে লাগলেন। সমস্ত আদালত-ঘর স্তব্ধ বিস্ময়ে তা শুনতে লাগলো। যখন নাটক পড়া শেষ হল তখন বিচারপতি নির্বাক। তিনি তখন মনে মনে ভাবছেন—পৃথিবীতে এমন মানুষ কে আছে যে এই লোকটার অভিভাবক হওয়ার যোগ্য! এই সফোক্লিসই তো চিরকালের পৃথিবীর সব মানুষের অভিভাবক।

এই সফোক্লিস বিখ্যাত নাটক 'Oedipus at Colonus' এর লেখক। তাঁর জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ৪০৫ সালে। তাঁর সেই নাটক পৃথিবীর সমস্ত দেশে প্রায় সব ভাষাতেই অনূদিত হয়ে এখনও মঞ্চস্থ হয়।

কার্ল মার্কস অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর Das Capital বইটি লিখতেন। বাড়িতে তখন এমন খাদ্য নেই যা খেয়ে তিনি পেট ভরাতে পারেন।

মা একদিন বললেন—হ্যাঁ রে, কী ও সব ছাইভস্ম তুই লিখিস? তার চেয়ে একটু টাকা রোজগারের ধান্ধা কর না—

মা'র কথায় ছেলে যখন বললেন যে তাঁর বইয়ের নাম 'ডাস ক্যাপিটাল', তখন মা বললেন—'ক্যাপিটাল' বই লিখে কি তোর পেট ভরবে? 'ক্যাপিটাল' বই না লিখে বরং 'ক্যাপিটাল' রোজগারের চেষ্টা কর না, তাতে অন্তত সংসারের কিছু সাশ্রয় হয়—

কার্ল মার্কস বললেন—মা, তুমি এখন বুঝতে পারছো না এই বইয়ের কী মূল্য। কিন্তু এমন একটা দিন আসছে যখন আমার এই বই নিয়ে পৃথিবীতে অগ্নিকাণ্ড বেধে যাবে।

পরে অবশ্য কার্ল মার্কস-এর ভবিষ্যৎ বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল কিন্তু সে অগ্নিকাণ্ড কার্ল মার্কস আর তাঁর মা, দু'জনের কেউই দেখে যেতে পারেননি।

'ম্যাডাম বোভারি' লেখার জন্যে ফ্রান্সের গুস্তভ ফ্লবেয়ার সারা পৃথিবীর মানুষের মনে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। তিনি আর এক কারণে পৃথিবী বিখ্যাত। সে কারণটা হ'ল তিনি আর একজন ফরাসি লেখক মোপাসাঁর গুরু।

মোপাসাঁর মা ছিলেন ফ্লবেয়ারের পরিচিত। ছেলের লেখক হওয়ার বাসনা দেখে তিনি একদিন ছেলেকে ফ্লবেয়ারের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। গিয়ে বললেন আমার এই ছেলেটার বড় লেখক হওয়ার সাধ। কী করে লেখক হওয়া যায় সেটা যদি আপনি একে শিখিয়ে দেন তো আমি খুব খুশি হবো—

ঠিক আছে। ফ্লবেয়ার ছেলেটিকে এক মাস পরে যেতে বললেন। মা আর ছেলে চলে গেল।

ঠিক এক মাস পরে ফ্লবেয়ারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হ'ল ছেলেটি। ফ্লবেয়ার ছেলেটিকে চিনতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—কে তুমি ?

ছেলেটি একমাস আগের ঘটনাটার কথা ফ্লবেয়ারকে স্মরণ করিয়ে দিলে। ফ্লবেয়ার তখন খুব ব্যস্ত। তবু ঘটনাটা মনে পড়ে যাওয়ায় তাঁর টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে ছেলেটিকে দিয়ে বললেন—এই বইটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পোড়ো, এটা পড়লেই তুমি লেখক হতে পারবে—

বইটা নিয়ে ছেলেটি চলে গেল। তার একমাস পরে ছেলেটি আবার ফ্লবেয়ারের কাছে এল। তখনও ফ্লবেয়ার তাকে আগেরবারের মতই চিনতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—কে তুমি ?

ছেলেটি আগেরবারের সব ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিতেই ফ্লবেয়ারের সব মনে পড়ে গেল। তিনি বইটা নিয়ে দেখলেন সেটা একটা অভিধান। জিজ্ঞেস করলেন—তুমি এ বইটা পড়েছ ?

ছেলেটি বলল—হ্যাঁ, আপনি জিজ্ঞেস করুন, আপনি বইটার যেখান থেকে ইচ্ছে জিজ্ঞেস করলেই আমি তার মানে বলে দেব—

এতক্ষণে ফ্লবেয়ার সচকিত হলেন। ছেলেটি ডিক্সনারি মুখস্থ করে ফেলেছে! তাহলে তো এ সাধারণ ছেলে নয়!

—তুমি কী করে ডিক্সনারি মুখস্থ করলে ? কেন মুখস্থ করলে ?

ছেলেটি বললে—আপনি যে বলেছিলেন এই বইটা পড়লে আমি লেখক হতে পারব। তাই একেবারে কণ্ঠস্থ করে ফেলেছি।

এতক্ষণে ফ্লবেয়ার ছেলেটিকে বসতে বললেন। ছেলেটি বসবার পর ফ্লবেয়ার জানালার বাইরের দূরের দিকে নির্দেশ করে জিজ্ঞেস করলেন—ওটা কী দেখছো ?

ছেলেটি বললে—একটা গাছ—

—কি গাছ ?

—মনে হচ্ছে পাইন গাছ—

ফ্লবেয়ার অখুশি হলেন। বললেন—ঠিক হ'ল না' আরও একবার ভাল করে দেখ—

ছেলেটা বললে—গাছটার পাশে একটা তেতলা বাড়ি রয়েছে।

ফ্লবেয়ার বললেন—না, হ'ল না। আরও একবার ভাল করে দেখ—

ছেলেটি বললে—তেতলার জানালায় দাঁড়িয়ে একজন মানুষ বাইরের দিকে চেয়ে দেখছে—

এবারও ফ্লবেয়ার বললেন—না, হ'ল না, আরও একবার ভাল করে দেখ—

ছেলেটি বললে—আকাশে একটা পাখি উড়ছে—

এতক্ষণে যেন খুশি হলেন ফ্লবেয়ার। হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে। ওই গাছটা শুধু গাছ নয়, ওই তেতলা বাড়িটা, ওই জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা, ওই আকাশ, ওই পাখি, সব কিছু জড়িয়ে তবে ওই গাছটা। তেমনি মানুষের বেলাতেও তার আশেপাশের সমাজ, তার বংশ-পরম্পরা, তার আত্মীয়-স্বজন, তার পরিবার, তার বন্ধু-বান্ধব—সকলকে নিয়েই সেই মানুষটা। তবেই হবে সাহিত্য—

ছেলেটি বললে—অত কথা লিখলে যে গল্প বা উপন্যাস আকারে বড় হয়ে যাবে। উপন্যাস মোটা হয়ে যাবে। লোকে নিন্দে করে বলবে 'থান ইট'—

ফ্লবেয়ার বললেন—লেখকরা নিন্দে করতে পারে, কিন্তু তুমি লিখবে পাঠকদের জন্যে। তোমার মনের কথা যদি সকলের মনের কথা হয়ে যায় তাহলেই তুমি সার্থক! তার বেশি আর কিছু চাইবার তোমার দরকার নেই—

এই ছেলেটিই পরে মোপাসাঁ নামে বিখ্যাত সাহিত্যিক হতে পেরেছিলেন। তাঁর মনের কথা পরে সকলের মনের কথা হতে পেরেছে।

এই ফ্লবেয়ারই বলে গেছেন—'Writing is a dog's life, but the only life worth-living'. অর্থাৎ লেখকের জীবন হচ্ছে কুকুরের জীবন কিন্তু তবু বেঁচে থাকার জন্যে ওই জীবনটাই একমাত্র বাঁচার যোগ্য।

পরিশ্রমই মেজর লেখক হওয়ার প্রথম শর্ত

মেজর লেখক হওয়ার প্রথম শর্তই হলো পরিশ্রম। আর শুধু পরিশ্রম নয়, অমানুষিক পরিশ্রম। যিনি তা করতে পারবেন না তাঁর পক্ষে মহৎ লেখক হওয়ার আশা দুরাশা! আর শুধু দুরাশাই নয়, অসম্ভব।

এই গুস্তভ ফ্লবেয়ারের কথাই ধরা যাক। 'ম্যাডাম বোভারী' লিখতে তাঁকে যে পরিশ্রম করতে হয়েছে তার সাক্ষী কেউ নেই, সাক্ষী আছে শুধু 'সিন' নদীর ওপর চলন্ত নৌকোর মাঝিরা।

অন্ধকার রাত্রিতে 'সিন্' নদী দিয়ে যে সব নৌকো চলাচল করতো তারা অনেক সময়েই দিক-ভুল করতো। বুঝতে পারতো না তারা কতদূর এলো বা আরো কতদূর তাদের যেতে হবে, কারণ এখনকার মতো বিদ্যুতের যুগ তো সেটা নয়। সেটা মোমবাতির যুগ। মাঝিদের অন্ধকার হাতড়ে হাতড়েই তাদের গন্তব্যস্থলের দিকে যেতে হতো। বিশেষ করে কৃষ্ণপক্ষ আর অমাবস্যার রাতগুলোতে।

কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়তো একটা বাড়িতে অতো রাত্রেও আলো জ্বলছে। তখন তারা বুঝতে পারতো তারা কতদূর এসেছে বা আর কতদূর তাদের যেতে হবে।

সমস্ত ফ্রান্সের মধ্যে ওই একটি বাড়িতে আলো জ্বলা মানে ওটা গুস্তভ ফ্লবেয়ারের বাড়ি। আর কার অমন দায় পড়েছে রাত জাগবার? দিনে আর রাতে কোনও সময়েই তাঁর লেখার বিরাম থাকতো না।

সেই জন্যেই তিনি বলে গেছেন 'Writing is dogs life, but the only life worth-living.'

আর বালজ্যাক্? অনর দ্য বালজ্যাক? ১৭৯৯ সালে যিনি জন্মে-ছিলেন, তিনি?

চাষীর বংশের ছেলে তিনি। তাই প্রচণ্ড পরিশ্রম করার ক্ষমতা তাঁর শরীরে। ছোটবেলায় তাঁকে প্যারিস শহরে স্কুলের বোর্ডিং-এ পাঠানো হলো লেখা-পড়া করবার জন্যে। বোর্ডিং স্কুলের কর্তা বাড়িতে রিপোর্ট পাঠাতেন-'আপনার ছেলে ক্লাসের বই পড়বার বদলে বাইরের নাটক নভেলই বেশি পড়ে।'

বাড়ি থেকে মা ছেলেকে চিঠি লেখেন 'তুমি যদি স্কুলের পাঠ্য বই না পড়ে বাইরের বাজে বই পড়ো তাহলে, বাৎসরিক ছুটির সময় তোমাকে বাড়িতে আসতে দেব না। ওই বোর্ডিং-এই তোমাকে বন্দী-জীবন কাটাতে হবে।

এরপর থেকেই তাঁর মনে হতো, যে মা এত নিষ্ঠুর সেই মা-ই তাঁর চরম শত্রু।

পাশ করার পর ছেলে বাড়ি এলো। বাবা জিজ্ঞেস করলেন—এবার তুমি কোন লাইনে যাবে ?

ছেলে বললে—আমি লেখক হবো। লেখাই আমার জীবিকা হবে।

বাবা বললেন—লেখক ? লেখক হবে তুমি ? লেখকদের টাকা হয় ? লিখে টাকা আসে ?

ছেলে তার সিদ্ধান্তে অটল। লেখক ছাড়া অন্য কিছু সে হবে না।

বাবা বললেন—আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাকে এক বছর টাইম দিলাম। এই এক বছরের মধ্যে তোমায় প্রমাণ দিতে হবে যে তুমি লেখক হতে পেরেছ। তোমাকে মাসে মাসে আমি পাঁচ টাকা করে পাঠাবো। তার মধ্যেই তোমার নিজের খাওয়া-থাকার খরচ চালাতে হবে।

তা তাইতেই বালজ্যাক রাজি। ছেলে আবার প্যারিসে চলে গেল। প্যারিস শহরে তখন অতো কম টাকায় পেট চালানো চলে না। তবু লেখক হওয়াব জন্যে সব কষ্ট সহ্য করতেই হবে তাকে, বালজ্যাক দিন-রাত জেগে জেগে একটা কাব্য লিখতে শুরু করলে। সে কী নিদারুণ কষ্ট তখন তার। হোক কষ্ট, তবু তাকে লেখক হতে হবে। কয়েক মাস ঠিক নিয়ম করেই ছেলেকে টাকা পাঠাতে লাগলেন বাবা। তারপর একদিন চিঠি গেল ছেলের কাছে—তুমি কী লিখেছ জানতে চাই, এখানে এসে ভাল পরীক্ষা দিয়ে যাও—

ছেলে বাড়ি এলো তার লেখা কাব্যের পাণ্ডুলিপি নিয়ে।

বাড়ির বৈঠকখানায় পরীক্ষার আসর বসলো। পরীক্ষক কে কে ? পরীক্ষক হলেন বাবা, মা, বুড়ি ঠাকমা, আর গ্রামের তখনকার দিনের একটা লিটল ম্যাগাজিনের প্রবীণ এক সম্পাদক।

ছেলে তার কাব্য পড়া শুরু করলো। এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, তিন ঘণ্টার ওপর সময় কাটলো সেই অর্ধ সমাপ্ত কাব্য পড়তে। ছেলে লক্ষ্য করলে তার ঠাকুমা সেই আসরে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডাকছেন।

তাদের মধ্যে সাহিত্য-বোদ্ধা তো কেউ নেই। তাই বাবা সেই লিটল-

ম্যাগাজিনের প্রবীণ সম্পাদককেই জিজ্ঞেস করলেন—আপনার কেমন লাগলো বলুন, ছেলে লেখক হতে পারবে কি?

ভদ্রলোক বললেন—মন্দ হয়নি, তবে এখনও অনেক অনুশীলন করতে হবে।

তারপর বালজ্যাকের দিকে চেয়ে বললেন—তুমি একদিন আমার কাছে এসো, আমি তোমায় শিখিয়ে দেব কী করে কাব্য লিখতে হয়।

বাবা ছেলেকে বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি তোমাকে আরও তিনমাস সময় দিলুম, তার মধ্যেই কিন্তু তোমায় লেখক হতে হবে।

মাত্র তিন মাস সময়! এই তিন মাসের মধ্যেই তাকে প্রমাণ করতে হবে সে লেখক হতে পেরেছে। তারপরে টাকা পাঠানো বন্ধ হয়ে যাবে। বালজ্যাক আবার প্যারিসে চলে গেল। তিনমাস দেখতে দেখতে কেটে গেল একদিন। তারপরে আর টাকা এলো না। তখন উপোস। রাস্তার জল খেয়ে পেট ভরানো, কখনও বা তাও না খেয়ে। শুধু জল খেয়ে কি বেঁচে থাকা যায়? বা শুধু হাওয়া খেয়ে?

তখন হঠাৎ তার এক, বন্ধু সব শুনে বললে—আচ্ছা, আমি তোকে টাকা দিতে পারি, তবে শর্ত এই যে সে-বই ছাপা হবে আমার নামে। বই ছাপানো, বাঁধানোর সব খরচ আমি দেব।

তা তাই-ই সই। সেইদিন থেকে কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেলেন বালজ্যাক নভেল লিখতে। তার বই পিছু কিছু কিছু টাকা আসতে লাগলো বালজ্যাকের হাতে। সেই টাকাতেই কোনও রকমে তাঁর গ্রাসাচ্ছাদন চলতে লাগলো। .বাবার টাকা পাঠানো বন্ধ হয়ে গেলেও কোনও অসুবিধে হলো না তাঁর।

শোনা যায় এই রকম করে নাকি তিনি চব্বিশটা বই লিখেছিলেন বেনামীতে।

কিন্তু তারপর আকস্মিকভাবে আবার একটা অদ্ভুত সুযোগ এসে গেল তাঁর হাতে।

তাঁদের গ্রামের এক সহপাঠী-বন্ধুর মা তাঁর কষ্টের কথা শুনে একটা ছাপাখানা কেনবার জন্যে কয়েক হাজার টাকা পাঠালেন বালজ্যাককে। অতোগুলো টাকা পেয়ে বালজ্যাক মহাখুশি। নিজেই নিজের বই লিখবেন নিজেই সে-বই ছাপাবেন, নিজেই সে-বই বিক্রি করবেন। তখন আর তাঁকে বেনামীতে বই লেখবার দুর্ভোগ সইতে হবে না। তখন লাভের গুড় আর পিঁপড়েয় খাবে না।

তখন থেকে তাই-ই করতে লাগলেন তিনি। দিন-রাতের আর কোনও খেয়াল থাকে না তাঁর। বই বেরোতে লাগলো একটার পর একটা। বিক্রিও হয় প্রচুর। কিন্তু হাতে তাঁর টাকা আসে না। দেনা বেড়ে যেতে লাগলো। পাওনাদাররা টাকার জন্যে জীবন অতিষ্ঠ করে দেয়। যাদের কাছে টাকা পাওনা থাকে তারা টাকা দিলেও হিসেব করবার সময় থাকে না তাঁর। ভালো লেখকও হতে হবে আবার তার সঙ্গে ভালো হিসেবও রাখতে পারবেন—এ দু'টো কখনও কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। শিল্পী হলেই বেহিসেবী হতে হবে আর হিসেবী হলেই তার দ্বারা শিল্পী হওয়া হবে না। এ দু'টো হলো তেল আর জল। এ দু'টো কখনও মিশ খাবে না। শিল্পী হলেই তোমাকে টাকার ব্যাপারে ঠকতে হবে, আর হিসেবী হলেই তোমাকে শিল্পের ব্যাপারে ঠকতে হবে। সংসারে দস্যু রত্নাকর আর বাল্মিকী একাধারে হওয়ার নিয়ম নেই। তাই বাল্মিকী যতদিন রত্নাকর ছিলেন ততদিন তাঁর ভালো ঘুম হতো, কিন্তু যেই তিনি বাল্মিকী হলেন তখন থেকে তাঁর ঘুম চলে গেল। তাই বাল্মিকীকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

অলৌকিক আনন্দের ভার, বিধাতা যাহারে দেয়,
তারে দেয় বেদনা অপার, তার নিত্য জাগরণ।

তখন তাঁর নামে সাতটা 'বডি -ওয়ারেণ্ট' বেরিয়েছে। তিনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান। তাঁকে দেখতে পেলেই পুলিশ ধরে নিয়ে জেলে পুরে দেবে। সেই সময় এক বন্ধু তাঁকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। তিনি তাঁকে নিজের বাড়ির চিলে-কোঠায় নিয়ে গিয়ে তুললেন। বললেন —এইখানে বসে বসে তুমি যা ইচ্ছে লেখো, তোমার খাওয়া-থাকা-পরার সমস্ত ভার আমি নিলাম।

সেই সময় থেকে শুরু হলো তাঁর অবিশ্রান্ত লেখক জীবন। সমস্ত দিন লিখেও যেন তাঁর আশ মিটতো না। রাত আটটার সময় তিনি ঘুমোতে যেতেন। রাত বারোটার সময় একজন তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দিত। সেই রাত বারোটার সময় থেকে ভোর ছ'টা পর্যন্ত অবিরাম লেখা চলতো তাঁর, আর কাপের পর কাপ চলতো 'ব্ল্যাক কফি' খাওয়া। আবার সকাল বেলা কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়ে সমস্ত দিন ধরে রাত আটটা পর্যন্ত লেখা আর লেখা আর প্রুফ দেখা। আর এইরকম অমানুষিক পরিশ্রমের ফলেই তিনি শেষের দিকে একেবারে অন্ধ হয়ে গেলেন।

১৮৫০ সালে ১৭ই আগস্ট রাত সাড়ে দশটার সময়ে তিনি শেষ

নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর ঘরে উপস্থিত ছিলেন একমাত্র তাঁর চিরশত্রু—তাঁর মা।

এখন ফ্রান্সের প্যারিস শহরের কেন্দ্রস্থলে ফরাসি সরকারের আদেশে শিল্পী রঁদার তৈরি বালজ্যাকের এক বিরাট মর্মর মূর্তি বিরাজ করছে। এইটেই বালজ্যাকের অমানুষিক পরিশ্রমের মরণোত্তর পুরস্কার।

স্টীফান জুইগ্ বালজ্যাকের জীবনী গ্রন্থের এক জায়গায় লিখে গেছেন, Balzac was the greatest creator of human characters next to God' অর্থাৎ ঈশ্বরের পরে একমাত্র বালজ্যাকই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানব-চরিত্রের স্রষ্টা।

আন্দ্রে মোরিয়োঁ বালজ্যাক সম্বন্ধে তাঁর একটি প্রবন্ধের প্রথম লাইনেই লিখেছেন 'Balzac was the watch-dog of Paris' অর্থাৎ প্যারিস শহরে কে কোথায় অন্যায় করেছে, কে কোথায় অনাচার করছে, কে কোথায় পাপ করছে, কে কোথায় কাকে ঠকাচ্ছে, আর কে কোথায় চুরি করছে তা কুকুরের মতন সমস্ত রাত পাহারা দেওয়াই ছিল বালজ্যাকের কাজ।

তাই গোড়াতেই বলেছি—মেজর লেখক হওয়ার প্রথম শর্তই হল অমানুষিক পরিশ্রম।

লেখককে লিখতে হবে পাঠকের মন নিয়ে

ভদ্রলোক ভারি রগ্-চটা মানুষ। পান থেকে চুন খসলেই একেবারে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসেন। রেগে গেলে তাঁর আর জ্ঞান থাকে না। তখন যা মুখে আসে তাই-ই বলে ফেলেন।

বলেন—এ কি রান্না হয়েছে, না ছাই হয়েছে?

বউ চিৎকার শুনে সামনে আসে। বলে—কী, হয়েছে কী? অতো চেঁচাচ্ছ কেন?

ভদ্রলোক বলেন—চেঁচাবো না তো কি ধেই ধেই করে নাচবো? যদি তাই করলেই তুমি খুশি হও তো না-হয় তাই-ই করি, নাচি—

বউ তবু কিছু বুঝতে পারে না। জিজ্ঞেস করে—তা কী হয়েছে সেটা বলবে তো!

ভদ্রলোক বলেন—এই কড়কড়ে বাসি ঠাণ্ডা ভাত কেউ খেতে পারে? আমি তোমাকে বলে গিয়েছিলুম না আমার আসতে একটু বেলা হবে, ভাত যেন গরম থাকে—

বউ-এর মেজাজও তখন একটু বিগড়ে গেছে। বললে—পারবো না আমি তোমার বেগার খাটতে, অতোই যদি তোমার গরম ভাত খাবার শখ তো পয়সা দিয়ে দাসী-বাঁদী রাখো গে। সে তোমার মুখে গরম ভাত যোগাবে। আমি তোমার মাইনে করা বাঁদী নই।

—ও, এই কথা? তাহলে নাও, পিণ্ডি চট্‌কাও—

বলে ভদ্রলোক ভাতের থালা ডালের বাটিটা ঘরের মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আর ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে শক্ত মেঝের ওপর থালা-বাটি পড়ে ঝন্-ঝন্ করে শব্দ করে উঠলো আর সেই ভাত-ডাল-তরকারি-গেলাসের জল ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে ছত্রখান হয়ে গেল, একাকার হয়ে গেল। এক কথায় জায়গাটা নরক-কুণ্ডু হয়ে উঠলো।

ভদ্রলোক তখন আর দেরি করলেন না। সেই অবেলায় তিতি-বিরক্ত হয়ে বাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে গেলেন। আর তারপর মাস খানেক আর তাঁর টিকি পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেল না।

এ কেমন ধারা লোক? এ কেমন ধারা মেজাজ?

না, ততোদিনে বউ এ লোকটাকে ভাল করেই চিনে ফেলেছে, তার মেজাজটার সঙ্গেও বউ-এর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গিয়েছে।

আর বউ যা ভেবেছিল ঠিক তাই-ই হলো। বলা-নেই কওয়া-নেই লোকটা হঠাৎ একদিন আবার বাড়ি ফিরে এলো। তখন যেন আবার অন্য চেহারা, যেন অন্য মানুষ। এই লোকটাই যে একদিন গাল-মন্দ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তাকে দেখে তখন কে তা বিশ্বাস করবে? মুখে এক গাল হাসি, ব্যবহারে আদর, বিনয়ে বৈষ্ণব! ভাদ্র মাসের আকাশের মতো। এই মুখ-গোমড়া মেঘ আর এই প্রাণ খোলা রোদ। ভারতচন্দ্রের ভাষায় 'ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।'

হাত বাড়িয়ে, একটা বাহারি কৌটো বউকে দিয়ে হাসতে লাগলো।

বউ প্রথমে কিছু বুঝতে পারলে না। বললে—এটা কী?

লোকটা বললে—খুলেই দেখ না—

খুলতেই দেখা গেল একটা দামী জড়োয়া নেকলেস্। বউ বুঝলে এটা ঘুষ। ঘুষ দিয়ে বউকে হাতে রাখা হচ্ছে। যাতে বউ আর তাকে না জ্বালায়।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা তাও নয়। আসল ব্যাপারটা হলো গল্পের প্লটে জট্ পাকিয়ে গিয়েছিল। হাজার চেষ্টা করেও সে-জট খুলছিল না। তাই লোকটার মেজাজ অতো খাপ্পা হয়ে গিয়েছিল। এখন জট্টা যে শুধু খুলেছে তাই-ই নয়, আর একটা নতুন জট্-এর পরিকল্পনাও মাথায় তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাই লোকটা এত খুশি। তাই এই এত দামী নেকলেসের ঘুষ।

এই লোকটার নাম হলো সিনক্লেয়ার লিউইশ (১৮৮৫—১৯৫১) এই যে গল্পে প্লটের জট্ পাকানো আর জট্ ছাড়ানোর কথা বলেছি—এটাই সব উপন্যাসের আদিম এবং প্রাথমিক কর্তব্য-কর্ম। এ-কাজ স্ত্রীকে দিয়ে করানো যাবে না, বাবা-মাকে দিয়ে করানো যাবে না, ছেলে-মেয়েকে দিয়ে করানো যাবে না, এমন কি হাজার-হাজার কর্মচারী দিয়েও করানো যাবে না। এ কাজ লেখকের একলারই।

গল্প আর প্লট্ এ দুটো কিন্তু এক জিনিস নয়। গল্পের উদাহরণ; 'এক রাজা ছিল তার এক রানী ছিল। রানী একদিন মারা গেল, সেই শোকে রাজাও মারা গেল।'

এই গল্পটাকে তখনই প্লট বলবো যখন সেটা এই ভাবে লেখা হবে; এক রাজার রানী মারা যাওয়ার পর রাজার শোক এত তীব্র হলো যে সে

শোক সহ্য না করতে পেরে রাজাও আর বাঁচলো না।

উপন্যাসে প্লটের এই জট পাকানো আর জট ছাড়ানোর ব্যাপারে যে-লেখক যতো দক্ষ হবে সেই লেখকই ততো সার্থক হবে।

রবীন্দ্রনাথের 'গানভঙ্গ' কবিতাটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করি :

আপনি গড়ি তোলে বিপদজাল
আপনি কাটি দেয় তাহা।
সভার লোক শুনে অবাক মানে
সঘনে বলে 'বাহা বাহা।'

অর্থাৎ লেখককে নিজেকেই বিপদজাল সৃষ্টি করতে হবে আবার লেখককে নিজেকেই বিপদজাল কেটে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। এই জাল ছড়ানো আর এই জাল গোটানোর মধ্যে যে-যন্ত্রণার রক্তাক্ত ইতিহাস লুকিয়ে থাকবে তা পাঠকরা যেন জানতে না পারে। সমালোচকরা যেন জানতে না পারে। এমন কি সমাজ-সংসার কেউ-ই যেন জানতে না পারে। জানবে একমাত্র একলা লেখকই। সোফোক্লিশ, কার্ল মার্কস, ফ্লবেয়ার, মোপাসাঁ, বালজ্যাক যাঁদের কথা আগে বলেছি, আর আজকে যাঁর কথা বলছি এই সিনক্লেয়ার লিউইস-ও সেই একই অমানুষিক যন্ত্রণার শিকার। পাঠকরা তোমার বই পড়বার সময়ে যদি বুঝতে পারে লিখতে তোমার কত যন্ত্রণা হয়েছে তাহলে তোমার সব সৃষ্টি ব্যর্থ হলো। পড়বার সময়ে, পাঠকদের যেন মনে হয় তুমি আনন্দের আবেগে লিখে গেছো। তাহলেই তুমি সার্থক।

ওই 'গানভঙ্গ' কবিতাটির আর এক জায়গায় আর একটি অদ্ভুত কথা লেখা আছে।

একাকী গায়কের নহে তো গান,
মিলিতে হবে দুই জনে।
গাহিবে একজন ছাড়িয়া গলা,
আর একজন গাবে মনে।

শুধু গায়ক নয় লেখকদের বেলাতেও এই একই কথা। প্রত্যেক লেখকের ভেতরে একজন থাকে লেখক-সত্তা আর একজন থাকে পাঠক-সত্তা। সাহিত্য হবে এই দুই সত্তার যৌথ সৃষ্টি। লেখক-সত্তা যখন লিখতে যাবে তখন তার পাঠক-সত্তা হয়তো বলবে—উঁহু হচ্ছে না, এটা লিখো না, ও-লাইনটা কেটে দাও, অন্য রকম করে লেখো। হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে···

সেই জন্যই একটা কথা আছে যে লিখতে পারলেই যেমন কেউ লেখক হয় না, তেমনি পড়তে পারলেই কেউ পাঠক হয় না। কোনও বই পড়ে ভাল বা মন্দ বলবার অধিকার সকলের থাকবার নিয়ম নেই। তা সে এম-এ, পি-এইচ-ডি, বা পি-আর-এস, যাই হোক না কেন। রসবোধ ডিগ্রি-নির্ভর নয়।

তাই যে-লেখকের ভেতরে একজন মেজর পাঠক-সত্তা থাকে সে-ই কেবল মেজর লেখক হতে পারে। যখন সিনক্লেয়ার লিউইশের প্রথম উপন্যাস 'ব্যাবিট' প্রকাশিত হলো তখন তাঁর বয়েস সাঁইত্রিশ। পাঠকরা উচ্ছ্বসিত। আর সমসাময়িক লেখকরা? তারা রেগে টঙ। একজন বললে—আমি বইটার নিন্দে করে একটা রিভিউ লিখবো।' আর একজন লেখক বললে—'খবরদার খবরদার, অমন কাজটি কোর না হে, তাহলে বইটা খুব বিক্রি হবে, ওরও খুব নাম হয়ে যাবে।

— তাহলে কী করবো। বইটা যে খুব বিক্রি হচ্ছে। এ তো আর সহ্য করা যাচ্ছে না।

বন্ধু বললে—স্রেফ চেপে যাও—

'ব্যাবিট' উপন্যাসটা বেরোবার দু'বছর পরে আবার একটা উপন্যাস বেরোল—'এ্যারোজস্মিথ'।

আমেরিকার সাহিত্যিক মহল আবার চমকে উঠলো। তারা বললে—Bugger has again done it!

অর্থাৎ 'বেটা আবার দেখিয়ে দিলে?'

তা কী আর করা যাবে। এই দ্বিতীয় বইটার জন্য সে-বছরে কিন্তু আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার 'পুলিটজার প্রাইজ' দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হলো। কিন্তু তারা বোধহয় এই রগ-চটা লোকটাকে তখনও ঠিক মতো চিনতে পারেনি। তিনি পুরস্কারটা নিতে অস্বীকার করলেন। যুক্তি হিসাবে লিখলেন—'আপনাদের দেওয়া পুরস্কারটা আমি গ্রহণ করতে অপারগ। কারণ আমি যদি এই পুরস্কার গ্রহণ করি তাহলে এই বিচারক-মণ্ডলীর ওপর আমার আস্থা প্রকাশ করা হয়ে যাবে। কিন্তু এর বিচারক-দের ওপর আমার কোনও আস্থাই নেই।'

কিন্তু আসল কারণটা ছিল অন্য। আসল কারণটা ছিল অভিমান। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ব্যাবিট' বইটিকে পুরস্কার দেওয়া হয়নি বলেই এই উদ্ধত প্রত্যাখ্যান।

কিন্তু স্মৃতি যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে তাহলে ১৯২৮ সালে তাঁকে

নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বোধহয় আমেরিকায় তিনিই প্রথম সাহিত্যিক যিনি প্রথম এই পুরস্কার পেয়েছিলেন।

তবে তাতেও তাঁর ওপর লেখক বন্ধুদের রাগ বা হিংসে এতটুকু কমেনি বরং বেড়ে গিয়েছিল। একটা সভায় তাঁর বন্ধু লেখক 'থিওডোর ড্রেইজার' আর নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি। সিনক্লেয়ার লিউইসের গালে প্রকাশ্যে এক থাপ্পড় মেরেছিলেন।

কিন্তু আমেরিকান সরকার মৃত্যুর পরে তাঁকে সম্মান দেখিয়েছেন। যে-গ্রামে তিনি জন্মেছিলেন সেই গ্রামটি 'সিনক্লেয়ার লিউইসে'র নামেই নামাঙ্কিত করা হয়েছে।

শেষ জীবনে তাঁর মৃত্যু হয় একটি হাসপাতালে। মৃত্যুও তাঁকে বন্ধুদের মতোই রেহাই দেয়নি। বড় কঠিন বড় নিষ্ঠুর বড় নিঃসঙ্গ সেই মৃত্যু। একমাত্র তাঁর সেক্রেটারি ছাড়া আর কেউ তখন কাছে ছিল না—এ কথা তাঁর বিবাহ-বিচ্ছিন্না স্ত্রীর লেখা জীবনী থেকেই জানতে পারা গেছে। ভাগ্যের এও এক তামাসা।

আমি বিশ্বাস করি

মাননীয় সংযুক্ত সম্পাদক 'দেশ' সাপ্তাহিকসমীপেষু—
বিনয় সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন,

আপনার পত্র পেলাম। আমার লেখক-জীবনের সূত্রপাত থেকে আজ পর্যন্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে আপনি আমার একটি রচনা পত্রস্থ করতে চেয়েছেন। নিজের সম্বন্ধে নিজে লেখার মত এত কঠিন কাজ আর দুটি নেই। বহুদিন ধরে লেখার জগতের মধ্যে বাস করে ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় অনেক রচনাই আমাকে লিখতে হয়েছে। যখন আংশিক ভাবে লেখক ছিলাম তখনও যেমন, আবার তারপর যখন পরিপূর্ণভাবে লেখাকে পেশা করে নিলাম তখনও তাই। ভালো-মন্দ পাঠ্য-অপাঠ্য এ-যাবৎ অনেক লিখেছি। অনেক গৌরবের পাশাপাশি আমার অনেক লজ্জাও ছাপা হয়ে গিয়েছে। গত বছরের সাহিত্য-সংখ্যায় 'এক নম্বর বর্মণ স্ট্রীট' রচনাটি লিখতে গিয়ে আমায় তেমন কোনও অসুবিধার মধ্যেই পড়তে হয়নি। কারণ তাতে আমার নিজের কথা বলার দায়-দায়িত্ব ছিল না। সেখানে আমি ছিলাম একজন দর্শক মাত্র। আমার চোখে আমার সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধব এবং তৎকালীন সাহিত্য-আবহাওয়ার বর্ণনা দেওয়াই ছিল আমার রচনার বিষয়বস্তু। সেখানে আমার উপস্থিতি ছিল একান্তই গৌণ!

কিন্তু এবার যে-দায়িত্ব আপনি আমার কাঁধে চাপিয়ে দিলেন তা অত্যন্ত দুরূহ। দুরূহ, কারণ এ-রচনার নায়ক আমি নিজে। আমার ব্যক্তি-সত্তাই এই রচনার বিষয়বস্তু। নিজেকে আড়ালে রেখে নিজের কথা বলবো কী করে? অথচ নিজেকে নিজের রচনার আড়ালে রাখাই তো সবচেয়ে বড় শিল্প-কর্ম। নিজেকে অদৃশ্য রেখে সাহিত্য-রচনায় কলা-কৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টাই তো এতদিন করে এসেছি। তাতে যে সব সময়ে সার্থক হতে পেরেছি তা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই যে আমি ব্যর্থ হয়েছি তা স্বীকার করতে আজ এ-বয়সে আমার লজ্জা নেই। আব্রাহাম কাউলে সাহেবও বলেছেন যে, নিজের সম্বন্ধে নিজে লেখা সব চেয়ে শক্ত

কাজ। লেখক যদি সে-লেখার মধ্যে নিজেকে প্রশংসা করেন তাহলে পাঠকদের কাছে তিনি বিরাগভাজন হবেন আর তিনি যদি তাঁর নিজের লেখার নিন্দেও করেন তাহলে আবার লেখকের নিজের কাছেই তা অপ্রীতি-কর ঠেকবে।

তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লেখকদের লেখা আত্মজীবনী রচনাবলী ব্যর্থতায় পরিণত হয়। হয় তা আত্মপ্রশংসা বা আত্মপ্রচারমুখর হয়ে ওঠে আর নয় তো তা কুৎসিত পরচর্চায় পর্যবসিত হয়।

যা হোক, আপনার নির্দেশ মাথা পেতে নিলাম। নিলাম এই কারণে যে 'দেশ' পত্রিকায় আমার অনেক ধারাবাহিক রচনা গত তিরিশ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে এবং সেই সূত্রে 'দেশ'-এর অসংখ্য পাঠকের সঙ্গেও আমার একটা পরোক্ষ যোগসূত্র চিহ্নিত হয়ে আছে। এবং তাঁদের পক্ষ থেকেও আমার ওপর একটি পরোক্ষ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাই ভাবলাম এ তো শুধু আপনার একলার প্রত্যক্ষ নির্দেশই নয়, পরোক্ষভাবে আমার পাঠকদের দাবিও এর সঙ্গে জড়িত।

সেই তাদের দাবি মেটাতেই আজ কলম ধরেছি।

কিন্তু নিজের কথা বলবার আগে আর একজন বিদেশী লেখকের কথা বলে নিই। সেই বিদেশী লেখকের কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে তাঁর লেখকজীবনের পরিচিতি থেকে ভাবী লেখকদের অনেক কিছু শেখবার আছে। তাঁর নাম স্যামুয়েল বাটলার।

১৯০২ সালে স্যামুয়েল বাটলারের মৃত্যু হয়। অর্থাৎ আমাদের জন্মের অনেক আগে। আমরা যে-সমাজ দেখেছি সে সমাজের বাইরের লোক তিনি। তার ওপর তিনি এমন এক দেশের সাহিত্যিক যে-দেশ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন, এবং যে-দেশে তখন দিনে রাতে সূর্য কখনও অস্ত যেত না। তিনি সেই দেশের সাহিত্যিক হয়েও যে নিদারুণ অবহেলা ও আঘাত পেয়েছেন তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় এবং পরোক্ষভাবে উৎসাহ ও সাহস পাওয়া যায়।

তিনি এক-একটা করে বই লিখতেন আর তা অবহেলিত হয়ে প্রকাশকের দোকানেই পড়ে থাকতো, কেউ একখানা কপি কিনেও তাঁকে ধন্য করতো না। ১৮৮০ সালের মধ্যে তাঁর ছ'খানা বই প্রকাশিত হবার পরেও তিনি দেখতে পেলেন তাঁর বই কোনও সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না।

চেনা লোকেরা তাঁকে উপদেশ দিতে এগিয়ে এল।

তারা বললে—কী হে, এতগুলো বই লিখেও তো তোমার কিছু হলো না—

বাটলার বললেন—তা না হলে না হবে, আমি তার জন্যে আর কী করতে পারি ?

তারা বললে—এ-রকম হাত গুটিয়ে বাড়িতে বসে থাকলে কি চলে ? একটু ঘোরা-ঘুরি করতে হয়, পাঁচজনের সঙ্গে দেখা-শোনা করতে হয়, তবে তো হবে।

তিনি বললেন—কোথায় ঘোরাঘুরি করবো ?

—কেন ? যাদের সঙ্গে মিশলে তোমার স্বার্থ-সিদ্ধি হবে তাদের সঙ্গে মিশবে। ধরো কোনও সম্পাদক, বা কোনও সমালোচক, তাদের কাছে গেলে। গিয়ে তাদের সঙ্গে ভাব করলে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সব লেখকই তো তা করে থাকে। তাই করাই তো নিয়ম। আর তুমি কি এমন তালেবর লেখক যে তুমি পাখার তলায় বসে বসে বই লিখবে আর তারা তোমায় বাহবা দেবে ?

কথাটা শুনে বড় রাগ হয়ে গেল বাটলারের। তিনি বললেন—ওদের বাড়ি গিয়ে গিয়ে যদি সমস্ত সময়টা নষ্টই করি তাহলে বই পড়বোই বা কখন আর বই লিখবোই বা কখন, বলুন ?

তারা বললে—সময় করে নিতে হবে। অন্য লেখকরা যেমন করে সময় করে নেয় তেমনি করেই সময় করে নেবে। তুমি কি বলতে চাও তুমি একলাই লেখক আর কেউ লেখক নয়। আর তা যদি না পারো তো রাত্তির জেগে জেগে লেখো আর দিনের বেলা ওদের সঙ্গে দহরম-মহরম করে বেড়াও—

কিন্তু স্যামুয়েল বাটলার ছিলেন অন্য ধাতের লেখক। তিনি ওই ধরনের কাজ করে সার্থক লেখক হওয়াকে বলতেন 'guinea-pig success'। তাই স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তিনি কারোর সঙ্গেই দেখা করতেন না। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল তিনি তাঁর নোটবুকে লিখে রেখে গেছেন "I am too fond of independence to get on with the leaders of literature and science. Independence is essential to permanent but fatal to immediate success."

এই কাহিনী অবশ্য আমি আমার লেখক-জীবনের শুরুতে জানতাম না। বড় হয়ে বই পড়ে জেনেছি। জেনেছি আর অবাক হয়ে ভেবেছি এ-রকম সাহস এ-রকম আত্মবিশ্বাস আমাদের এ-যুগে ক'জনের আছে ?

লেখকের জীবদ্দশায় যে-কোনও সম্মান সন্দেহজনক আর সে-সম্মান যে বেশির ভাগই guinea-pig success এ-কথা রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও পড়েছিলাম, কিন্তু সে-যুগের স্যামুয়েল বাটলার তা জানলেন কেমন করে? রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন "বাঁচিয়া থাকিতেই যদি আগাম শোধের বন্দোবস্ত হয় তবে সেটাতে বড় সন্দেহ জন্মায়। সংসারে অনেক জিনিস ফাঁকি দিয়া পাইয়াও সেটা রক্ষা করা চলে। অনেকে পরকে ফাঁকি দিয়া ধনী হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত একেবারে দেখা যায় না তাহা নহে কিন্তু যশ জিনিসটিতে সে সুবিধা নাই। উহার সম্বন্ধে তামাদির আইন খাটে না। যেদিন ফাঁকি ধরা পড়িবে সেইদিনই ওটি বাজেয়াপ্ত হইবে। মহাকালের এমনই বিধি। অতএব জীবিতকালে কবি যে সম্মান লাভ করিল সেটি সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার জো নাই।"

এ লেখাটাও ছোটবেলায় আমার নজরে পড়েনি। বাড়িতে আলমারিতে যেখানে চামড়ায় বাঁধাই বই থাকতো সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র, নবীন সেন, মাইকেল, দীনবন্ধু মিত্রের রচনাবলীর ওপরে সোনার জলে লেখা তাঁদের নামগুলো কাঁচের বাইরে থেকে ঝক-মক করতো। কিন্তু সেগুলো পড়বার অনুমতি পেতাম না। উপন্যাস পড়লে কোমল-মতি ছেলে-মেয়েদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটবে এইটেই ছিল তখনকার আমলের শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুজনদের ধারণা। তাই বইগুলোর ভেতরের বিষয়বস্তু আমার নাগালের বাইরে রাখবার জন্যে আলমারির দরজা বরাবর চাবি-বন্ধ হয়ে থাকতো।

মনে আছে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার আগে ওর চাবিও আমার হস্তগত হয়নি। যেদিন তা হস্তগত হলো তখন প্রথমেই পড়লাম 'দুর্গেশনন্দিনী'। আমার জীবনের সেই মহৎ উপন্যাস পড়বার অপূর্ব উপলব্ধির কথা আমার এখনও মনে আছে। ভাবলাম বই পড়তে পড়তে এই যে অপার অনুভূতি হওয়া একে তো কোনও ব্যাখ্যা দিয়ে বিশ্লেষণ করা যাবে না। এরই নাম কি তবে ব্রহ্মস্বাদ সহোদর?

মানুষের বয়েস যখন কম থাকে, তখন অতি অল্পতেই সে অভিভূত হয়ে পড়ে। সামান্য পেলেই সে খুশী হয়। তার বেশি সে পেতে চায় না। কিন্তু এমন এক-একজন বেয়াড়া ছেলে-মানুষও সংসারে থাকে যে অনেক কিছু খেলনা পেয়েও আরো বড় কিছু খেলনা পাওয়ার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সেই পাওয়াতেই মানুষের চরম আনন্দ যার মধ্যে না-পাওয়া জড়িত'। 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়বার পর আমি

থেমে থাকলুম না। একে- একে বঙ্কিমচন্দ্রের সবগুলো রচনা শেষ করে ফেললাম। কিন্তু তাতেও আমার তৃপ্তি হলো না। মনে হলো আরো বই পড়ি। কিন্তু কোথায় পাবো আরো বই ? আমার বাড়িতে যে-সব বই ছিল সেগুলো তখন নিঃশেষ। আমার মনের ভেতরে উপন্যাস লেখার একটা ক্ষীণ তাগিদ এল। এর আগে সাহিত্য-রচনার কোনও ইচ্ছাই বা আগ্রহই আমার হয়নি। মনে আছে যখন সবে আমি কৈশোরে পা দিয়েছি, যখন আমার বয়েস বারো বছর কি বড় জোর তেরো, তখন এমন একটা সুযোগ এল যা সেই সময়ে আর কখনও আসেনি। সুযোগটা হলো এই যে হাওড়া স্টেশন থেকে বিহারের এক সুদূর গ্রামে আমাকে একলা ট্রেনে করে যেতে হবে। উদ্দেশ্য, আমাদের বাড়ির এক বিবাহ অনুষ্ঠানে আমার এক আত্মীয়াকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা। বরাবর বাবা-মা আত্মীয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের তীর্থগুলোতে ভ্রমণ করে এসেছি। কিন্তু স্বাধীন হয়ে একলা ট্রেনে উঠবো, প্ল্যাটফরমের ভেণ্ডারদের কাছ থেকে যা-ইচ্ছে তাই কিনে খাবো, কেউ কিছু বলবে না, পয়সার জন্যেও কারো কাছে হাত পাততে হবে না, এ বড় কম স্বাধীনতা নয়।

তা যথাসময়ে সুটকেশ-বিছানা নিয়ে ট্যাক্সি চড়ে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম। নিজেই ট্রেনের কামরায় চড়ে বসলাম। ঠিক যেমন ভঙ্গি করে বড়রা ট্রেনে চড়ে তেমনি ভঙ্গিই অনুকরণ করলাম। গাড়িতে বাকি তিনটে বার্থে আরো তিনজন প্যাসেঞ্জার। আমার কাছে সেকালের সেকেণ্ড-ক্লাসের টিকিট। সুতরাং আমার ভাবখানাও রীতিমত খানদানি। কুলীর পাওনাও মিটিয়ে দিলুম কিন্তু ট্রেন ছাড়বার তখন অনেক দেরি। রাত তখন প্রায় সাতটা কি সাড়ে সাতটা। সমস্ত রাত ট্রেনে চড়ে ভোরের দিকে মোকামা ঘাট জংশনে স্টীমারে গঙ্গা পার হতে হবে। তারপর স্টীমার থেকে ট্রেনে সিমারিয়া-ঘাটে আবার ট্রেন ধরে গন্তব্যস্থলে পেঁছোতে পরের দিন দুপুর প্রায় বারোটা বেজে যাবে। এতখানি সময় একলাই কাটাতে হবে আমাকে। সঙ্গে একজন কেউ থাকলে তবু তার সঙ্গে কথা বলে সময়টা কাটানো যায়। কিন্তু এ তো তা নয়। আমার সঙ্গী বলতে মাত্র আর তিনজন, যারা আবার আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এবং বয়েসেও অনেক বড়। সুতরাং সময় কাটাই কী করে ?

এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ নজরে পড়লো আমার কামরার সামনে প্ল্যাটফরমের ওপর একটা ঠেলা-গাড়ি গড়িয়ে চলেছে। তাতে অসংখ্য রং-

চণ্ডে পত্রিকা। মনে হলো বড়দের মত আমিও যে-কোনো একটা পত্রিকা কিনি। তবুও তো তাই পড়ে সময়টা কাটবে!

সালটা বোধহয় ১৯২৪ কি ১৯২৫। আর কালটা বোধহয় কার্তিক মাস। অর্থাৎ দুর্গাপুজো কেটে গিয়ে, কালীপুজোও কেটে গেছে। অগ্রহায়ণ তখন পড়বে-পড়বে। দেখলাম অনেক পত্রিকাবাহী সেই ঠেলা-গাড়িটা আমাকে কাছে যেতে দেখে থেমে গেল। আমি দেখলাম বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি সেকালের নামী দামী চালু পত্রিকা সাজানো। কিন্তু দাম বড় বেশি। আট আনা করে এক একটা। আমি অপেক্ষাকৃত সস্তার পত্রিকা খুঁজে একটা পত্রিকা হাতে তুলে নিলাম। সেখানার নাম 'বাঁশরী', সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু। দাম বোধহয় মাত্র চার আনা। তা চার আনা পয়সার দাম সে যুগে অনেক। আমি দাম দিয়ে পত্রিকাখানা হাত নিয়ে আবার আমার কামরায় এসে বসলাম আর পত্রিকাটির পাতা ওল্টাতে লাগলাম। ওল্টাতে ওল্টাতে একটা জায়গায় এসে হঠাৎ থেমে গেলাম। একটা ছোট কবিতা। পত্রিকাটির পাতার ডানদিকে পাদপূরণ হিসাবে সেটি ব্যবহৃত হয়েছে। সে যুগের রীতি অনুযায়ী ছন্দ মিলিয়ে লেখা। কবিতাটির লেখকের নাম মনে নেই। এমন কি কবিতার একটি লাইনও মনে নেই এখন। তবে এইটুকু মনে আছে যে কবিতাটির আশে-পাশে অনেকখানি খালি জায়গা পড়ে ছিল। কবিতাটি পড়তে পড়তে আমার হঠাৎই মনে হলো আমি যেন নিজেও চেষ্টা করলে এ-রকম কবিতা লিখতে পারি। পকেটে তখন আমার কাগজও নেই, ফাউণ্টেন পেনও নেই। আর এখনকার মত তখন ফাউণ্টেন-পেনেরও এত প্রচলন ছিল না। তবে তখনকার রীতি অনুযায়ী ছিল মাত্র একটা পেনসিল। সেই পেনসিলটা দিয়েই সেই কবিতার ফাঁকা জায়গাটুকু একটা কবিতা লিখে ভর্তি করে ফেললাম। অক্ষম মিল, অক্ষম কাব্য, অক্ষম প্রচেষ্টা। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? সেই চলন্ত ট্রেনের সে-যুগের নিরিবিলি সেকেণ্ড-ক্লাশ কামরার মধ্যেই সে-রাত্রে আমার জীবনের প্রথম কবিতা সৃষ্টি হলো।

ভালো-খারাপের বোধ তখন হয়নি। ভালো হোক খারাপ হোক, 'আমি'র সঙ্গে 'স্বামী' এবং 'খেলা'র সঙ্গে 'হেলা' এবং 'যায়'-এর সঙ্গে 'হায়' তো মিলিয়েছি। বারো বছর বয়েসে ওর চেয়ে বেশি আশা আর কী করতে পারি। ছাপানোর প্রশ্ন অবশ্য তখন মাথায় উদয় হয়নি। কারণ তখন হাতে লেখা পত্রিকার যুগ। লেখা যদিও সম্ভব, ছাপানো তো আরো

কঠিন সমস্যা। সুতরাং আমার সেই লেখা সেইখানেই শেষ। এ-ঘটনাটা এখানে উল্লেখ করতে হলো। এই কারণে যে আমার পাঠকদের অনেকের মনেই একটা জিজ্ঞাসা আছে যে কেমন করে কখন আমার মনে লেখার ইচ্ছে জাগ্রত হলো।

আপনিও লিখেছেন, 'আমরা জানতে চাই সাহিত্য-কর্মে প্রথম প্রবেশের প্রেরণা আপনার মধ্যে কী ভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল।' আশা করি ওপরে বর্ণিত ঘটনায় আপনার এ-প্রশ্নের জবাব নিহিত রয়েছে। তবু সাহিত্য-কর্মে প্রবেশের প্রেরণার উৎস সম্বন্ধে এইটেই আমার একমাত্র জবাব নয়, প্রধান প্রেরণার উৎস সম্বন্ধে পরে আরো বিশদভাবে বলবো।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'আপনার রচনা প্রথমে কবে কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল ?

এ-প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে আবার কিছু গোড়ার কথায় যেতে হবে। স্মৃতিশক্তিকে প্রখর করলে তবে অত সুদূর গোড়ার কথায় পেঁছোন যায়। কিন্তু সে কি আজকের কথা ? আঁদ্রে জিদের একটা চমৎকার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তিনি কোথায় যেন লিখেছেন লেখকের জীবনে তিনটে স্তর থাকে। প্রথম স্তরে অর্থাৎ একেবারে বাল্যকালে বা লেখক-জীবনের সূত্রপাতে লেখক ভাবেন যে তিনি যা লিখছেন তা অপূর্ব, তা একেবারে তুলনাহীন। কিন্তু সম্পাদক বা পাঠক তাঁকে ঠিকমত বুঝতে পারছেন না। তখন তাঁর মনে হয় সম্পাদক বা পাঠক নির্বোধ বলেই তিনি যথাযোগ্য সম্মান পাচ্ছেন না। এই প্রথম স্তরে লেখকের মনে সম্পাদক বা পাঠকদের ওপর ঘৃণা জন্মায়। যার ফলে লেখক মানসিক অশান্তিতে ভোগেন।

এর পরে দ্বিতীয় স্তর। এই দ্বিতীয় স্তরে পেঁছে লেখক নিজের রচনার দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে একটু ওয়াকিবহাল হন, আর সম্পাদক বা পাঠক সম্প্রদায়ও তখন আংশিকভাবে লেখককে গ্রহণ করতে শুরু করে। বলতে গেলে তখন থেকেই শুরু হয় লেখকের ভালো-মন্দের বিচার বিশ্লেষণ। তবে উল্লেখ করা ভালো যে এই দ্বিতীয় স্তরে পেঁছোবার আগেই অনেকে কঠোর সংগ্রাম সহ্য করতে না পেরে বা অর্থলোভে লেখার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে কোনও সহজলভ্য সাফল্যের আশায় বিষয়ান্তরে আত্মনিয়োগ করেন, অর্থাৎ লেখার জগৎ থেকে তাঁর অন্তর্ধান ঘটে। তিনি তখন কোনও নিশ্চিত চাকরি বা পেশা গ্রহণ করে অবসর মত সামান্য সামান্য সাহিত্যচর্চা করেন।

এবার তৃতীয় স্তর।

এই স্তরটিই লেখকের জীবনে মারাত্মক।

যাঁরা অক্লান্ত ধৈর্য আর অসীম মনোবলের অধিকারী, যাঁরা বিপক্ষের নিন্দা বা কুৎসায় বিভ্রান্ত বা বিক্ষিপ্ত হন না, তাঁরাই কেবল এই তৃতীয় স্তরে পেঁছোবার শক্তি রাখেন। কিন্তু তা বলে সংগ্রামের শেষ তাঁর তখনও হয় না। বরং সংগ্রামের তীব্রতা হাজার গুণ বাড়ে। তখন সেই লেখকের ওপর সম্পাদক বা পাঠকদের দাবি উত্তরোত্তর তীব্র হতে থাকে, এবং এই দাবি মেটাতে গিয়ে কঠোর পরিশ্রমে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে নিঃশেষিত হওয়াই তাঁর একমাত্র বিধিলিপি।

আঁদ্রে জিদের এই মতের সঙ্গে অনেক লেখকের জীবনই হয়ত মিলে যাবে, আবার কোনও লেখকের মত হয়ত বা মিলবে না। তবে আমার নিজের মনে হয়েছে কথাটা অর্ধ-সত্য বা অর্ধ-মিথ্যে।

পূর্ণ সত্য তো একমাত্র ব্রহ্ম। অবশ্য ব্রহ্ম বলে যদি কিছু থাকে। এ ছাড়া পৃথিবীর আর সবই তো অর্ধ-সত্য। আপেক্ষিক। তাই সব সময়ে একজন লেখকের জীবনের সঙ্গে আর একজন লেখকের জীবনের ঘটনার মিল থাকে না। আমার জীবনে আঁদ্রে জিদের এই কথাগুলো কতটা সত্য তাই ভাবা যাক্।

যতদূর মনে পড়ে কালগতভাবে আমার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় এমন একটি পত্রিকায় যার নাম এবং যে-লেখার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমার কিছুই মনে নেই। কলকাতা শহরে যে-অঞ্চলে আমার বাস সেই অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হতো একটি ছোট পত্রিকা। আজকালকার ভাষায় যাকে বলা যায় 'লিটল ম্যাগাজিন'। কিন্তু ছাপা অক্ষরে যখন সেটি প্রকাশিত তখন তাকে প্রথম প্রকাশই বলা চলে। বা প্রথম প্রকাশ্য আত্মপ্রকাশ! কিন্তু ঘটনাটা আমাকে তত আনন্দিত করেনি। আনন্দিত না-করার কারণ এই যে সম্পাদক ছিলেন আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দাদা। ছোট ভাই-এর বন্ধুর লেখা কবিতা বড় ভাই-এর সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশিত হবে এতে আমার গর্বিত হবার কী আছে? সুতরাং এটা আমার প্রকাশিত রচনা হিসেবে চিহ্নিত হবার দাবি নামঞ্জুর হয়ে গেল।

'সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশের প্রেরণা'র সঙ্গে 'প্রথম রচনা' প্রকাশিত হবার যদি কোনও যোগসূত্র থাকে তাহলে বলবো আমার জীবনে ও দুটোই ছিল একার্থক। কারণ প্রেরণাই তো প্রকাশের উৎস। আর এই প্রেরণার উৎস ছিল আমার চারপাশের জগৎ। এই চারপাশের যে জগৎ তা আমার সৌভাগ্য

বশত আমার প্রতি ছিল নিষ্ঠুরভাবে বিরূপ। এ ছাড়া আমার জীবনে আমাকে নিরুৎসাহ ও নীরব করে দেবার লোকের কখনও অভাব হয়নি—এ কথা প্রকাশ করতে আজ আমার গর্ববোধ করবার কারণ ঘটেছে। এখানে বলে রাখা ভালো যে বাল্যকাল থেকে আমি ছিলাম একান্তভাবেই সঙ্গীতের ভক্ত। সঙ্গীত আমাকে যত আকর্ষণ করতো, সাহিত্য তত নয়। আমার চারপাশের বিরূপ জগৎ যখন আমাকে নিঃসঙ্গ করে দিলে তখন সঙ্গীতই ছিল আমার একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু সঙ্গীত আত্মপ্রকাশের এমনই এক মাধ্যম যা চর্চা করতে গেলে নিঃশব্দ হয়ে করা যায় না। ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে করলেও যার শব্দভেদী বাণ পাড়া-পড়শির কান বিদ্ধ করে বিরক্তি উৎপাদন করবার কথা। বাড়ির ছাদ আর নির্জন নিরিবিলি প্রান্তরই যার পক্ষে উপযুক্ত স্থান। আর সঙ্গীত বলতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বা গ্রাম্য লোক-সঙ্গীত তো নয়, সঙ্গীত বলতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কথাই বলছি; সে আরো বিকট। যার শিক্ষানবিশি-কালে মধ্যবিত্ত পরিবারের নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুজনরাও পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহাকুল হয়ে ওঠেন।

আর স্কুলের লেখাপড়া?

আমি বরাবর খাই-দাই আর কাঁশি বাজাই গোছের লোক। সেই কাজগুলোই আমার স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায়। একদিকে গান আর একদিকে কবিতা লেখা—এই দুই রকম কাঁশি এক হাতে বাজানো বড় কম কেরামতির কাজ নয়। তবু তাই নিয়েই থাকি। তখনকার যুগে সিনেমা বা বাড়িতে বাড়িতে রেডিও বাজাবার ধুম ছিল না। ভালো কালোয়াতি গান শুনতে গেলে কলকাতা শহরের কোন ধনী জমিদার বা বড়লোকের বাড়ির আসরে গিয়ে রাত জেগে সে-গান শুনতে হতো। কিন্তু কবিতা? আমি নিজের ঘরের ভেতরে বসে কবিতা লিখছি না ভূগোল পড়ছি তা কেউ বুঝতে পারতো না। সুতরাং সাহিত্য করার মত নিরাপদ এবং নিরুপদ্রব কাজ আমার স্বভাবের পক্ষে ছিল বড় অনুকূল।

একদিন আমাদের বাড়ির পাশের এক সহপাঠী আমাকে সংবাদ দিলে যে তার যিনি গৃহ-শিক্ষক তিনিও কবিতা লেখেন। সংবাদটা সুসংবাদ। বাড়ির এত কাছে এমন একজন কবি থাকতে কিনা আমি নিঃসঙ্গতা রোগে ভুগছি! তবে যে কুলোকে বলে ভগবান নেই?

উৎসাহে উন্মত্ত হয়ে আমার ইস্কুলের একজন সমবয়েসীকে কথাটা বললাম। উৎসাহ তারও খুব। কারণ সেও কবিতা লেখে। কবিতা কবিয়ো গতি।

সুতরাং শুভস্য শীঘ্রম। আমি আর সেই আমার সমবয়েসী বন্ধু অজিত পরদিনই কবিতার খাতা বগলে নিয়ে সহপাঠীর মাস্টার মশাই-এর কাছে গেলাম। আমি আর অজিত দুজনেই কবিতা লিখি। সুতরাং দুজনেই আমাদের কবিতা সম্বন্ধে একজন বয়স্ক কবির মতামত জানতে আগ্রহী।

মাস্টার মশাই তখন বি-এ পাস করেছেন। বেশ কবি-কবি চেহারা। লম্বা-লম্বা এলোমেলো চুল, গায়ে তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী ঢোল্লা পানজাবি।

আমাদের সঙ্গে কবিতা সম্বধে তার অনেক আলোচনা হলো। তিনি বললেন—কবিতা লেখা বড় শক্ত জিনিস, ওটা সকলের আসে না, এমন কি চেষ্টা করলেই যে কেউ কবি হতে পারবে এমন কোনও গ্যারাণ্টি কেউ দিতে পারে না—

বলে নিজেই তিনি একটা খাতা বার করলেন। তারপর বললেন—এই দেখ, আজকে ভোরবেলাই এই কবিতাটা মাথায় এসে গেল তাই সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলেছি, পড়ছি, শোন—

তিনি তাঁর কবিতা পড়তে লাগলেন আর আমরা মুগ্ধ হয়ে তা শুনতে লাগলাম।

> বাঁশ-বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই,
> মাগো আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই ?
> পুকুর ধারে লেবুর তলে,
> থোকায় থোকায় জোনাক জ্বলে,
> ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই ;
> মাগো আমার কোলের কাছে কাজলা দিদি কই ?

মস্ত বড় কবিতা। পড়তে অনেকক্ষণ সময় লাগলো। কিন্তু মনে হলো আরো অনেকক্ষণ সময় লাগলেও যেন ভালো হতো। যেন অত্যন্ত কম সময়ে পড়া শেষ হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলেন—কেমন লাগলো ?

আমরা দুজনেই বললাম—অপূর্ব—

মাস্টার মশাই বললেন—তোমরাও তো কবিতা লেখ শুনেছি, কবিতা এনেছ ?

অজিত তৈরিই ছিল সঙ্গে সঙ্গে খাতাটা বার করে পড়তে লাগলো—

"ওগো কালো মেঘ বাতাসের বেগে
যেওনা যেওনা যেওনা ভেসে।
নয়ন জুড়ানো মুরতি তোমার
আরতি তোমার সকল দেশে"

মাস্টার মশাই খুব মন দিয়ে চোখ বুঁজে শেষ পর্যন্ত শুনলেন। পড়া শেষ হলে অজিতকে বললেন—খুব ভালো, তোমার হবে, তবে ছন্দ সম্বন্ধে যদি আর একটু কেয়ারফুল হও তো বড় হলে তুমি খুব নাম করবে···

তারপর আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি ?

আমি তখন লজ্জায় জড়-সড় হয়ে আছি। আমার কবিতাটা যদি মাস্টার মশাই-এর ভালো না লাগে ?

শেষ পর্যন্ত পড়তেই হলো, আর পালাবার পথও আমার ছিল না তখন। একটা লাইন পড়ি আর ওদের মুখের দিকে সভয়ে চেয়ে দেখি। তাদের মুখে তাদের মনের কোনও রেখাপাত হলো কিনা তাই লক্ষ্য করতে চেষ্টা করি।

কোনও রকমে কবিতা শেষ করে মাস্টার মশাই-এর মুখের দিকে চাইতেই বুঝতে পারলাম তাঁর ভালো লাগেনি।

মাস্টার মশাই শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন।

বললেন—তোমারটা তো হয়নি হে—

আমি মুষড়ে পড়লাম। তেরো বছর বয়েসের একজন বালকের মুখের ওপরেই মাস্টার মশাই স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন—না, তোমারটা তো হয়নি—

কেন হয়নি, কেন হবে না, কী করলে হবে, কোথায় দোষ ত্রুটি, তার কোনও হদিশ নেই, তার কোনও নির্দেশও নেই। শুধু হয়নি আর হবে না এই কথা শোনবার জন্যেই আমি যেন এতদিন বেঁচে আছি। তেরো বছর বয়েসই হোক আর তিপ্পান্ন কি তিয়াত্তর বছর বয়েসই হোক, আমার কোনও দিন কোনও কিছু হবার নয় যেন। সকলের কাছেই চিরকাল একটা কথা শুনে শুনে আমার কান ঝালাপলা হয়ে গেছে যে—আমার কিছুই হয়নি—হবে না—

অথচ যাদের হবার কথা সেই সহপাঠীর মাস্টার মশাই পরবর্তী জীবনে হাজারিবাগে কাঠের ব্যবসা করে প্রচুর টাকা উপার্জন করেছিলেন, এবং আমার সেই সমবয়েসী বন্ধু পরবর্তী জীবনে ক্যালকাটা করপোরেশনের লাইসেন্স বিভাগের বড়বাবুর পদাভিষিক্ত হয়ে সেই চেয়ারের শোভা বর্ধন

করেছিলেন। ভালোই করেছিলেন। কারণ পরে জেনেছি প্রথমজন যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বিখ্যাত কবিতাটি হুবহু অনুকরণ করেছিলেন, এবং দ্বিতীয়জন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিখ্যাত কবিতাটি অনুকরণ করে সেদিন প্রথম জনের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। তাঁরা দুজনেই সেদিন পরের কবিতা আত্মসাৎ করেও সুখ্যাতি কুড়িয়েছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক ত্যাগ করে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমিই মরেছি। আমি এ নেশা আর ছাড়তে পারিনি। আর এতদিনে আমি জেনে গিয়েছি যে ব্যাধি একবার যখন আমাকে আক্রমণ করেছে তখন যতদিন না আমার মৃত্যু হয় ততদিন এ আর আমাকে ছাড়বে না।

অবশ্য একে ব্যাধি বলছি বটে, কিন্তু সত্যই কি এ ব্যাধি?

এ ছাড়া তো অন্য কোনোও পথও ছিল না আমার। আমাদের ছোট বয়েসে সেই দেশব্যাপী বেকারত্বের যুগে যার কিছু হবার নয় সে হোমিওপ্যাথি পড়তো। আমি বোধহয় তার চেয়েও ছিলাম অধম। অর্থাৎ যাত্রার কথোপকথনের ভাষায় যাকে বলা যায় 'নরাধম'। তখন না পারি কারো দিকে মুখ তুলে চেয়ে কথা বলতে আর না পারি নিজের ন্যায্য দাবি জোর করে আদায় করতে। এখনকার মত আঘাত পেলে চুপ করে থাকাই আমার বরাবরের স্বভাব। কলা-কৌশলে নিজের কার্যসিদ্ধি করার যে আর্টটা প্রায় প্রত্যেকেরই করতলগত সেটুকুও আমার কখনও আয়ত্ত হয়নি। আমি সে-যুগেও বিশ্বাস করেছি এবং এখনও বিশ্বাস করি যে কার্যসিদ্ধির কৌশল প্রয়োগ করে কেবল "Guinea-pig success"ই হয়। কিন্তু স্থায়ী ফল পাওয়া যায় একমাত্র খাঁটি ঐকান্তিকতা ও স্বাধীনতার মূল্যে। তাই আমার এই সাহিত্য-ক্ষেত্রে আসা ছাড়া আর কোনও গতিও ছিল না। অর্থাৎ নরাধমের যেটা একমাত্র শেষ আশ্রয়-স্থল।

এই সময়ে আমার এক বন্ধু এসে আমাকে খবর দিলে যে আমার একটা কবিতা 'মাসিক-বসুমতী'তে আগামী কোনও সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

আমি হতবাক। আমার অবস্থা দেখে সে ব্যাপারটা স্পষ্ট করে প্রকাশ করলে। আসলে সে তখন বৌবাজারের একটি কলেজে ডাক্তারি পড়তে যেত। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সে দেখেছে একটা বাড়ির দেয়ালে 'বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে'র নাম লেখা একটা নির্দেশ জ্ঞাপক বোর্ড ঝুলছে। সে ছিল আমার কবিতার ভক্ত। তার ওপর তার কাছে আমার অনেক কবিতা গচ্ছিত থাকত। সে তারই মধ্যে একটা কবিতা সম্পাদককে গিয়ে দিয়ে এসেছে।

বললাম—তারপর ?

বন্ধুর কথায় প্রতীত হলো লেখাটি সম্পাদক প্রকাশের যোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন এবং পরের কয়েক মাসের মধ্যেই সেটি প্রকাশিত হবে।

বন্ধু বললে—কিন্তু তোকে একবার সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

—কে সম্পাদক ?

—সরোজনাথ ঘোষ, তোদের পাড়াতেই থাকেন। তিনি বলে দিয়েছেন—বিমলকে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে বোল।

সরোজনাথ ঘোষ আসলে তখন 'মাসিক বসুমতী'র সম্পাদক নন, সহকারী সম্পাদক। বিখ্যাত লেখক, 'শত গল্প গ্রন্থাবলী', 'রূপের মোহ' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি আমাদের পাড়াতে থাকেন, এ-কথা আমার কাছে ছিল একটা আবিস্কারের মতন। মনে আছে দুরু-দুরু বুক নিয়ে একাধারে নিতান্ত আগ্রহ এবং অনিচ্ছার সঙ্গে যখন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম তিনি এক ঘণ্টা ধরে আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। কবিতাটি ছাপার প্রসঙ্গে তিনি ফ্লবেয়ারের কাছে গিয়ে মোপাঁসার লেখা-শেখার কাহিনী বলেছিলেন সবিস্তারে। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে অনেক স্থলে একমত হতে না পারলেও সেদিন তাঁর কাছে আমি অনেক মূল্যবান উপদেশ শুনতে পেয়েছিলাম যা পরবর্তী জীবনে আমার কাজে এসেছিল। তিনি আমাকে গল্প লিখতে বলেছিলেন 'মাসিক বসুমতী'র জন্য। আমি একটা গল্প তাঁকে দিয়েওছিলাম। কিন্তু তিনি সেটা ফেরত দিয়েছিলেন। ছাপেননি। বলেছিলেন—এ ম্লেচ্ছ ভাষায় লেখা, এ চলবে না—

আমি জিজ্ঞেস করলাম—ম্লেচ্ছ ভাষা মানে ?

তিনি বললেন—মানে চলতি ভাষা। বাজারের ভাষা। বাজারের ভাষায় সাহিত্য হয় না। সাধুভাষায় লিখবে। যে ভাষায় বাঙলা দেশের সমস্ত মহাপুরুষরা লিখে গেছেন, সেইটাই আদর্শ ভাষা। এত ছোটবেলা থেকেই যদি তুমি ম্লেচ্ছ ভাষায় লিখতে শুরু করো তা হলে বড় হয়ে লেখায় আর হাত পাকবে না। যেমন আধুনিক গান। আধুনিক গান দিয়েই যদি কেউ সঙ্গীত-সাধনা শুরু করে তাহলে বড় হয়ে কখনও সে কি বড় গায়ক হতে পারে ? বড় সঙ্গীতজ্ঞ হতে গেলে প্রথমে তাকে মার্গ-সঙ্গীত চর্চা করতে হবে। তারপরে আধুনিক গান—

বললাম— কিন্তু আপনাদের কাগজে যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন সে সবই তো চলতি ভাষায় !

সরোজনাথ ঘোষ রেগে গেলেন আমার কথা শুনে। বললেন—আগে ওঁদের মত বড় লেখক হও তখন ওই ভাষাতে লিখলে তোমার লেখাও ছাপবো।

তাঁর কথায় সেদিন সায় দিয়ে চলে এলাম। ঠিকই বলেছিলেন তিনি। আমার তখন সতেরো আঠারো বছর বয়েস। আমি কী-ই বা বুঝি, আর কী-ই বা জানি তখন। তবু আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে যখন কথাগুলো বললেন, তখন মেনে চলবো স্থির করলাম। 'মাসিক বসুমতী'র ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আমার সেই কবিতাটিই আমার প্রথম প্রকাশিত রচনা হিসাবে চিহ্নিত করা চলে।

কিন্তু শুধু কবিতাতে আমার মন ভরছিল না। মন না ভরার কারণ হিসেবে বলা যায় সীমাহীন নিরাকার ব্যাপ্তির মধ্যে আমার মন একটা সাকার রূপকে ধ্যান করতে চাইছিল। সঙ্গীত থেকেও বোধহয় সেই কারণে আমি ধীরে ধীরে গল্প-উপন্যাসের জগতে চলে আসতে চাইছিলাম। কবিতার বা গানের অসীমতার মধ্যে আমি মাঝে-মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম, কিন্তু গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে মনে হতো আমি যেন একটা সসীম ভূখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে অসীমের গভীরতা উপলব্ধি করছি। মনে হতো অবাঙমনসোগোচরের মধ্যে বাস করেও পা রাখবার মত বাস্তব একখণ্ড জমি পেয়েছি। আমার পৃথিবী, আমার সংসার, আমার ভালোবাসা, আমার দুঃখ, আমার লেখা, এই উপলব্ধিটা আমার নিজস্ব মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে যতটা স্পষ্ট হতো, কবিতায় বা গানে ততটা হতো না।

তাই কবিতা লেখা ত্যাগ করলেও একেবারে তা পরিত্যাগ করা গেল না। গান লিখে সেই অভ্যাসটা তখন বজায় রইল বটে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে বেশি পরিমাণেই চলতে লাগলো গল্প লেখা। সাধু ভাষায় গল্প লেখা। আর সেই গল্পগুলো ছাপাবার জন্য উপযাচক হয়ে ডাকযোগে পাঠাতে লাগলাম তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রগুলোর দফতরে। কোনও লেখক, সাহিত্যিক বা সম্পাদকের সঙ্গে তখন আমার চাক্ষুষ অথবা পরোক্ষ কোনও পরিচয়ই নেই। প্রথম প্রথম তা ফেরত আসতে লাগলো, প্রথম প্রথম প্রায় কোনও জবাবই পেতাম না সম্পাদকীয় দফতর থেকে। ধৈর্য পরীক্ষার সেই মাসগুলোর সেই বছরগুলোর দৈর্ঘ্য আমাকে যে কী

অমানুষিক পীড়ন করেছে, তা এখানে স্বীকার না করলে এখন এই বয়েসে সত্যের অপলাপ করা হবে।

সাধারণত কোনও পত্রিকায় লেখা ছাপানোর ব্যাপারে সব লেখকদের সামনে দুটি পন্থা খোলা থাকে। একটি পন্থা হচ্ছে সম্পাদকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে সেই ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে তাঁর পত্রিকায় লেখা ছাপানো। আর দ্বিতীয় পন্থাটি হচ্ছে লেখা ডাকযোগে পাঠানো এবং সম্পাদকের নিরপেক্ষ বিচারে তা ছাপা হওয়া। প্রথম পন্থাটিই সহজ পন্থা। কিন্তু তাতে লেখকের স্বাধীনতা ও বিচারকের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়। তাই আমি নিজে বরাবর দ্বিতীয় পন্থাই অনুসরণ করে এসেছি। একমাত্র ডাকঘরের সুপারিশ ছাড়া আর কারো সুপারিশের সাহায্য আমার ভাগ্যে জোটেনি। কিম্বা সে-সুপারিশ আমি চাইনি।

আর একটা তৃতীয় পন্থাও অবশ্য আছে। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব মিলে দল বেঁধে চাঁদা তুলে একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশ করে তাতে নিজেদের লেখা ছাপানো। তার দ্বারাও বিখ্যাত লেখকদের এবং সম্পাদকদের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসা সম্ভব। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার স্বভাবের মধ্যে দল বাঁধার প্রবণতা না থাকায় সে-পন্থার সুযোগ থেকেও আমি বরাবর বঞ্চিত হয়েছি।

আজ যে এত খুঁটিনাটি কথা বলছি তা আমার নিজের প্রয়োজনে নয়, বলছি তাঁদেরই জন্যে যাঁরা আমার পরবর্তীকালে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হবেন। তাঁদের একটা কথা জেনে রাখা ভালো যে প্রত্যাখ্যান, অপযশ, অবহেলা, নিন্দা বা কুৎসা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ে সংগ্রামেরই নামান্তর। সংসারের অন্যান্য ক্ষেত্রের নিয়ম এই সাহিত্যের ক্ষেত্রে খাটে না। চাকরির ক্ষেত্রে একবার কোনও উপায়ে পাকা ঘুঁটি হয়ে বসতে পারলে তা অবসর নেবার দিনটি পর্যন্ত আর খোয়া যাবার ভয় থাকে না। কোর্ট-কাছারিতে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে খুনের আসামীকেও বেকসুর খালাস করিয়ে আনবার ঘটনা ঘটে থাকে। আবার হঠাৎ লটারিতে টাকা পেয়ে বড়লোক হওয়ার ঘটনাও আকছার ঘটছে। বিশেষ করে আজকাল। কিন্তু সাহিত্যের বাজারে প্রত্যাখান মানেই স্থায়িত্ব, অবহেলা মানেই সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি, নিন্দা-কুৎসা মানেই খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির প্রসার। সাহিত্যের এই স্থায়িত্ব,এই সংগ্রাম-শক্তি, এই খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি অনেক প্রত্যাখ্যান, অনেক অবহেলা, অনেক নিন্দা কুৎসার বিনিময়-মূল্যে কিনতে হয়। এখানে সহজে কিছু পেতে

নেই, সহজে কিছু পেলেই তা সহজেই হারিয়ে যায়। আবার এখানে জীবদ্দশাতে কিছু পেলেও তা নিয়ে অহঙ্কার করবার কিছু নেই। সাধারণত সর্ব-শ্রেণীর কর্মচারীদের পেনশন শেষ হয় মৃত্যুর দিনটিতে, কিন্তু সাহিত্যিকের পেনশন শুরুই হয় মৃত্যুর পর দিন থেকে। আর মৃত্যুর আগে সাহিত্যিক যা পেয়ে থাকেন তা মাত্র খোরাকি। কর্মচারীদের খাজাঞ্চিখানার ভাষায় যার ইংরাজী নাম টি-এ ডি-এ। এই খোরাকিটুকুই সাহিত্যিকের জীবন-ধারণের পক্ষে যথেষ্ট। এই কথাগুলি আমাদের দেশের বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রই শুধু নন, বিদেশী যে-কোনও মহৎ সাহিত্যিকদের বেলাতেও প্রযোজ্য। নিন্দা, অবহেলা, কুৎসা, প্রত্যাখ্যান তাঁদের সংগ্রামকে বরং তীব্রতর করেছে, তাঁদের খ্যাতি প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তিকে বরং করেছে দৃঢ়মূল।

একদিকে আমার এই সংগ্রাম যখন চলছে তখন আমার জন্যে আমার ভবিষ্যতের ভাবনায় আমার গুরুজনদের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। অর্থের প্রয়োজন তখন আমার ছিল বটে, কিন্তু তা কখনও দুশ্চিন্তায় রূপান্তরিত হয়নি। আমাদের পারিবারিক অবস্থা কোনদিনই অসচ্ছল ছিল না। কিন্তু তার ওপর আমারও ছিল অনির্দিষ্ট হলেও কিছু নিজস্ব উপার্জন। অর্থ আমার জীবনে কখনও সমস্যা হয়ে উদয় হয়নি। তখন সেই কুড়ি-একুশ বছর বয়েসে গান লিখে যে অর্থ উপার্জন করি তা নিজেকে অধঃপাতে পাঠাবার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। সামান্য কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনে, ওটা গল্প লিখেই উঠে আসে। 'প্রবাসী' বা 'ভারতবর্ষে' গল্প লিখে যা পাই তাতে সারা বছরের কলেজের মাইনেটা সহজেই কুলিয়ে যায়। বাকি থাকে বিলাসিতা। সেটা পুষিয়ে নিই গান লিখে। তাতে চপ-কাটলেট-চা আর ট্রাম-বাস ভাড়া বেশ অক্লেশেই উঠে আসে।

এমনি সময়ে নিজেকে একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলাম। সাহিত্য-চর্চার মধ্যে হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কারের আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। মানুষের জীবনে নিজেকে আবিষ্কারের লগ্ন যখন আসে তখন বোধহয় এমনি করে হঠাৎই আসে। আমাকে নিয়ে আমার গুরুজনদের বরাবরই দুর্ভাবনা ছিল তা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। আমি ছাত্র-জীবনেই নিজের জন্যে এমন একটা রাস্তা বেছে নিয়েছিলাম যার কোনও অর্থকরী কার্যকারিতা ছিল না। শুধু আই-এ, বি-এ আর এম-এ পড়লে তো অর্থকরী কোনও পারদর্শিতা হয় না। ডিগ্রীলাভ করে একমাত্র স্কুলের বা কলেজের মাস্টারি ছাড়া আর কোনও রাস্তা তাদের জন্যে তখন খোলা

থাকতো না। সুতরাং তাঁদের চোখে আমার ভবিষ্যৎ তখন অন্ধকার। তার ওপর ছেলে কী করে, না সাহিত্য করে আর গান গায়। অর্থাৎ যে-দুটো কাজ একজন অপদার্থ যুবককে অপদার্থতর করতে যথেষ্ট। তাই আমাকে নিয়ে তাঁদের যথেষ্ট দুশ্চিন্তা থাকলেও আমার কাছে কিন্তু তখন আমার নিজের একটা ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। ছোটবেলা থেকে যে স্বপ্ন দেখে এসেছি সে স্বপ্ন তখন আরো বাস্তবে পরিণত হয়েছে। অপরিচিত লোকেদের কাছ থেকে মৃদু বাহবা আসছে আর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সোজা বাড়িতে না গিয়ে সোজা চলে যাই অক্রুর দত্ত লেনে। সেখানে চণ্ডীবাবুর রেকর্ডিং কোম্পানীর গানের আড্ডা। সেখানে গিয়ে বসি। সেখানে তখন সায়গল, রামকিষেণ মিশ্র, নিতাই মতিলাল, শচীন দেববর্মণ, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশারদ স্ফীতদেহ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, বেহালা-বাদক ভোম্বলদা, অনিল বাগচী, প্রফুল্ল মিত্র, সজনী মতিলাল, অনিল বিশ্বাস, পান্না ঘোষ আর প্রশান্ত মহলানবিশের ভাই বুলা মহলানবিশের সঙ্গে মিশে সঙ্গীতের জগতের সঙ্গে একাকার হয়ে যাই। ওঁদের কারোরই তখন অত দেশ-জোড়া খ্যাতি হয়নি। সবাই তখন উদীয়মান। অনুপম ঘটক আমার বন্ধু। তার সুবাদেই আমি সেখানে একটা বাঁধা আসন পেয়েছি। তাদের মত গান গাওয়া তখন পেশা না হলেও, গান আমি লিখি। সেটাও গানের রেকর্ডের কারবারের একটা অঙ্গীভূত কাজ বিশেষ। সুতরাং সেখানে আমার পাকা আসন গায়কদের মধ্যে।

আমি সেখানে গান শুনি আর সেই গানের সুরের মধ্যে আত্মসমর্পণ করি, আত্ম-অবগাহন করি। সুর যে সত্যিই ব্রহ্ম তা উপলব্ধি করি। আর সে তো ঠিক ঠিক টিকিট কেটে সঙ্গীত সম্মেলনের গান শোনা নয়, এমন কি লুঙ্গি পরে সিগারেট খেতে খেতে রেডিওর সামনে বসে রাগ-সঙ্গীত শোনাও নয়। সে একেবারে সঙ্গীতের কারবারের শরিক হওয়া। সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। রামকেলিতে কোন পর্দা লাগলে সুরের কী ক্ষতি বৃদ্ধি হয়, ভেঁরোর সঙ্গে ভৈরবীর মূলগত কী তফাৎ, দরবারি-কানাড়াতে উদারার কোমল নিখাদটাতে এসে কতখানি দাঁড়ালে সুরের কতটা মাধুর্য বাড়ে তারই নমুনা দেখে চমকে উঠি। তারপরে ছিল খেয়াল আর ঠুংরি। খেয়ালের তান-বিস্তার আর লয়কারি আর ঠুংরির তান-বিস্তারে আইন ভেঙে বে-পর্দায় পৌঁছে আবার বাঁধা রাস্তায় ফিরে আসার কসরৎ কায়দা দেখে মনের মধ্যে সাহিত্যের নতুন আঙ্গিকের আভাস পেতাম। মনে হতো ক্লাসিক উপন্যাস আর ঠুংরির গঠন-কৌশলের

মধ্যে যেন আপাত কোন তফাৎ নেই। এ তো আমাদের সেই উপন্যাসেরই টেকনিক। দু-পা এগিয়ে এক-পা পেছোন। সুরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে কখনও ভেঙে পড়া, আবার তখনি উঠে দাঁড়ানো। উঠতে উঠতে আবার লুপ লাইনে চলে গিয়ে তান-বিস্তার করে তাল-লয় ঠিক রেখে সহজ-সাবলীল গতিতে সমে এসে পড়া। ঠিক টলস্টয় যেমন আঙ্গিকে লিখেছেন তাঁর **'War And Peace,'** বা রমাঁ রঁল্যা লিখেছেন তাঁর **"Jean christophe"** অথবা ডিকেন্স লিখেছেন তাঁর **"A Tale of Two Cities."**

এই সময়ে দুজন বিখ্যাত ওস্তাদ এলেন কলকাতায়। একজন ঠুংরি বিশারদ ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ আর দ্বিতীয়জন ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব। আমরা সদলবলে ওস্তাদ আবদুল করিমের গান শুনতে গেলাম ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে। গান গাইতে লাগলেন ওস্তাদজী। খুব মিষ্টি-মিহি গলা আবার তার আওয়াজটা 'ঝিম্,। আরম্ভের আগে একটু আলাপ করে নিলেন, তারপর গান। 'যমুনা কী তীর' (ভৈরবী) মন্দর বাজে (শুদ্ধ কল্যাণ) প্যারা নজর নেহি (বিলাবল) পিয়া মিলন কি আশ (যোগিয়া) এবং আরো কত কী! 'যমুনা কী তীর' গানটার কটাই বা কথা। গানটা হলো—

'যমুনা কে তীর
গোকুল ঢুঁড়ি বিন্দাবন ঢুঁড়ি
কোন্ ক্যায়সে লাগে তীর'

এই হলো পুরো গানটার কথা। কিন্তু এই সামান্য তিন লাইনের গানটা নিয়ে তবলায় আট মাত্রা যৎ-এর ঠেকার সঙ্গে তাল রেখে তিনি কী অলৌকিক কাণ্ডটাই না করলেন সেদিন। তিন ঘণ্টা ধরে তাঁর সে কী কসরৎ। একই কথা হাজার বার উচ্চারণ করা, একই পর্দায় বার-বার ঘুরে আসা, কথাগুলো দুমড়ে মুচড়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ভৈরবী রাগের সমস্ত রসটুকু নিঙড়ে নিঃশেষ করে আমাদের সকলকে এক শাশ্বত ধ্রুবের দিকে এক বৈরাগ্যের দিকে নিয়ে গেলেন। আর আমরা সেই ধ্রুবের সেই বৈরাগ্যের স্পর্শ পেয়ে পরিশুদ্ধ হলাম পবিত্র হলাম। গান গাইতে লাগলেন ওস্তাদজী আর আমি নিজেকে আবিষ্কার করতে লাগলাম। মনে হলো এ গান নয়, এ যেন কোনও এপিক উপন্যাস পড়ছি। পড়তে পড়তে মুহূর্ত, দিন, মাস, বছর কেটে যাচ্ছে। হাজার, দু'হাজার, তিন হাজার পাতার বই। মনে হচ্ছে চলুক, আরো চলুক। এই ভালো লাগা যেন থেমে না যায়।

মূল গল্পকে পাশ কাটিয়ে লেখক যেমন ছোট একটা চরিত্র নিয়ে অন্য প্রসঙ্গ শোনান, আবার কখন নিঃশব্দে ফিরে এসে মেশেন মূল কাহিনীর স্রোতে, খাঁ সাহেবও তেমনি একটা মূল সুরকে মুচড়ে বেঁকিয়ে পাশ কাটিয়ে তাকে কোথায় বিপথে নিয়ে চলে যান, আবার ঠিক সময় মত ফিরে আসেন মূল সুরে। একবার ভয় হয় এই বুঝি গেল গেল, এই বুঝি গোলমাল হয়ে গেল হিসেব, কিন্তু না, কী অবলীলায় সব বিপদের জাল কেটে নিরাপদে নির্বিঘ্নে এসে সমে থামেন, আর আমাদের শ্রোতাদের আসন থেকে তারিফের 'হায়' 'হায়' রব ওঠে। আমরা স্বস্তি পাই, আরাম পাই, আমরা নিশ্চিন্তের হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। আর আমাদের সবাই যখন এক মনে গান শুনছে, গান শুনে মুগ্ধ হচ্ছে, আমি তখন শিখছি। গানের আঙ্গিক শিখছি না, শিখছি উপন্যাস লেখার টেকনিক। এতদিন পৃথিবীর বড় বড় এপিক উপন্যাস পড়েই এসেছি। রুদ্ধশ্বাস গতিতে হাজারি-হাজার পাতার বই দিনের পর দিন রাতের পর রাত গল্পের জালে জড়িয়ে গিয়ে হাবুডুবু খেয়েছি। যখন সে-সব বই শেষ হয়েছে ভেবেছি যেন সে বই আরো বড়ো হলে ভালো হতো। কিন্তু তখন সেই সব বড় বড় লেখক-দের গল্প বলার কৌশলের দিকে নজর পড়েনি, পাঠককে মুগ্ধ করার জাদুটা কোথায় তা আবিষ্কারের চেষ্টা করার দিকে মন যায়নি। এবার মন গেল সেদিকে। এবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শিক্ষার্থীর মত করে গান শুনে বুঝতে পারলাম কোথায় সেই জাদু; কোথায় সেই রহস্য। বুঝতে পারলাম গ্রহণ আর বর্জনের সমন্বয়ই সব শিল্পের মূল কথা। তা সে গানই হোক আর সাহিত্যই হোক। মূল কথাটা হলো কোন্‌টা কতখানি কখন বলতে হবে না আর কোন্‌টা কতখানি বলতে হবে। এই বলা আর না-বলার ওজনটা যদি ঠিক থাকে তাহলে যে-কোনও কাহিনী যত লম্বা করেই বলি না কেন তা পাঠকদের শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারবে। তাহলেই পাঠককে আমি তার কাজ ভোলাতে পারবো, তাকে ট্রেন ফেল করাবো, তার ক্ষিধে, ঘুম, রোগযন্ত্রণা সব কিছু দূর করবো। আর সেই ফাঁকে আমি তাকে ইন্দ্রিয়-জগতের ঊর্ধ্বে উঠিয়ে অতীন্দ্রিয়-লোকে পেঁছে দিতে পারবো। আমি অন্যের লেখা উপন্যাস পড়ে যে অমৃত-অনুভূতি পেয়েছি তাকেও আমি সেই অনুভূতির অপার্থিব আস্বাদ দিতে পারবো!

কথাগুলো যত সহজ করে সংক্ষেপে বললাম, জিনিসটা কিন্তু আমার কাছে তখন অত সহজ ছিল না। আর আজ এতদিনেও যে ঠিক-ঠিক জিনিসটা বুঝেছি তাও বলতে পারবো না। কারণ এ তো গাণিতিক সত্য

নয়, রসের সত্য। রসের সত্যকে কখনও ছক-বাঁধা পথের দুই সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। রাখলে তা আর তখন রস থাকে না, তা তখন গণিতে পরিণত হয়।

তা ওস্তাদজীর গানের রেশ নিয়ে যখন সুরের সমুদ্রে পূর্ণ অবগাহন করছি ঠিক সেই একই সময়ে কলকাতায় এসে হাজির হলেন আর এক ওস্তাদজী। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব। হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীতে তাঁর গান রেকর্ড করা হলো। সেই সূত্রে সকলের অনুরোধে তিনি তাঁর গান শোনালেন একদিন "ঝন ঝন ঝন ঝন পায়েল বাজে" (নট বেহাগ)। এ আবার অন্যরকম। আবদুল করিম খাঁ সাহেবের মত মিহি মিষ্টি 'ঝিম' গলা নয়, উদাত্ত, গম্ভীর, জোয়ারিদার কণ্ঠ। বাঙলা ভাষায় বাঁজখাঁই শব্দটা ব্যবহার করলে নিন্দেসূচক শোনালেও সেই বাঁজখাঁই গলার আওয়াজও কেন যে কর্কশ শোনালো না তাই আশ্চর্য। তার একমাত্র কারণ ওস্তাদজীর গলার অসাধারণ জোয়ারি। এই জোয়ারির জন্যেই অত মিষ্টি লাগলো তাঁর আলাপচারি। বিশেষ করে তাঁর বোল্‌-তানের ছন্দ-ভাগ। এরও একটা অন্য ধরনের সৌন্দর্য আছে। অনেকটা সুবোধ ঘোষের 'ভারত-প্রেম-কথা'র ভাষা-গাম্ভীর্য। কর্কশ হয়েও জোয়ারিদার। তবে বিশেষ করে মনে পড়তে লাগলো রাশিয়ার অ্যালেক্সি টলস্টয়ের 'ফ্রেড্‌রিক দ্য গ্রেট' উপন্যাসের ভাষার সাদৃশ্যের কথা। বিষয়বস্তুর সঙ্গে বহিরঙ্গের যে একটা সামঞ্জস্য থাকা দরকার সেইটেই ফৈয়াজ খাঁ সাহেব যেন আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

আর আজকে এখানে অকপটভাবে স্বীকারোক্তি করতে গৌরব বোধ করছি যে সেদিন সেই দুই ওস্তাদজীর গান শুনতে শুনতে দুজনকেই আমি আমার সাহিত্য-জীবনের গুরু বলে মনে মনে বরণ করে নিলাম। তাঁদের কাছেই আমি সাহিত্যের নাড়া বাঁধলাম। আজ কিছু কিছু অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠক আমার লেখার মধ্যে repetition বা পুনরাবৃত্তিকতা এবং পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গল্প বলার যে-অভিযোগে আমাকে অভিযুক্ত করেন এ বিদ্যার কারুকার্য ও ব্যাকরণ অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টায় আমি তাঁদের কাছ থেকেই আয়ত্ত করবার তালিম নিয়েছি। মানুষের জীবন যেমন সোজা পথে চলতে অস্বীকার করে, ভারতীয় রাগসঙ্গীত এবং এপিক উপন্যাসও ঠিক তাই। জীবন-ক্ষেত্র তো সমতল-ভূমি নয়, চড়াই-উৎরাইে চলা-ফেরার নিয়মে সে বিচরণ করে বলেই তাকে পরিক্রমা করতে হয় ঘুর্ত পথে। অনেক সময় ঘুর-পথ ঘুরে এসে আবার শুরুর সঙ্গে সাক্ষা

তবে তার ভুল ভাঙে। তখন আবার সামনে এগিয়ে গিয়ে পরের পর্দায় দাঁড়িয়ে সে খানিকটা জিরিয়ে নেয়। কিন্তু এই চলার পথে একটা কথা শিল্পীকে সব সময়ে মনে রাখতে হয় যে তার গন্তব্য-বিন্দুতে পোঁছোবার দিকেই যেন তার লক্ষ্য স্থির থাকে। অবশ্য শিল্পীকে নিজেই অত্যন্ত জটিল বিপদ-জাল সৃষ্টি করতে হবে আবার তাকে নিজেকেই বিপদ-জাল কাটাবার মারণাস্ত্র আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু এই বিপদের সৃষ্টি এবং সংহারের সমন্বয় যত সুষ্ঠু এবং ওজন যত নিখুঁত হবে ততই শিল্পীর কদর, ততই শিল্পীর সাফল্য। কিন্তু এই সব কিছুর ওপরেও হলো 'সম্' বা ক্লাইমেক্স। আর সে এমন এক ক্লাইমেক্স যার ইঙ্গিত থাকবে সেই ধ্রুবের দিকে, বৈরাগ্যের দিকে, যা চিত্তকে বিশুদ্ধ করবে, প্রাণকে করবে পবিত্র।

প্রথম জীবনে এপিক উপন্যাস পড়েছিলাম, কিন্তু পড়লেই তো তার মানে বোঝা যায় না। মানে বোঝা গেল এই দুই ওস্তাদজীর গান শুনে। বলতে গেলে তাঁরাই প্রথম আমার চোখ খুলে দিলেন।

কিন্তু এ-সব জেনেও রাতারাতি আমার কিছু নগদ লাভ হলো না। এ তো শুধু টেকনিক বা আঙ্গিক। কলা-কৌশল। কিন্তু বিষয়-বস্তু কোথায় পাই ? অর্থাৎ কী নিয়ে লিখবো ?

নিঃসঙ্গতার অনেক পীড়ন আছে। একা-একা থাকবার যন্ত্রণা তারাই বোঝে যারা একা-একা থাকে। অসংখ্য সঙ্গীর দ্বারা পরিবৃত থেকেও যে এক ধরনের একাকিত্ব বা এক ধরনের নিঃসঙ্গতা তা আমাকে মাঝে-মাঝে বিকল করে দিত। কিন্তু সব জিনিসেরই যেমন একটা উপকারিতা আছে, নিঃসঙ্গতারও তেমনি একটা ভালো দিক আছে। সেটা হচ্ছে এই যে নিঃসঙ্গতা মানুষকে ভাবায় বা ডিসটার্ব করে। চারপাশের পৃথিবী তাকে খুশী করে না। সে এর সংস্কার চায়, সে এর পরিবর্তন চায়। এই সংসারকে সে নতুন চেহারায় দেখতে চায়। যে মানুষগুলো তার চারপাশে ঘোরাঘুরি করে তাদের দোষ-ত্রুটি তার নজরে পড়ে। মনে হয় এরা যেন অন্য রকম হলে ভালো হতো। সে ভাবে কিসে মানুষ সুখী হয়, কিসে মানুষের সমাজ, মানুষের রাষ্ট্র, প্রত্যেকটি মানুষের চরিত্র আরো সুশৃঙ্খল হয়। যদি তার নিজের ইচ্ছেমত মানুষ বা সমাজ বা রাষ্ট্র না থাকে তখন সে বিদ্রোহ করে, নয়তো সে আরো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে।

আমার কিন্তু তখন বিদ্রোহ করবার ক্ষমতা ছিল না। তাই আমার স্বভাব আমাকে আরো নিঃসঙ্গ করে তুললো! একটা মনোমত বিষয়বস্তুও

পাইনে যে তাই নিয়ে একাগ্র চিন্তা করি। বিষয়বস্তুর সন্ধানে সারা কলকাতা তোলপাড় করে বেড়াই। বিদ্যাসাগর কলেজে বি-এ পড়বার সময় একদিন হঠাৎ নাটকীয়ভাবে একজন ছাত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেল। আমার চেয়ে এক ক্লাশ ওপরের ছাত্র সে। শঙ্কর ঘোষ লেনের মুখে বাস থেকে নেমেই মুখোমুখি হওয়া।

সামনে এসে ছাত্রটি বললে—আজকে একবার আমাদের বাড়ি আসবেন ?

আমি তো অবাক ! মুগার একটা পাট-ভাঙা সোনালী সার্ট, মিনে করা হীরের বোতাম। জরিপাড় চুনোট করা ধুতি। পায়ে হরিণের চামড়ার পাম্পসু ! আর বেশ থল্‌থলে মোটা শরীর, তার ওপর দুধে-আলতায় মেশানো গায়ের রং। অর্থাৎ আমার পরিচিত জগতের মানুষ-গুলো থেকে একেবারে আলাদা।

বললাম—আপনাদের বাড়ি কোথায় ?

সে বললে—এই পাশেই, তেরো নম্বর কর্ন্‌ওয়ালিশ স্ট্রীটে। আমি ফোর্থইয়ারে পড়ি। আমার নাম সতু। সতু লাহা—

আসলে সতুর পুরো নাম ছিল সতীন্দ্রনাথ। ঠিক বিদ্যাসাগর কলেজের পেছনের লাল বাড়িটায় থাকতো। আমাকে সেদিন তাদের বাড়িতে নিয়ে যাবার ইচ্ছের পেছনে একটা ঘটনা ছিল। সেই ঘটনাটা এখানে বলা দরকার। বলা দরকার এই জন্যে যে আমার ভাবী লেখক-জীবনের এবং আমার সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে এই বাড়িটার একটা অত্যন্ত নিবিড় যোগসূত্র আছে। আগের দিন বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র-ইউনিয়নের সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম কী একটা বিভাগে। তার সঙ্গে একটা সোনার মেডেলের প্রতিশ্রুতি ছিল। তা ব্যাপারটা ছিল অনেকটা 'বন-দেশে শেয়াল রাজা'র মত। কিছু সহপাঠী যারা আমার গানের নেশার কথা জানতো, তারা ধরে-বেঁধে আমার অজ্ঞাতেই আমার নামটা প্রতিযোগীদের তালিকায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আর শেষকালে যা-হয়, নাচতে নেমে ঘোমটা টানার কী দরকার বলে আমিও ভগবানের নাম করে আসরে নেমে পড়েছিলাম। বিচারক ছিল আমার বন্ধু অনিল বাগচী আর ছিলেন ওস্তাদ রামকিষেণ মিশ্র। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিচারক ঘনিষ্ঠ বন্ধুস্থানীয় হলে যেমন শুধু স্বদেশীয় পুরস্কার কেন বিদেশী নোবেল-পুরস্কারও পাওয়া যায়, এ-ক্ষেত্রেও তাই-ই হয়েছিল। কিন্তু সেটা যে এমন সুদূর ফলপ্রসূ হবে তা আমি সেদিন কল্পনাও করতে

পারিনি। সুদূর ফলপ্রসূ এই কারণে বলছি যে আমার বিদ্যাসাগর কলেজে পড়তে যাওয়া, সেখানে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া এবং ওই তেরো নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়িটায় যাওয়া—এ সমস্ত কিছুই আমার সাহিত্য-জীবনের সোপান বললে কিছু অতিশয়োক্তি করা হবে না।

সতু লাহা এমন এক পরিবারের বংশধর যে-বংশ ছিল ব্রিটিশ শাসনের সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অন্যতম পুরনো শরিক। চারিদিকে ঘেরাটোপ-ঢাকা অন্দর-মহল, চক্‌মিলান বার-বাড়িতে পুজোর দালান। গেটে ঢুকতে দরোয়ান, ঘোড়ার গাড়ির আস্তাবলের সমারোহ, আর তার সঙ্গে অনুপার্জিত অর্থকৌলিন্যের অলস কার্পণ্য মিশ্রিত বিলাস-ব্যসন। শুধু ওদের বাড়িটাই নয়। উত্তর কলকাতার লাল-রংয়ের সমস্ত পুরনো অভিজাত বাড়িগুলোরই ওই এক ইতিহাস।

মনে আছে প্রথম দিনের আমার সেই বাড়ির ভেতর প্রবেশ শুধু যে ওদের বাড়ির ভেতরে পদক্ষেপ তাই-ই নয়, প্রাচীন ইতিহাসের রক্ষণশীল অন্দর-মহলে পদক্ষেপের মতই রোমাঞ্চকর। পুরনো ইঁটের মোটা-মোটা দেওয়াল, কাঠের সিঁড়ি। সেই কর্তাবাবুদের শুচিবায়ুগ্রস্ত-স্বভাবের চিহ্ন-সম্বলিত মার্বেল-পাথরের মেঝের পরিচ্ছন্নতা আর দোতলায় উঠে তাকিয়া ছড়ানো ফরাস সজ্জিত নাচঘর। সমস্তই যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ আমলের মুৎসুদ্দি-বেনিয়ানদের লুপ্তাবশেষ। ইতিহাসে পড়া ঐশ্বর্যের কল্প-প্রতিমা। আর আমি তখন বিদ্যাসাগর কলেজের থার্ড-ইয়ারের একজন অখ্যাত মধ্যবিত্ত ছাত্রই কেবল নয়, বিংশ-শতাব্দীর অনু-সন্ধানী গবেষকও বটে। সেখানে ঢুকে আমার প্রথম যে প্রশ্নটা মাথায় উদয় হলো সেটা হচ্ছে—এরা কারা? ইতিহাসের কোন্ শতাব্দীর গহ্বরে এদের মূল? আমাদের জীবন-যাত্রা প্রণালীর সঙ্গে এদের জীবন-যাত্রা প্রণালীর এত তফাৎ কেন?

ঘরে ঢুকে দেখি কলেজের বাঙলার অধ্যাপক ৺পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস ফরাসের ওপর বসে আছেন। আমাকে দেখে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন—তোমার গান শুনে কালকে আমার খুব ভালো লেগেছিল তাই তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে সতুকে দিয়ে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। যে বিমল মিত্রের লেখাটেখা পড়ি, তুমিই কি সেই?

তারপর বললেন—তুমি আর একটা গান গাও, আবার শুনি—

আমি সবিনয়ে বললাম—আমার গান হবে না স্যার—

—কেন ? পূর্ণবাবু আমার কথায় বিশ্বাস করলেন না। বললেন—নিশ্চয়ই হবে। অন্য সকলের গান শুনতে শুনতে কাল আমার ঘুম আসছিল, এমন সময় তোমার গান শুরু হতেই আমি জেগে উঠলুম—

সতু বললে—ওর স্যার রেকর্ডে একটা গান আছে—

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বললাম—সে কিছু না স্যার, সে রেকর্ড মোটে বিক্রিই হয়নি।

পূর্ণবাবু বললেন—তাতে কী হয়েছে, এখন তোমার বয়েস কম, এখনই এত হতাশ হচ্ছো কেন ?

বয়েসের স্বল্পতার সঙ্গে যে যোগ্যতার কোনও সম্পর্ক নেই এ-কথা এখনও যেমন কেউ বুঝতে চায় না, তখনও তেমনি কেউ বুঝতে চাইত না। মনে আছে 'প্রবাসী' পত্রিকার অফিসে যখন গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে দাঁড়াতাম তখন তিনিও বিশ্বাস করতেন না। প্রত্যেকবারই ভুল করতেন। জিজ্ঞেস করতেন—কার লেখা ? তোমার দাদার ?

তারপর যখন শুনতেন আমি নিজেই প্রকাশিত লেখার লেখক তখন গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর করতেন, একটা প্যাড্ টেনে নিয়ে তাতে গল্পের নাম, পাতার সংখ্যা লিখে নিজের নাম সই করে দিতেন। আমি সেইটে নিয়ে একতলায় কেদার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে যেতাম। তিনি সেটা দেখেই আমাকে টাকা দিয়ে দিতেন। দক্ষিণার রেট ছিল পৃষ্ঠা-প্রতি তিন টাকা। প্রকাশিত প্রত্যেক রচনার জন্যে দক্ষিণা দেওয়ার নিয়ম বোধহয় প্রথম সূত্রপাত করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। আর গল্প মনোনীত করতেন তাঁর দুই কন্যা সীতা দেবী এবং শান্তা দেবী। সেই কারণেই মনোনয়নের ব্যাপারে 'প্রবাসী'তে কোনও রাজনীতি বা দলনীতি বা কোনও রকম দুর্নীতিই প্রশ্রয় পাবার অবকাশ ঘটতো না।

একদিকে এই লেখা আর অন্য দিকে অক্রুর দত্ত লেনের সঙ্গীতের আড্ডা, আর কলেজের বি-এ ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে সতু লাহাদের বাড়ির গল্প শোনা। সে ঠিক গল্প নয়তো, যেন ইতিহাস-পরিক্রমা। মোগল আমল অতিক্রম করে পশ্চিম থেকে যন্ত্রযুগের বাণিজ্য-বিধাতা তখন ভারতবর্ষের মসনদে বসে শাসন কার্য শুরু করেছে। এখান থেকে তাদের কাঁচা মাল চাই। সেই কাঁচা মাল কিনে পাঠাতে হবে ম্যানচেস্টারে, বার্মিংহামে বা ডানকার্কে। পাঠাতে হবে নীল, সোরা, পাট, তিসি, তামাক, তুলো আর আরো অনেক কিছু। সেই সব কাঁচা মাল দিয়ে

নিত্য-ব্যবহার্য জিনিস তৈরি হবে। তারপর তা আবার আফ্রিকা-এশিয়ার বাজারে ভোগ্য-পণ্য হিসেবে চড়া দামে বিক্রি করে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করতে হবে। তার জন্যে এজেণ্ট চাই, দালাল চাই। কিন্তু দালালি করবে কে? তখন এল এই শীল, শেঠ, মল্লিক, লাহা বংশের পূর্ব-পুরুষরা। রাতারাতি দালালির মোটা কমিশনে তারা ফুলে-ফেঁপে স্ফীতকায় হয়ে উঠলো। অর্থ কৌলিন্যের মুকুট পরে সমাজের মাথায় উঠে বসলো। আর ওই যে দেখছো আমাদের এই তেরো নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়ির উল্টোদিকে গোল-গোল থামওয়ালা বাড়িটা, ওইটে হলো সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজের মন্দির। সতুর কথা শুনে মনে হতো দুদিকের দুটো বাড়ি যেন একই সঙ্গে গজিয়ে উঠেছে—একটা ব্রিটিশ-সামন্ত যুগের শোষণ-শাসনের পাকা-পোক্ত ভিত্ আর একটা ঠিক বিপরীত, সামন্ততন্ত্রের মূলের ওপর প্রথম বিদ্রোহ, প্রথম বজ্রাঘাত রামমোহন রায়ের প্রতীক। যীশুখ্রীষ্ট নিজে যেমন খ্রীষ্টান ছিলেন না কিন্তু ছিলেন খ্রীষ্ট ধর্মের উৎস, রামমোহন রায়ও তেমনি নিজে ব্রাহ্ম ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক। সংস্কার-মুক্তির প্রথম উপাসক।

এই একই কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের রাস্তার মুখোমুখি দুটো বিপরীত-ধর্মী বাড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের তুচ্ছ মধ্যবিত্ত ছাত্রের মনে অন্য এক যুগের প্রতিধ্বনি তুলতো। সে ছাত্রটি আর কেউ নয়—সে আমি। যে-আমি উনিশ বছর পরে "ভূতনাথ" হয়ে জন্ম নিয়েছিল।

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

শিল্পীর জীবনে একটা সময় আসে যখন যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে যন্ত্রণাটা আর তখন যন্ত্রণা থাকে না। যন্ত্রণার প্রলেপ পড়ে পড়ে তার অনুভূতি-শক্তিটা ভোঁতা হয়ে যায়। কিম্বা যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে উঠে সেটা অন্য আর-এক রূপ গ্রহণ করে। তার নাম আনন্দ। অনুভূতির জগতেও একটা স্তর থাকে যেখানে পেঁাছলে চরম যন্ত্রণা এবং চরম আনন্দ একই রূপ পরিগ্রহ করে। তখন আর দু'টোর মধ্যে কোনও তফাৎ থাকে না। যন্ত্রণা থেকে যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে ওঠবার এই যে প্রক্রিয়া, উনিশ বছর সময়ের পরিধি এই প্রক্রিয়ার পক্ষে এমন কিছুই দীর্ঘ নয়। কিন্তু আমার পক্ষে তা যেন ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। যন্ত্রণার নয়, সে আনন্দের অসহনীয়তা। ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ আর ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কাছ থেকে আঙ্গিকের মোটামুটি একটা কাঠামো আগেই পাওয়া গিয়েছিল। তারপর বিষয়-

বস্তুরও একটা পটভূমিকা পাওয়া গিয়েছিল তেরো নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের আবহাওয়া থেকে। কিন্তু লিখতে গিয়ে ভয় করতে লাগলো। মনে হলো যেন আরো কিছু মালমশলার অভাব হচ্ছে, আরো কিছু কাঠ-খড়। সেই ব্রিটিশ-আমলে রাস্তায়-বাড়িতে কী আলো জ্বলতো, ট্রাম-বাসের বদলে যান-বাহন কী-রকম ছিল। এই সব। 'আনন্দবাজারে'র মন্মথ সান্ন্যাল মশাইকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন—রাসসুন্দরী দাসীর লেখা 'আমার জীবন', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত', 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পড়ুন। কিম্বা প্রমথনাথ মল্লিকের 'কলিকাতার কথা' পড়ুন—তিনি আরো অনেক বইএর নাম বললেন।

যখন এইরকম ছটফট করে মরি তখন সন্ধ্যেবেলা অক্রূর দত্ত লেনের আড্ডায় এসে বসি। অনুপম ঘটক আর প্রফুল্ল মিত্রকে নিয়ে রাত দেড়টা দুটো পর্যন্ত কার্জন পার্কের ঘাসের ওপর আজে-বাজে গল্প করে সময়টা কাটিয়ে দিই। প্রফুল্ল মিত্র খুব রসিক মানুষ। হিন্দুস্থানের সমস্ত স্টুডিওটা প্রফুল্ল বলতে অজ্ঞান। এদিকে নিজে ভালো মুভি-ক্যামেরাম্যান, আবার চন্ডীবাবুর রেফ্রিজারেটার খারাপ হয়ে গেলে তাও সারিয়ে দেয়। আবার কখনও পিয়ানো নিয়ে বসে পড়ে, আবার 'নূপুর বেজে যায় রিনি ঝিনি' গান রেকর্ড করে। রেকর্ড করে 'বন্ধু হে চলো চলো—'

একদিন আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরছি। তখন শেষ রাত, আড্ডা দিতে দিতে কখন রাত কাবার হয়ে গিয়েছিল টের পাইনি। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি ভোর পাঁচটা। আমিও বাড়ি ঢুকছি, আর ওদিকে বাবাও প্রাতঃভ্রমণের পোশাক পরে বেড়াতে বেরোচ্ছেন। মুখোমুখি আমাকে দেখে তিনি চমকে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন—এখন ফিরছো নাকি ?

শুধু বললাম—হ্যাঁ—

বলে মাথা নিচু করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লাম। পেছনে বাবার বলা দ্বিতীয় প্রশ্নটাও কানে এল—এত রাত্তির পর্যন্ত কোথায় থাকো ?

এ-প্রশ্নের আর জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না। সোজা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেলাম। কিন্তু ঘুম আসে না। আমি জানতুম আমার জন্যে বারান্দার টেবিলে একটা থালায় খানকয়েক রুটি, একটু তরকারি আর মাছ, আর তার সঙ্গে এক বাটি দুধ বেড়ালে খাওয়ার ভয়ে ভারি ঢাক্না দিয়ে ঢাকা আছে। আস্তে আস্তে সেগুলো পাশের প্রতিবেশীর বাড়ির একতলার খোলা ছাদে ছুঁড়ে ফেলে দিই।

তারপরে নিশ্চিন্ত হয়ে খাটের ওপর শরীরটা এলিয়ে দিই। আমি জানি ওই খাবারগুলো মানুষের নিদ্রাভঙ্গের আগে অন্ধকার একটু পাতলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাক এসে সব নিশ্চিহ্ন করে দেবে, আর সংসারের মানুষ ভাববে আমি পেট ভরে সব খেয়েছি। খেয়ে নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা দিচ্ছি।

এই রকম প্রায় প্রতিদিন। আজ যদি আমায় কেউ জিজ্ঞেস করে—এরকম আচরণ কেন করতে তুমি? স্বাভাবিক হতে পারতে না কেন? আর পাঁচজন মানুষ যেমন করে সংসারে আচার-আচরণ করে তেমনি সহজ-সাবলীল হতে পারতে না কেন? তাহলে এর জবাবে সেদিন কী বলতাম জানি না, আজ বলতে পারি এর একমাত্র কারণ ওই তেরো নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়িটা আর তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা ওই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরটা। ওই সংস্কার আর সংস্কার-মুক্তির প্রতীকটা। ওই দুটোই আমাকে কেবল বিকল করে দিত। ওই বাড়ি দুটো আজ এতদিন পরে হয়ত আর সে-রকম নেই। হয়ত তাদের বাস্তব রূপটা আমূল বদলে গিয়েছে। কিন্তু চল্লিশ বছর আগেকার সেই দেখাটা আজও আমার মনে সত্য হয়ে রয়েছে। সেই সত্য চেহারাটা সেই অল্প বয়েসের দৃষ্টিতে যেমনভাবে আঁকা হয়ে গিয়েছিল আজও তা মোছেনি।

যখন ধরা-বাঁধা পাঠ্য-কেতাবের মধ্যে আমার মনটাকে আকৃষ্ট করে রাখা অত্যাবশ্যক অনিবার্য তখন আমি সে-সব দূরে সরিয়ে রেখে কলকাতার অগ্রজ প্রতিষ্ঠিত লেখকদের জিজ্ঞেস করতাম—আপনারা উপন্যাস কেমন করে লেখেন? সমস্তটুকুই কি আগে থেকে ভেবে নিয়ে লিখতে শুরু করেন?

এই ধরনের অনেক প্রশ্ন তখন আমাকে বিব্রত করতো। ছোট গল্প তো অনেক লিখেছি। অনেক বড় বড় কাগজের পৃষ্ঠায় তা ছাপাও হয়েছে। কিন্তু উপন্যাস না লিখলে তো লেখক পদ-বাচ্য হওয়া যাবে না।

কিন্তু কারোর কাছেই কোনও সদুত্তর পেতাম না। কিম্বা যে-উত্তর পেতাম তা আমার মনঃপূত হতো না। অথবা পৃথিবীর কোনও মানুষের সঙ্গেই যেমন কোনও মানুষের স্বভাব-চরিত্রের মিল নেই, তেমনি একজন লেখকের লেখন-পদ্ধতির সঙ্গে আর একজন লেখকের লেখন-পদ্ধতি যে মিলবে তারও হয়ত কোনও বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই।

উদ্বেগে-চিন্তায় আমার উচ্ছৃঙ্খলতা আরো বেড়ে গেল। নিয়ম করে তখন আর কিছুই করা হয় না। বাড়িতে কিম্বা বাইরে সর্বত্র প্রতিকূল পরিবেশ। আসলে আমার নিজের অক্ষমতাই যে বাইরের জগৎকে আমার প্রতিকূল করে তুলেছিল এটা তখন আমার হৃদয়ঙ্গম হয়নি।

আমার জীবনের একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী তখন যিনি তিনি একদিন আমাকে ধরে কাছে বসালেন। বললেন—তুমি এবার কী করবে ভেবেছো? কোন্ লাইনে যাবে?

ছেলের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা প্রত্যেক স্নেহশীল পিতারই কাম্য। এর মধ্যে কিছু নতুনত্ব নেই। আর তখন আবার প্রাক্-যুদ্ধের আমল। পৃথিবীময় মানুষের মাথায় বেকারত্বের অভিশাপ। কিন্তু আমার পিতৃদেবের ক্ষমতা অসীম। সেই বেকারত্বের যুগেও তিনি ইচ্ছে করলেই তাঁর ছেলেকে একটা সরকারী-চাকরি জুটিয়ে দিতে পারেন। কারণ তিনি নিজে তখন একজন অবসর-প্রাপ্ত উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মচারী। আর সরকারী চাকরির তখন এমনই এক গুণ যে সারা-জীবনের মত অমন নিশ্চিন্ত স্থায়িত্ব আর কোথাও পাবার ভরসা নেই।

বললাম—আমি এম-এ পড়বো—

বাবা বললেন—এম-এ পড়ে কী হবে? স্কুল-কলেজে মাস্টারি করবে?

আমার জবাব না পেয়ে তিনি আবার বললেন—তোমার এক দাদা ডাক্তার, আর এক দাদা ইঞ্জিনিয়ার, আমার ইচ্ছে তুমি চাটার্ড অ্যাকাউনটেণ্ট হও, ওতে অনেক টাকা—

আমার রাগ হয়ে গেল। বললাম—আমি অনেক টাকা চাই না—টাকা তো সবাই চায়, তার মধ্যে একজন টাকা না-ই বা চাইলো?

—টাকা চাও না? টাকা না হলে চলবে কী করে? একদিন তো বিয়ে করবে, সংসার করবে, চিরকাল তো আমিও বাঁচবো না। আমারও তো বয়েস হচ্ছে। তোমার একটা কিছু হিল্লে করতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারতাম—

হায় রে মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষা! যেন মানুষের সব শুভাকাঙ্ক্ষাই সফল হয়, যেন মানুষের সব ইচ্ছেই পূরণ হয়!

আমার বন্ধু সতু লাহা যখন আমার বাড়িতে আসতো তখন পিতৃদেব তাকে আড়ালে ডাকতেন। বলতেন—ও কী করবে বল তো সতু? বি-এ তো পাস করেছে, এবার তো একটা লাইনে ঢোকা উচিত। চাকরিতে

আমি ওকে এখুনি ঢুকিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তাতে তো অল্প মাইনে। ও তোমাদের কিছু বলে? আমার সঙ্গে তো কথাই বলে না—

সতু বলতো—এখন তো ও পড়ছে, পড়ুক না—

বাবা বলতেন—দেখ, আমি চাই ও বিলেত যাক, সেখানে গিয়ে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্সিটা পড়ে আসুক, শেষকালে ও আমাকেই দোষ দেবে, বলবে ওর দাদাদের লেখা-পড়ার জন্যে কত টাকা খরচ করেছি, ওর জন্যে কিছুই করিনি—

সতু বাবার কথাগুলো আমাকে এসে বলতো। দুজনেই হাসাহাসি করতাম। বৃদ্ধদের কথা শুনে অল্প বয়েসের আমাদের হাসাহাসি করাই তো নিয়ম। এখন হলে অবশ্য আলাদা। এখন যদি তেমনি একজন শুভাকাঙ্ক্ষী পেতাম, যে আমার জন্যে ভাববে, যে আমার জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করবে, এমন একজন মানুষ যে আমার দুর্ভাবনার শরিক হবে! আমার যাত্রা-পথের সমস্ত বাধা দূর করে তা নিষ্কণ্টক করবে। কিন্তু এখন আমার এ ইচ্ছা-পূরণের আর কোনও উপায় নেই, ইচ্ছাপূরণের যিনি মালিক আমার বেলায় তাঁর ভাঁড়ারের সমস্ত উপহার এখন বাড়ন্ত। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এখন আমি একেবারেই নিঃস্ব, নিঃসহায় এবং নিঃসম্বল।

তাই মনে আছে পিতৃদেবের ইচ্ছে পূরণ করবার জন্যে শেষ পর্যন্ত নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে একদিন ভর্তি হলাম গিয়ে অ্যাকাউনটেন্সির ক্লাশে। বাংলা করলে বিদ্যেটার নাম দাঁড়ায় হিসেব-নিকেশি বিদ্যে। কীসের হিসেব? না, টাকা-আনা-পয়সার হিসেব। পাপ-পুণ্যের হিসেব নয়, ভালো-মন্দের হিসেব নয়, সত্যি-মিথ্যের হিসেব নয়, কেবল টাকা-আনা-পয়সার হিসেব। সাহিত্যের রসেরও একটা হিসেব আছে অবশ্য। তেমনি সঙ্গীতের রসেরও হিসেব আছে। সঙ্গীতে সুরের যেমন একটা হিসেব আছে, তালের হিসেব তার চেয়ে কিছু কম শক্ত নয়। তিন তাল এক ফাঁক ছাড়া গান গাইতে গাইতে তালের মাত্রার দিকেও গায়ককে নজর রাখতে হয়। 'সম্' যদি দ্বিতীয় তালে না পড়ে অন্য কোনও জায়গায় পড়ে তাহলে গায়কের বেতালা বলে বদনাম হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সামান্য ধারাবাহিক উপন্যাস সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সময়ও শিল্পীকে একটা অসাধারণ হিসেব কষতে হয়; এমন একটা জায়গায় এসে 'ক্রমশঃ' বসাতে হয় যাতে পাঠকের কৌতূহলের থার্মোমিটারে পারদের দাগটা উঁচু ডিগ্রীতে গিয়ে ঠেকে, আর এমন ডিগ্রীতে গিয়ে ঠেকে

যে পরের সংখ্যা হাতে পাবার জন্যে পাঠক যেন ছট্‌-ফট করে মরে। দক্ষিণ-কলকাতায় এমন দু একটি দক্ষিণ-ভারতীয় পরিবার জানি যারা কেরলের পত্রিকার গ্রাহক। যেদিন ডাকের গোলযোগে পত্রিকা হাতে এসে পৌঁছতে দেরি হয় সেদিন তাঁদের বাড়িতে প্রস্তুত খাদ্য তাঁদের জিভে বিস্বাদ লাগে। কাজে মন বসে না। এও হিসেব। রসের হিসেব। এ-হিসেব শিখতেও শিল্পীর পক্ষে বহু সাধনার প্রয়োজন অনিবার্য হয়। কিন্তু টাকা-আনা-পয়সার হিসেবটা বড় গোলমেলে। ওটা আমার পরিপাক-শক্তির প্রতিকূল। রসের হিসেবের খানিকটা তালিম নিয়েছিলাম আমার গুরু দুই ওস্তাদজীর কাছ থেকে। কিন্তু এ-হিসেবের বিদ্যে আমার মাথায় ঢুকলো না। প্রতিদিন ক্লাশে যাই। প্রথমেই যে-হিসেব নিয়ে তামিল শুরু হলো তার নাম 'ব্যালান্স-শীট' বা 'ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট'। ইংরেজী কথাটা বহুশ্রুত! অনেকেই সারা দিনের কাজ-কারবারের পর ডেবিট-ক্রেডিট করে ব্যালেন্স-শীট তৈরি না-করা পর্যন্ত শুতে যাবার সুযোগ পান না। তা ছাড়াও আছে জীবনের ডেবিট-ক্রেডিট। রবীন্দ্রনাথও তো বলেছেন 'কী পাইনি তার হিসেব মেলাতে মন মোর নহে রাজী।' যাঁরা হিসেব করে বাঁচেন এবং হিসেব করে আচার-আচরণ করেন তাঁরাই সংসারে বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে প্রশংসিত হন। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত জীবনে একমাত্র সাহিত্য ছাড়া কখনও হিসেব করে কিছু করেছি বলে মনে পড়ে না। কার সঙ্গে মিশবো, কার সামনে কী কথা বলবো। আর কতটুকু বলবো, কোন্‌ সমাজে কী পোশাক-পরিচ্ছদ পরবো বা কী-রকম আচরণ করলে আমার কার্যসিদ্ধি হবে সে-সব হিসেব করাকে আমি স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করে এসেছি। অথচ পিতৃদেবের ইচ্ছে-পূরণের জন্যে সেই হিসেব-নিকেশি বিদ্যেই আমাকে করায়ত্ত করতে হবে। সে যে কী আত্মগ্লানি, কী আত্ম-অনুশোচনা তা আমাকে যারা চেনে তারাই বুঝতে পারবে। রামপ্রসাদ প্রথম-জীবনে ছিলেন জমিদারী-সেরেস্তার একজন সামান্য হিসেব-নবীস মাত্র। কিন্তু তিনি মহাপুরুষ ছিলেন বলেই হিসেবের খাতার মধ্যেই মায়ের নাম লিখে মুক্তি পেয়েছিলেন। আর আমি? আমি রামপ্রসাদ তো নই-ই, এমনকি মায়ের নামও আবার আমার পোড়া-মুখে তেমন করে আসে না। কী করবো বুঝতে পারছিলাম না। অথচ ছ মাসের আগাম মাইনে দেওয়া হয়ে গেছে। আমার সহপাঠীরা যখন হিসেব-নিকেশের গণিতের কূট-তর্কে বিভোর আমি তখন হঠাৎ একদিন

ক্লাশে যাওয়া বন্ধ রেখে সকলের অজ্ঞাতে সোজা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে নিন্দিত এবং সবচেয়ে অবহেলিত বিষয় 'বাঙলা'-বিভাগের দফতরে গিয়ে হাজির হলাম।

বিভাগের করণিক বললেন—এখন তো আর ভর্তি করা হবে না, তারিখ পেরিয়ে গেছে—

অনেক অনুনয়-বিনয় আর অনেক পীড়াপীড়ির পরে বললেন—আপনি যদি সেক্রেটারির বিশেষ অনুমতি আনতে পারেন তবে ভর্তি করা যেতে পারে—

তখন যতদূর মনে পড়ে সেক্রেটারি ছিলেন শৈলেন মিত্র মহাশয়। বিশেষ অনুমতি আনতে বেগ পেতে হলো না। আজকালকার মত সে-যুগে এত ভিড়ও ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়ে। সুতরাং পঞ্চম-বার্ষিক শ্রেণীর হাজরে খাতায় আমার নাম উঠলো। নাম উঠলো সকলের শেষে। এবং আমারটাই হলো সকলের শেষ রোল-নম্বর।

স্কুলের একেবারে প্রথম শ্রেণীতে যা হয়েছিল, আশুতোষ কলেজে আই-এ পড়বার সময় যা হয়েছিল, বিদ্যাসাগর কলেজে বি-এ ক্লাশে যা হয়েছিল, এমন কি জীবনের এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এখন যা হয়েছে, সেই এম-এ ক্লাশে গিয়েও তাই-ই ঘটলো। আমার ঠাঁই হলো একেবারে পেছনের বেঞ্চিতে।

বাড়িতে এই দুর্ঘটনায় প্রায় কান্নার রোল ওঠবার মত অবস্থা হলো। আমাদের বংশে এত বড় সর্বনাশ আর কখনও ঘটেছে বলে কেউ মনে করতে পারলে না। পরবর্তীকালে যাকে একদিন সমস্ত মানুষের কাছ থেকে বৃহত্তর আকারের কুৎসা-কলঙ্ক-অবহেলা-প্রত্যাখ্যান-অপ্রশংসার পসরা মাথায় বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে সেই তখন থেকেই বুঝি তার সহ্য-শক্তির হাতেখড়ি শুরু হলো। সংসারে সহ্যশক্তিই বোধহয় সবচেয়ে কঠিন শক্তি। ওই শক্তি যে আয়ত্ত করতে পারবে না সাহিত্যক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে আবির্ভূত হবার কোনও অধিকার তার নেই। আমি তখন থেকেই ধরে নিয়েছিলাম যে আমার জন্যে আরাম বলে কোনও বস্তু আমার সৃষ্টিকর্তা তাঁর ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখেন নি। আর শুধু আরামই নয়। শান্তি, স্নেহ, ভালবাসা, সহযোগিতা, সহানুভূতি প্রভৃতি অভিধানের শব্দগুলো আমার মত অপদার্থের জন্যে সৃষ্টিও হয়নি। বলতে গেলে আমার জন্যে কোনও দল নেই, আমি নিঃসঙ্গ পদাতিক, আমার সুখ-দুঃখের দোসর হবার কেউ কোনও দিন থাকবে না—কেবল এই শর্তেই একটা নির্ধারিত

অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে জীবন-ধারণ এবং জীবন-ধারণের জন্যে কঠোর সংগ্রাম করে যেতে হবে। ধরেই নিয়েছিলাম এই নিঃসঙ্গ যাত্রাই আমার বিধিলিপি।

কিন্তু ভবিষ্যৎ যেমন কারোর পক্ষেই দৃষ্টিগোচর হবার নয়, তেমনি আমারও ভবিষ্যৎ আমার দৃষ্টিগোচর ছিল না। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া দেখে যদি ভবিষ্যতের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভবপর হয় তো তা ছিল আমার মুক্তির পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর। শুধু নিয়ম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশগুলোতে কোনও রকমে উপস্থিতি বজায় রাখি। কিন্তু বেশির ভাগ দিনই হাজরে খাতায় আমার উপস্থিতি নথিবদ্ধ হয় না। কারণ রোল-কল্ হবার অনেক পরে আমি ক্লাশে গিয়ে হাজির হই। তখন নাম-ডাকা শেষ হয়ে গেছে। ক্লাশ রুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আমি যথারীতি প্রতিদিন বাইরে থেকে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিই। কোনও ছাত্র ও ছাত্রী হয়ত দয়া-পরবশ বা বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দেয়। মনোযোগী ছাত্ররা আমার ওপর বিরক্ত হয়। দেরিতে এসে তাদের পড়াশুনোয় আমি ব্যাঘাত ঘটিয়েছি—আমার এ অপরাধ তাদের কাছে ক্ষমার অযোগ্য। তারা সবাই আমার দিকে রোষ-কষায়িত দৃষ্টিতে চায়। আমি কুণ্ঠিত-চিত্তে সকলের শেষের বেঞ্চিতে বসে আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ পরিপাক করবার ব্যর্থ প্রয়াস করি।

দু'বছর এমনি চলার পর যখন পরীক্ষা দেবার সময় আসে তখন পরীক্ষার ফিস্ বাবদ টাকা জমা দিতে গিয়ে শুনি আমার পরীক্ষা দেবার অধিকার নেই।

জিজ্ঞেস করলাম—কেন ?

ভদ্রলোক বললেন—আপনি তো রেগুলার ক্লাশে আসেন নি, আমাদের নিয়ম সেভেণ্টি পারসেণ্ট অন্তত ক্লাশে হাজির থাকা চাই, আপনার মাত্র ফর্টি ওয়ান পার্সেণ্ট অ্যাটেনডেন্স, এটা ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির রেকর্ড, এর আগে এত কম অ্যাটেনডেন্স আর কারো হয়নি আমাদের ইউনিভারসিটিতে—

জিজ্ঞেস করলাম—তাহলে কী হবে ? আমি কী এগজামিন দিতে পারবো না ?

ভদ্রলোক বললেন—পারবেন, যদি ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি আনতে পারেন—

সহজভাবে কিছুই যখন আমার জীবনে হয় না তখন সহজভাবে

পরীক্ষা দিয়ে সহজে পাস করাটাই বা আমার জীবনে সহজ হবে কেন? আমার সৃষ্টিকর্তা আমাকে পৃথিবীতে পাঠাবার সময় বোধ হয় কপালে রক্তাক্ষরে এ-কথাটা লিখে দিয়েছিলেন যে এ-মানুষটা রক্তপাত করে জন্মের সব ঋণ শোধ করতে চাইলেও এর সব রক্তপাত ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হবে —Francis Bacon বলে গেছেন ঃ "If a man will begin with certainties he shall end in doubts. But if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties." আমার বেলায় কিন্তু এই কথাগুলোও সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে গেছে। নিরর্থক এই অর্থে যে আমি তো আমার আরম্ভও দেখেছি, এখন আবার শেষও দেখছি। শুরুতে আমার যে সংগ্রাম ছিল, জীবনের শেষ পরিচ্ছেদে এসেও সেই একই সংগ্রাম আমার অব্যাহত রয়েছে। অন্যায়ের সঙ্গে সংগ্রাম, অশুভ-শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম। আবার আশ্চর্য সেই অন্যায় আমার প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে, সেই অশুভশক্তি আমার প্রতিদিনের আচার-আচরণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। আমার মধ্যেকার সেই অলস-প্রকৃতি কেবল আপোস করতে বলে, সে কেবল সংগ্রামকে এড়িয়ে চলতে বলে, সে কেবল সমস্ত তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে বলে। সে বড় গোপন, বড় গুহায়িত, তাই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে সে কেবল আমার আমির শত্রুতাচরণ করে। তাই আমার সংগ্রাম এত তীব্র হয়, এত কষ্ট-দায়ক হয়। শত্রু যদি বাইরের কেউ হতো তাহলে তার সঙ্গে হয় সমঝোতা করতাম আর নয় তো তার মোকাবিলা করতাম। কিন্তু আমার আমির সঙ্গে সংগ্রাম কি অত সহজ?

তা সেই ভদ্রলোকের নির্দেশমত একদিন গেলাম ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে।

জগৎ-সংসারে নানা-কারণে যারা সুবিখ্যাত এবং উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত সাধারণত আমি তাঁদের এড়িয়ে চলি। স্বগোত্রীয় সাধারণ লোকের সঙ্গে আমি বেশ সহজ বেশ সাবলীল। রাস্তার লোক আমাকে বেশি আকর্ষণ করে। তাঁদের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার মধ্যে আমি আমার নিজেকে আবিষ্কার করে আত্মীয়তা অনুভব করি। কিন্তু সেদিন সেই আর্জি নিয়ে যাওয়াতেই ছিল আমার যত আপত্তি।

বিখ্যাত লোকের বৈঠকখানায় সেই-ই আমার প্রথম এবং শেষ যাওয়া। কিন্তু সেখানকার অবস্থা দেখে তো আমার চক্ষুস্থির। শুনলাম সকাল থেকে কিছু লোকের সেখানে উপস্থিতি একটা প্রাত্যহিক নিয়ম। তাদের

কী কাজ? জবাবে শুনলাম তাদের কাজ শ্যামাপ্রসাদকে প্রাতঃপ্রণাম জানানো। তিনি কেমন আছেন সেই বিনীত প্রশ্নটি তাঁকে করা। একটা নির্দিষ্ট সময়ে তেতলা থেকে দোতলার বৈঠকখানায় নামবেন শ্যামাপ্রসাদ এবং সেই সময়ে তাঁকে প্রাতঃপ্রণাম জানাবার জন্যে জন পঞ্চাশেক লোক ঘুম থেকে উঠেই সেখানে সেই সিঁড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাতঃকালীন দাঁত মাজার পবিত্র কার্যটি সমাধা করবে। তাতে রথ দেখা এবং কলা বেচা দুই কাজই একত্রে হবে।

তবু জিনিসটা বুঝতে পারলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম—ওরা কারা? ওদের উদ্দেশ্য কী?

জবাবে শুনলাম—ওরা প্রবেশিকা পরীক্ষার খাতা দেখেন—পেপার-এগজামিনার—

—ম্যাট্রিকের খাতা দেখেন তো এখানে কেন? হেড্-এগ্জামিনারের বাড়ি গেলেই হয়?

—সে তো যানই, তার ওপর এখানে রোজ একবার শ্যামাপ্রসাদবাবুকে মুখটা দেখিয়ে যান, যাতে পরীক্ষকদের তালিকা থেকে পরের বছরে নামটা কাটা না যায়, বছরে পাঁচ ছ'শো টাকা আমদানি কি সোজা ব্যাপার?

পরীক্ষা এবং পরীক্ষার ভেতরের ব্যাপার সম্বন্ধে সেই-ই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধে সেই যে আমার ভক্তি দূর হলো তা পরবর্তী আরো অনেক অভিজ্ঞতায় একেবারে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে গেল। সে-সব প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। তবে আমার কাজটির জন্যে সেদিন এক সেকেণ্ডও সময় লাগলো না। সামনে যেতেই একটা কাগজে তিনি সই করে দিলেন। তারপর পরীক্ষা দিলাম এবং সে-পরীক্ষায় পাস করলাম।

কিন্তু কী হবে পরীক্ষা দিয়ে এবং পাস করে? পরীক্ষকদের স্বরূপ সেদিন যে-দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলাম এতদিন পরে সে-দৃষ্টি আরো তীর্যক হয়েছে। শুধু পরীক্ষা কেন, বিখ্যাত ব্যক্তিদের বৈঠকখানার যে-রূপ সেদিন দেখেছি, যে তোষামোদ এবং যে নীচতা হীনতা এবং সংকীর্ণতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সেদিন আমার হয়েছে, তার চেয়ে লক্ষগুণ নীচতা, হীনতা এবং সংকীর্ণতা আজ দেশের সমাজের পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছে। আজ সারা দেশটাই শ্যামাপ্রসাদের বৈঠকখানায় রূপান্তরিত হয়েছে, কিন্তু কই, আমি তো তার সহস্রাংশের একাংশও আমার লেখার মধ্যে প্রকাশ করতে পারিনি! শিক্ষক সমাজের ওপর আমার যে শ্রদ্ধা তা পরবর্তীকালে

আমি আমার নানা রচনার মধ্যে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। তার চরম প্রকাশ হয়েছে আমার 'রাজাবদল' উপন্যাসের পাতায়। এ-সবই সম্ভব হয়েছে এমন কয়েকজন শিক্ষকের জন্যে যাঁরা চেয়েছিলেন আমি এই নীচতা হীনতা আর সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারি। তাঁদের একজন হচ্ছেন আমাদের স্কুলের দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যিনি আমার কবিতার খাতাটা নিয়ে অন্যান্য ক্লাশে আবৃত্তি করে শোনাতেন। আর একজন ছিলেন আমার বাল্যকালের গৃহশিক্ষক কালিপদ চক্রবর্তী—যিনি আমার কবিতা পড়ে আমাকে নিরুৎসাহ করার বদলে নিজের ব্যক্তিগত অর্থ দিয়ে একখণ্ড 'গীতাঞ্জলি' কিনে আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। অথচ তখন আমার বয়েস কতই বা, মাত্র বারো কি তেরো। আর একজন শিক্ষক হলেন আশুতোষ কলেজের অমলকুমার রায়চৌধুরী। তিনি মনে করতেন আমাকে উৎসাহ দিলে আমি ভবিষ্যৎ জীবনে একজন সুলেখক হতে পারবো। আর একজন ছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজের বাঙলার অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস। তিনি প্রথম দিনেই আমাকে নিজের করে নিয়েছিলেন আপন চিত্তের উদারতা দিয়ে। একথা আমার পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। আর একজনের কথা আমি আমার এক প্রবন্ধে আগেই লিখেছি—তিনি আমাদের স্কুলের হেড-মাস্টার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। সেই অল্প-বয়েসে আমার চারদিকের নিষ্ঠুর বিরূপ জগতের মধ্যে এঁরাই ছিলেন আমার একমাত্র স্নেহচ্ছায়া। এঁরা একজন ছাড়া সকলেই এখন বিগত। আর যিনি এখনও জীবিত এবং কর্মক্ষম, তিনি হচ্ছেন বর্তমানে বিদ্যাসার কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের বিভাগীয়-প্রধান শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

আর সকলের শেষে যাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি তিনি হলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং ৺প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী। কিন্তু এঁর কথা এখন থাক। পরে যথা-সময়ে এঁর কথা না বললে সত্যের অপলাপ হবার আশংকা থাকবে বলেই তাঁর কথা আমাকে যথাস্থানে বলতেই হবে।

তা এম-এ পাস করার পর ভাবলাম এবার মুক্তি। পরীক্ষা পাসের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি, নিয়মিত ক্লাসে হাজিরা দেওয়া থেকে মুক্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার পর যে-চিন্তা সাধারণত সব ছাত্রকে দুর্বহ করে তা হলো অর্থ-উপার্জনের দুশ্চিন্তা। তা আমার সেই বয়েসেও ছিল না। কিন্তু ছিল আত্মপ্রকাশের দুশ্চিন্তা। পরমার্থ লাভের

দুশ্চিন্তা। লেখকদের জীবনে সমস্ত বাধা দূর করে আত্মপ্রকাশের বা পরমার্থ লাভের সমস্যা বোধ হয় সবচেয়ে ভয়াবহ। সে-চিন্তা অর্থ-উপার্জনের চেয়েও দুর্বহ! তখন দুর্বহ তার জীবনযাত্রা, অসহ্য তার অস্তিত্ব। অস্তিত্বের এই অসহনীয়তা আমাকে সমস্ত দিনরাত চারদিকে ছুটিয়ে বেড়াতো তখন। সেই ছোটার তাগিদে কখনও যেতাম তের নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে, কখনও অক্রুর দত্ত লেনের স্টুডিওতে আবার কখনও বা কোনও বই নিয়ে নিমগ্ন থাকতুম। সেও এক রকমের ছোটাছুটি বৈকি! ডিকেন্সের "A Tale of Two Cities" এমনি একটা বই যা পড়লে শতাব্দীর তেপান্তরে ছুটে বেড়ানো যায়। এক সহপাঠী বন্ধুর কাছ থেকে বইটা পড়তে চেয়ে নিয়ে এসে তা আর তাকে ফেরত দিইনি। মনে আছে বইটা সাত বার পর পর পড়েছি, তারপরেও বিচ্ছিন্নভাবে যে কতবার পড়েছি তার সীমা-সংখ্যা নেই। পড়তে পড়তে ভেবেছি ফরাসী বিপ্লব নিয়ে যদি একজনের পক্ষে উপন্যাস লেখা সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে আমাদের দেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর পলাশীর যুদ্ধ নিয়েই বা উপন্যাস লেখা যাবে না কেন? কার্লাইল যেমন আগেই ডিকেন্সের জন্যে ফরাসী-বিপ্লব সম্বন্ধে বই লিখে রেখে গিয়েছিলেন পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে তেমনি বই কি আছে? আর থাকলেও সে বই পাবো কোথায়? কে আমাকে তার হদিস দেবে? বিদ্যাসাগর কলেজের ফেরতা পথে ফুটপাতের পুরোন বই-এর দোকানে ঘুরে-ঘুরে পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে বই খুঁজি। ময়লা ধুলো-পড়া পোকায় কাটা বই সব। আমার দরকারের অতিরিক্তও কিছু পেয়ে যাই। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙলার ইতিহাস' (নবাবী আমল), 'সহজ হেকিমী চিকিৎসা', 'জমিদারি দর্পণ', 'মজার হেঁয়ালি', 'পত্র লিখন প্রণালী', 'উর্দু-বাঙলা অভিধান', 'কলিকাতার কথা' (প্রমথনাথ মল্লিক), 'কলিকাতায় চলাফেরা' আরো কত রকম বই সব। যুদ্ধের আগে এ-সব বই-এর চাহিদা তেমন ছিল না। পাঁচ টাকার বইটা চার আনায় কিনে নিতাম। যদুনাথ সরকারের 'History of Bengal' বইটা পুরোন বই-এর কারবারি ইউসুফকে জোগাড় করতে বলেছিলাম, কিন্তু তা সে দিতে পারেনি। ইউসুফ পুরোন বই-এর ব্যাপারে অসাধ্য-সাধনকারী। সে আমাকে কত যে দুষ্প্রাপ্য বই দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তারও তো সাধ্যের একটা সীমা আছে। পরে অবশ্য সে-বই ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম।

একটা এপিক উপন্যাস লিখতে গেলে যে কত কী উপকরণের দরকার

হয়, এবং কেন তার দরকার হয় এখানে একটা ছোট গল্প দিয়ে তা বোঝাতে চেষ্টা করি। গল্পটা মোপাঁসার জীবনের। এই গল্পটা আমার লেখক-জীবনে বড় কাজে এসেছিল।

মোপাঁসার মায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন তৎকালীন ফ্রান্সের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক 'ম্যাডাম বোভারি'র লেখক ফ্লবেয়ার। ছেলে মায়ের কাছে খুব বায়না ধরতো সে লেখক হবে। চাকরি তখন একটা করছে ছেলে, কিন্তু সামান্য চাকরি। তাতে পেট ভরলেও তার মন ভরে না।

অ... পীড়াপীড়ির পর মা ফ্লবেয়ারের কাছে ছেলেকে নিয়ে গেলেন। বললেন—আমার ছেলের বড় লেখক হওয়ার শখ, আপনি ওকে একটু লেখা শিখিয়ে-টিখিয়ে দিন—

ফ্লবেয়ার শুনলেন আর্জি। মোপাঁসাকে দেখে বললেন—ঠিক আছে, তুমি আর একদিন সময় করে আমার কাছে এসো, আমি তোমায় গল্প লেখা শিখিয়ে দেব—

কিছুদিন পরে মোপাঁসা ফ্লবেয়ারের কথামত গেলেন তাঁর বাড়ি। ফ্লবেয়ার চিনতে পারলেন না তাঁকে। মায়ের পরিচয় দেওয়াতে সব কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। তখন তাঁর কথা বলবার বেশি সময় ছিল না। সামনের টেবিলের ওপর থেকে একখানা বই তুলে নিয়ে বললেন—এইটে নাও, নিয়ে বাড়িতে গিয়ে এখানা পড়ো, এইটে ভালো করে পড়ে মুখস্থ করলে তুমি ভালো গল্প লিখতে শিখবে—

মোপাঁসা আর দ্বিরুক্তি না করে বইটি নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। মাস দুই তিন পরে ফ্লবেয়ার একদিন তাঁর নিজের ঘরে বসে আছেন এমন সময় অচেনা একটি ছেলে এসে হাজির।

ফ্লবেয়ার তাকে চিনতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—কে তুমি? কী চাও?

মোপাঁসা বললেন— আমার নাম মোপাঁসা—আমার মা'র সঙ্গে একদিন আপনার কাছে এসেছিলুম, আপনি আমাকে এই বইখানা দিয়ে বলেছিলেন, এইটে মুখস্থ করলে আমি ভালো গল্প লিখতে শিখবো—

—দেখি, কী বই দিয়েছিলুম—

বলে হাত বাড়িয়ে বইখানা নিয়ে দেখলেন সেটা একটা ডিক্সনারি, অভিধান। তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে কোনও রকমে বিদায় করতে হবে ভেবে হয়ত একটা যা-কিছু অজুহাতে ছেলেটির অনুরোধ ওইভাবে রক্ষা করেছিলেন। ছেলেটির দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি এই বই মুখস্থ

করেছ ?

মোপাঁসা বললেন—হ্যাঁ, আপনি যে বলেছিলেন মুখস্থ করলে আমি ভালো গল্প লিখতে পারবো—

কথাটা শুনে হতবাক হয়ে গেলেন ফ্লবেয়ার। বললেন—তুমি বোস এখানে—

মোপাঁসা বসলেন। ফ্লবেয়ার মোপাঁসাকে লক্ষ্য করে জানালার বাইরে দূরে একটা জায়গা নির্দেশ করে জিজ্ঞেস করলেন—বলো তো ওটা কী দেখছো ?

মোপাঁসা ফ্লবেয়ারের নির্দিষ্ট জায়গাটা লক্ষ্য করে বললেন—ওটা একটা পাইন গাছ—

ফ্লবেয়ার বললেন—না, হলো না, আর একবার ভালো করে দেখে বলো—

মোপাঁসা বললেন—কিন্তু আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওটা পাইন গাছ—

ফ্লবেয়ার বললেন—না, ওটা শুধু পাইন গাছ নয়, ওর পেছনে যে একটা চিলেকোঠা রয়েছে, তার খোলা জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরে মানুষ দেখা যাচ্ছে, চিলেকোঠার পেছনে আকাশ, আকাশের গায়ে একটুকরো সাদা মেঘ, মেঘের ওপর দিয়ে একটা চিল উড়ছে, ওই সব কিছু নিয়েই ওই পাইন গাছটা। ওগুলো বাদ দিয়ে পাইন গাছটার কোনও আলাদা অস্তিত্ব নেই, ও গাছটা ওই সব কিছুর একটা অচ্ছেদ্য অঙ্গ—

মোপাঁসার গল্প লেখা শেখার পেছনে এই-ই হলো প্রথম হাতেখড়ি। 'মাসিক বসুমতী'র সহ-সম্পাদক সরোজনাথ ঘোষ মহাশয় আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ১৩৩৬ সালে আমাকে প্রথম এই গল্পটা বলেছিলেন। সত্যি-মিথ্যে জানি না, হয়ত এটা কিংবদন্তী, কিন্তু কথাটা সাহিত্যিক অর্থে অসত্য নয়। সঙ্গীতের পক্ষেও এটা অসত্য নয়। এ যেন সেই রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়ক হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের অর্গ্যান বাজানোর মতন। দেখতাম যখন তিনি তাঁর দুই হাতের দশটা আঙুল দিয়ে অর্গ্যান বাজাতেন তাঁর আঙুলগুলো কখনও উঁচুতে উঠতো না, রীডগুলো স্পর্শ করে করে চলতো সব সময়ে। যখন তিনি 'সা' পর্দা টিপতেন তখন অন্য আঙুল-গুলো ছুঁয়ে থাকতো ওপর-নিচেয় গান্ধার আর সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমকেও। কারণ তারাও ছিল ওই 'সা'-এর অচ্ছেদ্য অঙ্গ। সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে কল্পনা করতে গেলেই মনে পড়ে যাবে আলিবর্দী খাঁ, ঘসেটি বেগম, চেহেল-

সুতুন, ক্লাইভ, মীরজাফর সকলকে। খয়ের চুন সুপারি ছাড়া কি পানের আলাদা কিছু অস্তিত্ব আছে? গোলাপের সঙ্গে যেমন কাঁটা। প্রতিমার সঙ্গে যেমন তার চালচিত্র। উপন্যাসের গল্পকে সত্য হতে হলে তাই চাই একটা চালচিত্র। তার পারিপার্শ্বিক উপকরণ। ওই 'পত্র লিখন প্রণালী', কলিকাতায় চলাফেরা', 'জমিদারি-দর্পণ', 'মজার হেঁয়ালী', 'সহজ হেকিমী চিকিৎসা' বইগুলো সেইরকম আমার উপন্যাসের অচ্ছেদ্য অঙ্গবিশেষ। তাই তখন ওই সব উপকরণ সংগ্রহ করে বাড়িতে নোংরা-জঞ্জালের স্তূপ সৃষ্টি করতাম। আর অবসর পেলেই ছুটে যেতাম অক্রূর দত্ত লেনের স্টুডিওতে। এক-একদিন এমন হয়েছে সন্ধ্যেবেলার দিকে পান্না ঘোষকে নিয়ে চলে গিয়েছি বালিগঞ্জের লেকে। তখনকার দিনে লেকে এত ভিড় থাকতো না। অনুপম সিদ্ধির বরফ খাইয়ে দিত সকলকে। আর তারপর শুরু হতো পান্না ঘোষের আড়বাঁশি। পান্না ঘোষের আড়বাঁশি যে না শুনেছে সে জানে না সুরের জাদু কাকে বলে। সুর যে মানুষকে কতখানি অভিভূত করতে পারে পান্না ঘোষই ছিল তার প্রমাণ। সন্ধ্যেবেলা থেকে তার বাঁশি শুনতে শুনতে কখন যে রাত দশটা বারোটা বেজে যেত তার খেয়াল থাকতো না আমাদের। বাড়িতে ফিরতে আবার যথারীতি সেই মাঝ-রাত। তখন মনে হতো জীবনটা বুঝি ওই রকম করেই কাটবে। তখন আরো মনে হতো সাহিত্যকেই আমি জীবিকা করে নেব। ডাক্তারদের যেমন ডাক্তারিটাই জীবিকা, ইঞ্জিনীয়ারদের যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যেটাই তার জীবিকা, তেমনি লেখকের পক্ষে লেখাটাই হওয়া উচিত তার জীবিকা। তা না হয়ে কেন তাকে জীবিকার জন্যে অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে দাসত্ব করতে হবে?

না, আমি যা ভয় করেছিলাম একদিন তাই হলো। একদিন যথারীতি আমি প্রাতঃকালীন আড্ডা দিয়ে দুপুর দেড়টার সময় বাড়ি ফিরেছি, দেখি আমার জন্যে আমার পিতৃদেব উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। কী ব্যাপার? না আমাকে নিয়ে তিনি তখনই তাঁর অফিসে যাবেন, আমার চাকরি হবে। খাওয়া পরে হবে। আর একদিন খাওয়া না হলে তেমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধও হয়ে যায় না। জীবনে তুমি পরে অনেক খাবে। প্রতি মাসের প্রথম তারিখে তোমার হাতে মাইনে পাওয়ার নিশ্চিন্ত আশ্বাস দেবার কর্তব্য আমি পালন করে গেলাম! তারপর তোমার ভাগ্য। ভাগ্যে থাকলে তুমি এই প্রতিষ্ঠানের একেবারে মাথায় না হোক মাঝামাঝি কাঁধ পর্যন্তও উঠতে পারো। তারপর যদি তুমি মন দিয়ে কাজ করে তোমার

ওপরওয়ালাদের খুশী করতে পারো তো তাহলে আর কোন কথাই নেই। তখন তুমিই বা কে আর আলমগীর বাদশাই বা কে। তুমি যেদিন চাকরি থেকে অবসর নেবে সেদিন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমার পেনসনের পাকা বন্দোবস্ত করে দেবে অফিস। তখন কত আড্ডা দেবে দিও না, প্রাণ ভরে আড্ডা দিও তখন। আর সাহিত্য? সমস্ত দিন চাকরি করে কি আর সাহিত্য করা যায় না? আমি কি তোমাকে সাহিত্য করতে বারণ করেছি? অফিস তো দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। পাঁচটার পর বাইরে আড্ডা না দিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে সাহিত্য কোর। বঙ্কিম চাটুজ্জে, শরৎ চাটুজ্জে তো তাই-ই করে গেছেন—

আসলে বাইরে পিতৃদেব আমাকে নিরুৎসাহ করলেও ভেতরে ভেতরে তিনিও ছিলেন একজন আর্টিস্ট। পিতৃদেব ছিলেন গায়ক। শখের থিয়েটারে অভিনয় করা ছিল তাঁর নেশা। বিশেষ করে যে-ভূমিকায় গান গাইতে হতো সেই ভূমিকাগুলো দেওয়া হতো তাঁকে। তাঁর শেষ জীবনে বাড়িতে যখন একলা থাকতেন তাঁকে আমি গান গাইতে শুনেছি। কিন্তু সংসারের সঙ্গে আপোষ করতে গিয়ে তাঁর ও-সব কিছুই হয়নি। সংসারের চাকা ঘুরিয়েই তিনি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জানতেন গান বা সাহিত্যের নেশা একবার পেয়ে বসলে সে-ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পাছে আমারও ভবিষ্যৎ তেমনি অন্ধকার হয়ে যায় তাই তিনি আমাকে চাকরিতে ঢুকিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন।

তা গাড়িটা যখন অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো তখন অফিসের সামনে ফুলের বাগান আর বাড়িটার স্থাপত্য-শিল্প দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বাইরেটা যার এত সুন্দর তেমন তার ভেতরে না জানি আরো কত সৌন্দর্য!

পিতৃদেব তখনও কানের কাছে বলে চলেছেন—চাকরি পাওয়াটাই শক্ত, সেইটে আমি তোমাকে জোগাড় করে দিয়ে গেলাম, এখন এ-চাকরি ছাড়া কি না-ছাড়া তোমার হাতে। ছাড়তে এক মিনিটও লাগে না। পাওয়াটাই শক্ত। ইচ্ছে হলে তুমি ছেড়ে দিও—

আমার এই চিঠির পাঠকদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকেন যিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বছরগুলো বন্দী-নিবাসের চারটে দেওয়ালের মধ্যে কাটিয়েছেন, বছরের পর বছর আলোবাতাসহীন ঘরে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় যাঁর জীবন কেটেছে, তাহলে তিনিই বুঝতে পারবেন আমার সেই চাকরির বছরগুলোর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থাটা। আমার

কলমে এমন ভাষা নেই যে তার বিশদ বর্ণনা দিই। যাঁরা Charles Lamb-এর লেখা 'The Superanuated Man' প্রবন্ধটা পড়েছেন তাঁরাই কেবল আমার সেই সময়কার অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন তাঁরই ভাষায় শুনুন—

"I had perpetually a dread of some crisis, to which should be found unequal. Besides my daylight servitude, I served over again all night in my sleep, and would awake with terrors of imaginary false entries, errors in my accounts, and the like. I was fifty years of age and no prospect of emancipation presented itself. I had grown to my desk as it were : and the wood had entered into my soul."

তবে ল্যামের সঙ্গে আমার একটা মস্ত তফাৎ ছিল। তফাৎ ছিল এই যে এই চাকরিতে আমাকে বেশিদিন ধরে কখনও একটা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয়নি। চাকরি-জীবনে বোধহয় আমাকে সাত-আটবার বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন পরিবেশে এবং বিভিন্ন কর্মে বদলি হতে হয়েছে। কখনও উড়িষ্যা কখনও বিহার, কখনও মধ্যপ্রদেশ আবার কখনও বা কলকাতায় আমার বদলি হয়েছে। আবার বছর তিন-চার তো মাসের মধ্যে সাতাশ দিন ট্রেনে চড়েই কাটিয়েছি। চাকরি করতে করতে আমার মনে হয়েছে আমাদের এই বাস্তব পৃথিবীর মত প্রত্যেক মানুষের মনের ভেতরেই পাশাপাশি আর একটা ইচ্ছার পৃথিবীও থাকে। সেই ইচ্ছার পৃথিবীতেও ঋতু পরিবর্তন হয়, সূর্য ওঠে সূর্যাস্ত হয়। সেখানেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে, আছে প্রত্যাশার আলো আর হতাশ্বাসের অমাবস্যা। সেই ইচ্ছার পৃথিবী কারো কাছে বড় আকার ধারণ করে আবার কারো কাছে ছোট। কারো কারো জীবনে সেই ইচ্ছার পৃথিবীর সঙ্গে তার বাস্তব পৃথিবীর সংঘর্ষও বাধে। বেশির ভাগ মানুষ সেই সংঘর্ষে বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে আপোষ করে নেয়। আপোষ করে ইচ্ছার পৃথিবীকে জলাঞ্জলি দিয়ে সংঘর্ষ থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করে। আরো পাঁচজন শান্ত-শিষ্ট ভদ্রলোকের মত সেও সেই তথাকথিত শান্তিকেই পরমার্থ মনে করে দুধের সাধ ঘোলে মেটায়। কিন্তু সংসারে এমন লোকও জন্মায় যারা হাজার অভাবের মধ্যে দুধই খেতে চাইবে, দুধের অভাবে ঘোলকে কখনও দুধ বলে ভ্রম করবে না। সংসারে সেই তারাই হয়ে ওঠে স্বাধীন, তারাই হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। তাই দেখা যায় কেউ তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে পরিত্রাণ

লাভ করে, আবার কেউ বা কোনও মহৎ উদ্দেশ্যের তাড়নায় আত্মবিসর্জন করে মুক্তি পায়।

কোথা দিয়ে কী যে হয়ে গেল আমার তখন আর তা খেয়াল রইল না। লেখার জগৎ থেকে আমি একদিন কলকাতা ছেড়ে সুদূর প্রবাসে চলে গেলাম। কর্ম থেকে কর্মান্তরে পাঠিয়ে দিয়ে আমার ভাগ্যদেবতা বোধ হয় আমার মনকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। মানুষের কর্ম একাধারে তার বন্ধনও বটে আবার সঙ্গে সঙ্গে তার মুক্তিও। কর্ম তখনই বন্ধন যখন তা প্রয়োজন দ্বারা শাসিত হয়। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ যে কর্ম করে সেই কর্মই তার শৃঙ্খল। কিন্তু প্রীতির তাগিদে যে কর্ম করি তাকেই বলা হয় মুক্তি। আমার দুর্ভাগ্য যে প্রীতি নয় প্রয়োজন-সাধনই সেদিন আমার জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। কাজের মধ্যেও আমার কান্না আসতো। ভাবতাম তবে কি দাসত্ব-বৃত্তির জন্যেই আমি একদিন এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম।

মানুষের মন যে কী অদ্ভুত বস্তু তা এখনও আমার মনে পড়ছে। আমাদের এই পৃথিবীর মত মানুষের মনও বোধ হয় সর্বংসহা। আশ্চর্য। প্রতি মাসের পয়লা তারিখে হাত পেতে বেতন নিতে শেষকালে আমার আর কুণ্ঠা হতো না। আস্তে আস্তে আমার মন যেন অসাড় হয়ে আসতে লাগলো। প্রথম-প্রথম ছিল লজ্জা, প্রথম-প্রথম ছিল অপমান-বোধ। চাকরি পেলে অন্য সকলের যেমন আনন্দ হতে দেখেছি আমার বেলায় ছিল ঠিক তার বিপরীত। ছোটবেলা থেকে অফিস-যাত্রীদের চেহারা দেখলেই আমি চিনতে পারতাম। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে সকাল ন'টার সময় দলে-দলে তাঁদের আমি কর্মস্থলে যেতে দেখতাম। যাবার সময় তাঁদের পোশাক, তাঁদের চলার ভঙ্গি, তাঁদের পান খাওয়া. তাঁদের ব্যস্ত ত্রস্ত ভাব আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আর তারপর ঠিক সাড়ে পাঁচটার পর থেকে তাঁদের ক্লান্ত-দেহে ঘামতে ঘামতে ফেরার দৃশ্য দেখবার জন্যে আমি জানালায় এসে দাঁড়াতাম। আমাদের বাড়ির পেছনে একটা মেস-বাড়িতে তাঁরা থাকতেন, আর আমাদের বাড়ির সামনের গলিটা দিয়ে তাদের কর্মস্থল 'বেঙ্গল গভর্মেণ্ট প্রেস'এর দিকে যেতেন। তাঁদের দেখতে দেখতে আমার মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠতো। ভাবতাম আমাকে যেন কখনও ওঁদের দলে নাম লেখাতে না হয়। অথচ তাই-ই শেষ পর্যন্ত হলো। শেষ পর্যন্ত ওঁদের দলেই তো আমি নাম লেখালাম।

কিন্তু কয়েক মাস কাজ করার পরই পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহা-বিশ্বযুদ্ধ

বেধে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি বিহারে বদলি হয়ে গিয়ে যেন পরিত্রাণ পেলাম। অর্থাৎ কয়েক মাসের মধ্যেই আমার আশাতীত পদোন্নতি। যা ছিল একদিন আমার ঘৃণার বস্তু আস্তে আস্তে তা আমার গা-সওয়া হয়ে উঠলো। টাকা এমনই জিনিস। আমি জানতাম চাকরি করা কালীন যদি চাকরিতে পদোন্নতি হয় তাহলে আমার লেখক-জীবনের পক্ষে তা হবে মৃত্যুর সামিল। যুদ্ধের গতি যত তীব্র আকার ধারণ করলো ততই আমারও ক্রমে-ক্রমে পদোন্নতি ঘটতে লাগলো। যে আমি সাহিত্যকেই অঙ্কলক্ষ্মী করে জীবন কাটাবো বলে সংকল্প করেছিলাম সেই আমিই নিয়মিত কর্মস্থলে হাজিরা দিতে লাগলাম এবং একে একে চারটে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে আরো বড় পদ অধিকার করে বসলাম। ভাগ্য-বিধাতার এও এক পরিহাস বইকি। যতই বাঁধন কাটতে চাই ততই সে-বাঁধন নাগ-পাশের মত আরো নিবিড়ভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়। কিন্তু জীবিকা। যে-আমি একদিন অক্রুর দত্ত লেনের স্টুডিওতে দিন কাটিয়েছি ভবিষ্যতের ভাবনা-রহিত হয়ে যে-আমি এক দিন বাঙলার শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রগুলোতে নিয়ম করে গল্প লিখেছি, সেই আমিই কিনা একদিন কর্মস্থলের বন্দী-নিবাসে কয়েকটি রজত মুদ্রার বিনিময়ে ভাড়া খাটছি এ-কথা মনে পড়লেও নিজের ওপর ঘৃণায় আমি বিব্রত হয়ে পড়ি।

একদিন একটা ঘটনা ঘটলো। কর্মস্থলে যিনি আমার সবচেয়ে বড়কর্তা তিনি কাজ করতে করতে বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন—রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ালেও এর চেয়ে সুখ পেতাম বিমলবাবু, এ ঘেন্নার চাকরি আর ভালো লাগে না—

হয়ত এ তাঁর সাময়িক বৈরাগ্য। হয়ত এ তাঁর নিছক মানসিক অভিমানের সাময়িক স্পষ্টোক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু কথাগুলো আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে বিমূঢ় করে রাখলো। সকলের শীর্ষে উঠে যাঁর এখনও এই বৈরাগ্য, তাহলে আমার অবস্থাটা কী? আমি যদি কখনও তাঁর পদে উন্নীত হই তাহলে কি আমারও ওই অবস্থা হবে? তাহলে কেন আমি এই দাসত্ব করছি? তাহলে কি চাকরির ক্ষেত্রে উঁচু-নিচুতে কোন প্রভেদ নেই? হুকুম তামিলের যন্ত্রণার খেসারত কি রজত-মুদ্রায় হয় না। বেতন আর পদ যা-ই হোক, দাসত্ব কি তাহলে দাসত্বই? তার কি অন্য ব্যাখ্যা নেই? দাসত্বের স্টীম-রোলারের চাপে কি বেতন, মর্যাদা, মনুষত্ব, পদ সব কিছুই গুঁড়িয়ে একাকার হয়ে যায়?

এর পরে আবার আর একটা ঘটনা ঘটলো।

ডিউটিতে খড়গপুর থেকে ট্রেনে চক্রধরপুর আসছি।

আমার কামরায় আমি একলা। ঘাটশীলায় ট্রেন থামতেই এক ভদ্রলোক আমার কামরায় উঠলেন। পরনে শার্ট প্যান্ট। হাতে স্টেথিসকোপ। বুঝলাম ভদ্রলোক ডাক্তার। তিনি যেচেই আলাপ করলেন আমার সঙ্গে। কোথায় বাড়ি, কী নাম তাই নিয়ে প্রশ্নোত্তর আদান-প্রদান হলো। তিনি বললেন তিনি ঘাটশীলাতে ডাক্তারি প্র্যাকটিস করেন। যাচ্ছেন গিড়নীতে একটা জরুরী কল-এ। সেখানে তাঁর এক রোগী আছে।

আমি তাঁর প্রশ্নে আমার নাম বলাতে তিনি বললেন তাঁর নাম নুট-বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারপর নিজে থেকেই বললেন—আমার দাদার নাম বললে আপনি হয়ত চিনতে পারবেন, তিনি একজন লেখক—.

–লেখক? আমি চমকে উঠলাম। কী নাম বলুন তো?

–বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার মনে হলো আমি যেন আমার চোখের সামনে ভূত দেখছি—। কিংবা আমারই প্রেতাত্মা বুঝি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে ব্যঙ্গ করছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই বয়েসেই আমি বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে চিনতাম। একবার একসঙ্গে এক ট্রেনের একই কামরায় তাঁর সঙ্গে ৺শরৎচন্দ্রের স্মৃতিসভায় দেবানন্দপুরে গিয়েছি। তাঁর লেখা তো মিষ্টি ছিলই কিন্তু মানুষটি যে তাঁর লেখার চেয়েও মিষ্টি ছিলেন তা আমার জানা ছিল। কিন্তু কথা তা নয়। কথাটা হলো এই যে তাঁর ভাই-এর কথা শুনতে শুনতে যেন আমার মনের ভেতরে অশান্তির যে বারুদটা লুকোন ছিল তা হঠাৎ জ্বলে উঠলো। আর সেই নুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই যেন তাতে অগ্নিসংযোগ করে দিলেন। আমার সমস্ত সত্তা সেই আগুনে দাউ দাউ করে পুড়তে লাগলো। আমার চোখের সামনে যেন আমার আমিটার সৎকার হতে লাগলো।

যতদূর মনে পড়ে তখন ১৯৪১ সালের শেষ দিক। যুদ্ধের দামামা তখন পৃথিবী জুড়ে কানে তালা লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে। তখনকার চক্রধরপুরে তখন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের একচ্ছত্র রাজত্ব। ব্রিটিশ-গভর্মেণ্টের প্রতাপের তখন পূর্ণমাত্রা। ইংরেজদের যত তেজ ইঙ্গ-ভারতীয়দের তেজ তার শতগুণ। তাদের পাশাপাশি একসঙ্গে আমরা কাজ করি। তাদের মনোভাব এই যে যেন তারা আমাদের প্রভুর জাত, আর আমরা তাদের

ভৃত্যগোত্রীয়, তা সে আমরা যে-পদই অধিকার করে থাকি না কেন, আর যত বেতনই পাই না কেন। তারা সমস্ত ইণ্ডিয়ানদের ওপর কড়া নজর রাখে। লুকিয়ে লুকিয়ে খবর নেয় আমরা হিটলারের জার্মানীর রেডিওর খবর শুনি কিনা, সুভাষচন্দ্র বোসের বক্তৃতা শুনি কিনা।

একে এই পরিবেশ, তার ওপর নিজের দাসত্বের লজ্জা আর তার ওপর আমার অতীত, সব কিছুর ঊর্ধ্বে শেষ মারাত্মক আঘাত পেলাম সেই ট্রেনের চলন্ত কামরায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই নুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তিনি যেন আমাকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন। বললেন—ছি ছি, তুই কিনা সাহিত্যিক হয়ে দাসত্ব করছিস?

মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের ছেলে যে অন্নগত-প্রাণ এ সত্য তো ইতিহাস বিদিত। বঙ্কিমচন্দ্র তো দূরের কথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও তো কিছুকাল চাকরি করেছিলেন। আর তুমি এমন কি তালেবর ব্যক্তি যে চাকরির ওপর তোমার এত ঘৃণা! কিন্তু স্যামুয়েল বাটলারকে তখন কোথায় পাই যিনি আমার দুঃখের কথাটা বুঝবেন। তিনি তো ১৯০২ সালে দেহত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ আমার জন্মেরও কতকাল আগে। তাহলে কী করি?

তখন যুদ্ধের জন্যে লোক নেওয়ার হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে চারদিকে। আরো সৈন্য চাই, আরো মানুষ। এমন মানুষ চাই যারা জাপানীদের উড়ো জাহাজের বোমার আঘাতে মরতে তৈরি। যারা প্রাণ দিতে পারবে জাপানীদের কামানের গোলার সামনে। তেমনি বশংবদ ইণ্ডিয়ান কে কোথায় আছো, এগিয়ে এসো।

আমি আর দেরি করলাম না। বাড়িতে ফিরে এসে ভাবলাম আর নয়। যে-জীবন দাসত্বের ঊর্ধ্বে উঠতে পারল না সে-জীবনের অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন নেই। সে জীবনের সমাধান একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুর মধ্যেই সম্ভব। চক্রধরপুরের স্টেশন মাস্টার ছিল তখন মিস্টার স্মলে। ইঙ্গভারতীয় সমাজের মধ্যে বেশ কেষ্ট-বিষ্টু। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাঁর। তিনি যুদ্ধের কিংস্-কমিশন পেয়ে তখন মেজর স্মলে হয়ে আর্মি হেডকোয়ার্টারের চার্জ নিয়ে চলে গেলেন। যুদ্ধে নতুন অফিসার নেওয়ার ভার তাঁর ওপরে। বাড়িতে সেই রাত্রেই এসে তাঁকেই একটা চিঠি লিখে দিলাম।

এতদিন পরে এই কাহিনী লিখতে গিয়ে ভাবছি কত অলৌকিক ঘটনাই না আমার জীবনে ঘটে গেছে। নইলে এত দিনে আমার সেই কর্মস্থলে

সংযুক্ত থাকলে কত নিশ্চিন্তভাবেই না জীবন কাটাতে পারতাম। মোটা পেনসন পেতাম, সারা জীবন বিনা-পয়সায় সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণের আরাম। এ-ছাড়া ছিল উইডো পেনসনের পাকা ব্যবস্থা। আমার কর্মস্থলে নিজের নাবালক ছেলেকেও একটা চাকরি করে দিয়ে শেষ জীবনটায় সুখে স্বচ্ছন্দে না হোক এই লেখার যন্ত্রণা থেকে তো মুক্তি পেতাম নিশ্চয়ই। কর্মস্থলে চারটে পরীক্ষা দিয়েই আমি আমার আসন পাকা করে নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন এই যে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি সে-চাকরিতে থাকলে এর থেকে তো অন্তত অব্যাহতি পেতাম।

কিন্তু তা হয়ত হবার নয়। চিরকালই 'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনখানে'র ইচ্ছা আমাকে প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরে তাড়না করে এসেছে বলেই একদিন চক্রধরপুরও আমাকে ত্যাগ করতে হলো। সকালবেলা চিঠিটা ডাকে দিতে যাচ্ছি, রাস্তায় খবর পেলাম কলকাতা থেকে আমার নাকি ডাক এসেছে। আমাকে ওদের সেখানে জরুরী প্রয়োজন। প্রথমে বিশ্বাস না হবারই মতো কিন্তু নিজের চোখে সে চিঠি দেখে বিশ্বাসই হলো। আমি তলপি-তলপা গুটিয়ে আবার একদিন কলকাতায় চলে এলাম। আগস্ট ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান ঘটেছে। তা আমি দেখতে পাইনি। শুধু দেখলাম আমার অজ্ঞাতসারে কলকাতার সমস্ত পটভূমিকা আমূল বদলে গিয়ে অন্যরূপ নিয়েছে। পুরোন বন্ধু-বান্ধবদের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হলো। কলকাতায় ফিরে এসে কর্মসূত্রে নানা অঞ্চলে আমাকে যেতে হতো। বিশেষ করে একটা ছাপাখানায় যাওয়া আমার প্রায় নিত্যকর্ম ছিল। পথে এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি আমাকে চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় ছিলেন এতদিন? লেখা-টেখা সব বন্ধ করে দিলেন নাকি?

অনেক বছর পরে সাহিত্য-জগতের একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা। যেন আত্মীয় মিলন ঘটলো।

বললাম—সাহিত্য রচনা চলছে এখনও?

—খুব চলেছে। যুদ্ধের প্রথম দিকে একটু ঝিমিয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু আবার তা পুরোদমে চলেছে, সবাই লিখছে, আপনিই শুধু বাইরে চলে গিয়েছিলেন—এখন কলকাতায় ফিরে এলেন, এখন আপনিও লিখুন না—

বন্ধু আবার লেখবার উৎসাহ দিলেন। হাঁটতে হাঁটতে আবার একদিন চলে গেলাম সেই তেরো নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়িটার সামনে।

চেয়ে দেখলাম উল্টোদিকের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরটার দিকে। দেখে অবাক হয়ে গেলাম। দেখি মন্দিরটার সংস্কার শুরু হয়েছে। রাজমিস্ত্রী খাটছে, চুনকাম হচ্ছে, রং লাগানো হচ্ছে। যেন সংস্কার-মুক্তির সংগ্রাম আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। বড় ভালো লাগলো দেখে। এত সংস্কার-মুক্তির আয়োজন চারিদিকে আর আমি কিনা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছি। আমারও তো এই সংগ্রামে ভূমিকা গ্রহণ করবার অধিকার আছে একটা। আমি এই সংগ্রামে সেনাপতি না হতে পারি, মন্ত্রী না হতে পারি, পদাতিকের ভূমিকা তো এতে নিতে পারি। অনায়াসেই বাড়ি এসে আবার সমস্ত পুরোন জঞ্জাল-স্তূপের মধ্যে অবগাহন করলাম। সেই বাংলাদেশের পুরোন ইতিহাসের নথি-পত্র। কিন্তু পুরো মন দিতে পারি না। কর্মস্থল আমার সমস্ত সময় মন সব কিছু কেড়ে নেয়। প্রয়োজন আমার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। প্রীতির জন্যে এতটুকু ঠাঁই ছেড়ে দিতেও সে রাজি নয়। প্রয়োজন তার গরজ নিয়ে আমার পশ্চাদ্ধাবন করে। প্রয়োজনের গরজে যা কিছু লিখি না কেন তা দরখাস্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। তাতে উদরপূর্তি হয়, তাতে সমাজে বেকার নাম ঘোচে। কিন্তু যার মনের বালাই বড় বালাই, যার মন বুভুক্ষু, যার মন বেকার হয়ে সমাজের উপেক্ষিত, সেই মনটাকে কী খেতে দিই? কী খাওয়ালে সেই মনের জঠর ভরে?

এই সময়ে আমার মনের সঙ্গে দেহের বিরোধ দেখা দিল। মনের সঙ্গে দেহের লড়াই বাধলো। প্রয়োজনের সঙ্গে প্রীতির। আগে যা বলেছি সেই সংস্কারের সঙ্গে সংস্কার-মুক্তির সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল।

আবার একদিন কালি-কলম নিয়ে বসলাম।

ঠিক এই সময়ে আপনার সঙ্গে আমার ঘটনাচক্রে আলাপ হলো। বোধহয় আপনার সে কথা মনে আছে। আপনি তখন নতুন, আর আমি পুরোন হলেও নতুন করে তখন পুরোন জগতে ফিরে এসেছি। সে-গল্প গত বছরের সাহিত্য সংখ্যায় (১৯৭৪) 'এক নম্বর বর্মন স্ট্রীট' নাম দিয়ে লিখেছি। আমার সেই 'আমীর ও উর্বশী' গল্পটা আমি ছাপাতে রাজি ছিলাম না কিন্তু আপনি জোর করে তা ছাপলেন। সে-কাহিনী নতুন করে আর এখানে বলার দরকার নেই। তবে এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে 'দেশ' পত্রিকায় সেই আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ। আর শুধু 'দেশ' সাপ্তাহিক নয়, সেই বছরে একসঙ্গে সব কটি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাতেই আমার একটা করে রচনা প্রকাশিত হলো। সবগুলোই সংস্কার-মুক্তির গল্প। অনেকদিন অব্যবহারেও মানুষের মনেও বোধহয় মরচে পড়ে।

শুধু অব্যবহারে নয়, অপব্যবহারে মনে মরচে ধরার আশঙ্কা থাকে। এতদিন মনের সেই অপব্যবহারই করে এসেছিলাম আমি। সেদিন সেখানেই যে থেমে যাইনি তার কারণ আপনি। আপনি আবার তাগিদ দিতে লাগলেন। আপনিই তাগিদ দিয়ে দিয়ে আরো রচনা আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে লাগলেন। শেষকালে একদিন বললেন—এবার একটা ধারাবাহিক উপন্যাস লিখুন—

উপন্যাস! আর ধারাবাহিক উপন্যাস! সে তো হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীতের মতন বড় শক্ত জিনিস। তার তাল লয় মূর্ছনা আছে, তার আলাপ তান সাপট-তান আছে, সে কি অত সহজ? সে কি আমি পারবো? সে তো ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ আর ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের দ্বারাই কেবল সম্ভব। সত্যিই সে কি আমি পারবো? যদি বেসুরো হয়, যদি তাল কাটে, যদি তান দিতে দিতে গলা বুজে আসে। তার ওপর আছে 'থার্ড ডাইমেনশন', অর্থাৎ যাকে বলা যায়, কাহিনী অতিক্রম করে কাহিনীর ঊর্ধ্বে উঠে একটা তৃতীয় বস্তুর ইঙ্গিত দেওয়া। সে তো টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, বালজাক, ডিকেন্স, রোঁমা রোঁলা পেরেছেন, কিন্তু সে কি আমার কলমে আসবে? যে-উপন্যাস শেষ হয়েও মনে হবে শেষ হলো না, যে-উপন্যাস পড়া শেষ করলে মনে হবে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর জগতের ঊর্ধ্বে আর এক ধ্রুবলোকে পৌঁছিয়ে গিয়েছি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীর ঊর্ধ্বে যেখানে পাঠকের সঙ্গে পাত্র-পাত্রীর সমস্ত বিচ্ছেদ ঘুচে গিয়ে এক অনাবিল আত্মোপলব্ধির সৃষ্টি হয়, সেই আনন্দ-স্রোতে আমি ভাসছি, যে উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে হবে আমি এতদিনে নিজেকে চিনলাম, লেখক আমার কথাই বেনামীতে লিখেছে, সে কোন্ লেখকের দ্বারা লেখা সম্ভব? সেই জাতীয় লেখক হতে গেলে যে যন্ত্রণা ভোগ করা অনিবার্য সেই যন্ত্রণায় কি আমি ভুগেছি? আমি তো কেন্দ্রীয় সরকারের মাসের পয়লা তারিখের নিশ্চিন্ত বেতনখোর অন্যতম একজন কর্মচারী। আমি তো স্লেভ, আমি তো দাস। প্রয়োজনের গরজের অব্যর্থ শিকার আমি। আর গরজই তো সংসারে সব চেয়ে বড় বালাই। সেই বালাই এড়িয়ে যেটুকু সময় পাই, তা আমার উপন্যাস লেখার পক্ষে কি যথেষ্ট?

মনে আছে তবু আমি চেষ্টা করলাম। দিনের বেলা দাসত্ব করি আর প্রায় সমস্ত রাতই জাগি। সে আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসের ঘটনা। যুদ্ধ থেমে গেছে এক বছর আগে। কিন্তু যুদ্ধের আনুষাঙ্গিক উৎপাত শুরু হয়েছে আমাদের জীবনে।

বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার ভেঙে চুরে তচনচ হয়ে গেছে। বাবা যদি থাকে বরানগরে, মা হয়ত থাকে খিদিরপুরে, বড় ছেলে কসবায়, আর ছোট ছেলে যাদবপুরে, কিংবা টালিগঞ্জে। একই সংসারে একই ছাদের তলায় জন্মে হঠাৎ সবাই তখন পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের এই সামাজিক পটভূমিকায় আমার উপন্যাস আরম্ভ হলো আপনার পত্রিকায়। তখনও আমি জানি না ধারাবাহিক উপন্যাস লেখার আর্ট। জানি না কী কৌশলে পাঠককে সপ্তাহের পর সপ্তাহ রুদ্ধশ্বাস কৌতূহলের নেশায় আকৃষ্ট করা যায়। আমি শুধু এইটুকুই জানতুম যে বর্তমান কালের পাঠক আর বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রের আমলের পাঠকের মধ্যে আজ আসমান-জমিন তফাৎ। তাঁদের আমলে তখন অবসর ছিল পাঠকের প্রচুর, অপেক্ষাকৃত সরল ছিল তার পারিপার্শ্বিক। আর তখন নব সাক্ষর পাঠকদের এত দৌরাত্মও ছিল না এখনকার মত। তবু তো স্বীকার করতেই হবে যে পাঠকের জন্যে সাহিত্য নয়, বরং সাহিত্যের জন্যেই পাঠক। সুতরাং আজকালকার কোনও সৎ লেখকের পক্ষে পাঠকের সম-স্তরে নেমে আসবার কোনও প্রশ্নই আসে না। একমাত্র সম্ভব যেটা তা হলো আঙ্গিকের কলাগত পরিবর্তন সাধন। সে আঙ্গিকের পরিবর্তন-সাধনের প্রয়োজন এই জন্যে অনিবার্য যে যাতে তার দ্বারা স্বল্প-অবসর পাঠকের কাছে লেখকের বার্তা অনায়াসেই পৌঁছে দিতে পারা যায়। আর সে এমন এক আঙ্গিক হওয়া চাই যা অতিব্যস্ত পাঠকেরও ঘুম কেড়ে নেবে, অত্যন্ত বিব্রত পাঠকেরও অশান্তি ঘোচাবে, তার সমস্যার ব্যাখ্যা করবে, তার সমস্যার কারণ বলে দেবে, তাকে পুনর্জন্ম দেবে।

এই সমস্ত কিছুই আমার জানা ছিল। কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত দুর্যোগ এসে আমার সমস্ত জানা নিষ্ফল করে দিলে। সবে মাত্র আমার সেই প্রথমতম উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে শুরু করেছে, ঠিক তার তিন সপ্তাহ পরেই হঠাৎ সারা দেশ জুড়ে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গেল। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সম্পর্ক যে কত নিবিড় তা সেদিন সঠিকভাবে বুঝতে পারলাম। লেখায় মনঃসংযোগ করা ক্রমশই কঠিন থেকে কঠিনতর হতে লাগলো। উপন্যাসের কিস্তি ঠিক মত সম্পাদকীয় দফতরে পৌঁছে দিতে পারি না। রাত্রের নৈঃশব্দ্য চৌচির হয়ে যায় 'আল্লা-হো-আকবর' আর 'বন্দেমাতরম' চিৎকারে। শহরে মৃতদেহের স্তূপ পড়ে থাকে দিনের পর দিন, মানুষ হত্যার উল্লাসে নৃশংস হয়ে পশুর আচরণ করে।

কিন্তু এতেও আমি দমিনি। সমসাময়িক ঘটনাস্রোতে জড়িয়ে পড়া সাংবাদিকদের কাজ, লেখকের পক্ষে তা ত্রুটি! লেখককে সব কিছু ঘটনা বা দুর্ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থেকেও মুক্ত থাকবার সাধনা করতে হয়। প্রাণপণে আমি সেই চেষ্টাই তখন করছিলাম। কিন্তু উপন্যাস যখন মাঝপথে তখন এল আর এক বিপর্যয়। বোধহয় আমার জীবনের চরমতম বিপর্যয় সেটা। উপন্যাস যখন মাঝপথে পৌঁছেছে সেই সময়ে আমি রোগাক্রান্ত হলাম। 'কোথা হাহন্ত চিরবসন্ত আমি বসন্তে মরি'। সত্যিই কোথায় রইল সেই উপন্যাস, আর কোথায় রইলাম আমি। সাহিত্যের জন্যে যখন নিরলস প্রয়াস করবার কথা তখনই আমার জীবনে হতাশ্বাসের দুর্যোগ নেমে এল। তখন আর আমার আত্মপ্রকাশের সমস্যা নয়, তখন বাঁচার প্রশ্নই প্রধান হয়ে উঠলো আমার কাছে। আর কী দীর্ঘ সেই সব যন্ত্রণা-কাতর দিনগুলো আর রাতগুলো। মাসের পর মাস যন্ত্রণা-বিদ্ধ অবস্থায় বিনিদ্র থাকার সে কী অভিশাপ তা প্রথম সেই-ই আমার উপলব্ধি হওয়ার সুযোগ হলো। জানতে পারলাম অর্থ এক-এক সময়ে মানুষের জীবনে শুধু প্রয়োজনই নয় আশীর্বাদও বটে। বুঝতে পারলাম মন নিয়ে সাহিত্যে যত বাড়াবাড়িই হোক দেহও অবহেলার বস্তু নয়। এই দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগবিলাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্যেই মানুষে-মানুষে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে যুগে যুগে এত বিরোধ। এই দেহকে অস্বীকার করে আমি আমার মনকে এত প্রাধান্য দিয়েছিলাম বলেই হয়ত আমার কাছে এই চরম শিক্ষার প্রয়োজন অনিবার্য হলো। তখন বুঝলাম মানুষের এই দেহ তার মনেরই আধার। এই দেহকে বাদ দিয়ে মনের পরিত্রাণ খোঁজা ব্যর্থ প্রয়াস। তাই তন্ত্র-সাধনায় দেহ নিয়ে এত বাড়াবাড়ি। সেই রোগ-যন্ত্রণাই যেন আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে যে 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার'।

সাত মাস যে দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করেছি তা যে-কোনও মানুষকে উন্মাদ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। চোখের অসুখ অনেকেরই হয়, কিন্তু চোখের ভেতরে বসন্তের গুটি হওয়া যে কী যন্ত্রণাদায়ক তার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো এমন ভরসা আমার নেই। আমি তত্দিনে মাঝপথেই ধারাবাহিক উপন্যাসের সমাপ্তি টেনে দিয়েছি, কিন্তু তবু যন্ত্রণা সমাপ্তির কোনও লক্ষণ নেই। এই সময়ে শ্রদ্ধেয় ডাক্তার নীহার মুন্সী আমার যে-উপকার করেছিলেন এখানে তার উল্লেখ না করলে অন্যায় করবার অপরাধে অপরাধী হবো।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণার একদিন উপশম হলো। যন্ত্রণা দূর হলো বটে কিন্তু আমার একটা চোখের দৃষ্টি চিরকালের মতো অকেজো করে দিয়ে তবে দূর হলো। জীবনে কিছু পেতে গেলে কিছু-না-কিছু মূল্য তার জন্যে দিতেই হয়। নতুন যে জ্ঞান পেলাম আমার একটা চোখের দৃষ্টিই হয়তো তার সেই মূল্য। একটা চোখের দৃষ্টি দিয়েই আমি দেখতে পেলাম আর এক নতুন পৃথিবীকে। সেই নতুন পৃথিবীতে আবার নতুন করে যখন জন্মগ্রহণ করলাম তখন দেশে পালা বদলের পালা শেষ হয়ে গিয়েছে। ইংরেজ গেছে, কিন্তু তাদের ফেলে যাওয়া জঞ্জাল-স্তূপ জড়ো করে আমরা তাই-ই পুজো করতে শুরু করেছি। সেখানে পাপ-পুণ্যের অর্থ বদলে গেছে, সৎ-অসতের বাখ্যার হের-ফের হয়েছে। দেশ তখন স্বাধীন!

চিকিৎসক আমার চোখের দৃষ্টি পরীক্ষা করে রায় দিলেন যে, সূর্যাস্তের পর লেখা-পড়ার কাজ আমার জন্যে চিরকালের মত নিষিদ্ধ রইল। এ নির্দেশ অমান্য করলে আমার অন্য চোখটাও যাবে। কিন্তু তা-ই যদি হয়, তবে আমার জীবিকার কী হবে? এমন কোনও জীবিকা কি আছে যাতে চোখের দৃষ্টির প্রয়োজন অনিবার্য হবে না?

অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, হ্যাঁ তাও আছে। সেই সময়ে ভারত-সরকারের অধীনে একটা নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। বিভাগটির কাজ সমাজের দুর্নীতি নিরোধ। সরকারী-কর্মচারীরা যে-দুর্নীতির সঙ্গে সাধারণত জড়িত থাকে তার মোকাবিলা করে তা উচ্ছেদ করাই তাদের প্রধান কাজ। বিভাগটির নাম সেণ্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন। বাঙলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা। তখন নাম ছিল স্পেশাল পুলিশ এসট্যাবলিশমেন্ট। তাঁদের প্রধান কাজ গুপ্তচর-বৃত্তি। কে কোথায় উৎকোচ গ্রহণ করছে তার সন্ধান নাও। তার পরে যথা সময়ে ফাঁদ পেতে তাকে গ্রেফতার করো। আর তার পরে মামলা করো তার নামে, কোর্টে চালান দাও আসামীকে।

এর কেন্দ্রীয় দফতর ছিল দিল্লীতে। এখনও তাই-ই আছে। সেখানে থাকেন বিভাগের বড়কর্তা। কিন্তু কলকাতা দফতরের যিনি ছিলেন তখন সর্বেসর্বা তাঁর নাম রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এ খবর দিলেন আমার এক ভাবী প্রকাশক। প্রকাশক মশাই নিজেই একদিন আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। আমার চোখের অবস্থার কথা বুঝিয়ে বললেন তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে এক চিঠি। সেই একখানা চিঠিতেই

কাজ হয়ে গেল। আমি সেই দিন থেকেই বদলি হলাম নতুন বিভাগে। দুর্নীতি-নিবারক অফিসার। লেখা-পড়ার কাজ কিছু নেই। শুধু আকাশ-পাতাল ঘুরে বেড়ানো আর সপ্তাহান্তে আমার কর্তাকে লিখিত খবর দেওয়া সাত দিনে আমি কী করেছি, কোথায় গিয়েছি আর দুর্নীতি নিবারণের জন্যে কতটুকু কী চেষ্টা করেছি। এ জীবিকা কিছুদিন কলকাতায় করার পর আমার পুরোন জায়গা মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরে বদলি হলাম।

আমার রচনায় যদি সৎ-অসৎ পাপ-পুণ্য ভালো-মন্দ প্রাধান্য পেয়ে থাকে তাহলে নতুন এই বিভাগের কর্মই তার জন্যে যা-কিছু কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। বিলাসপুরে গিয়ে আমার প্রথমেই যেটা নজরে সেটা এই যে পড়লো মানুষের একটা অংশের কাছে আমি অত্যন্ত অপ্রীতিভাজন।

রাস্তায় দেখা হলেই একদল আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। নানা মিষ্টি কথায় আপ্যায়ন করে। আমার শুভাশুভ সংবাদ নেয়। আবার আর একদল আমাকে দূর থেকে দেখেই অলক্ষে অদৃশ্য হয়। যেন আমি তাদের অস্পৃশ্য।

এই কর্মোপলক্ষে কত রকম মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যে আমাকে আসতে হয় তা বললে বিচিত্র শোনাবে। চোর, গুণ্ডা, জুয়াড়ী, নেশাখোর, মাতাল, লম্পট, ঘুষখোর, বেশ্যা,—কে নয়? আসলে আমার উদ্দেশ্য ছিল যারা বেশি বেতনের কর্মচারী তাদের গ্রেফতার করা। আমার ওই ক' বছরের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যাদের বেশি আছে তাদেরই বেশি লোভ। তখন সবে স্বাধীন হয়েছে দেশ। আমাকে ট্রেনে ঘুরে ঘুরে প্রায় সারা ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রামে-গঞ্জে যেতে হতো। আমার হেড-কোয়ার্টার বিলাসপুর আর আমার ঠিক ওপরেই যিনি কর্তা, তাঁর দফতর জব্বলপুর। দুই কি তিন মাস অন্তর যদি কখনও প্রয়োজন বোধ করি তো দফতরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করি। তাঁর কাছে উপদেশ নিই। নেপিয়ার টাউনে একটা নিরিবিলি ডাক্-বাংলোয় আমার আস্তানা গাড়ি। সঙ্গে থাকে একজন আর্দালি। সে এক অদ্ভুত জীবন-যাত্রা তখন আমার। তখন আমিই বা কে আর শাহেন্ শা আলমগীর বাদ্শাই বা কে? আমার তখন যেখানে যত দূর ইচ্ছে ঘুরে বেড়াবার অধিকার। চারটে দেয়ালের ভেতরে বাঁধা সময়ের বন্দী আর নই আমি। আমি ইচ্ছে করলে চার দিন চার রাত বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে পারি। আমার কাছে এমন একটা ছাড়পত্র আছে যা দেখালে আমি যে-কোনও ট্রেনের যে-কোনও

কামরায় উঠতে পারি। কেউ ঠেকাবার 'নেই। আমার গতিবিধি অবারিত।

বহুদিন পরে একদিন বাড়িতে পৌঁছে দেখি কে একটা আনকোরা নতুন সাইকেল রেখে দিয়ে গেছে। কার সাইকেল, কেন সে তা আমাকে দিয়ে গেল, কীসের প্রয়োজনে, তা বোঝা গেল না। বাইরে শহরের অনেককেই জিজ্ঞেস করলাম, কেউই তার সদুত্তর দিতে পারলে না। স্টেশনের রিফ্রেশমেণ্ট রুমের ম্যানেজার মিস্টার বোস বললেন—আপনি ওটা ব্যবহার করুন, আপনার ব্যবহারের জন্যেই ওটা দিয়েছে আপনাকে।

কিন্তু আমি জানতুম ওটা যে-ই দিক, ওটা দেওয়ার অর্থ আমাকে খুশী করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। সামান্য একখানা সাইকেল নিয়ে আমি খুশী হবো এমন ধারণা যার সে-মানুষটা যে চোর বা ঘুষখোর তা অনুমান করে নিতে আমার বিশেষ বেগ পেতে হলো না।

ফুড্ অফিসার মিঃ আনসারি বললেন—লে লিজিয়ে মিত্র সাব, ও আপ্‌কা হ্যায়—

একজন ঠিকাদারের উনিশ হাজার টাকার সরষের তেল বাজেয়াপ্ত করেছিলাম ভেজাল বলে। সেই ঠিকাদারের লোক আমার বাড়ির সামনে রোজ ঘুর-ঘুর করতো। তার ইচ্ছে আমি তাকে ডাকি, তার সঙ্গে কথা বলি। একদিন তাকে ডেকে ধমকে দিলাম।

বললাম—তুমি কী চাও? আমার বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করো কেন?

লোকটা বড় শয়তান। হি-হি করে হাসতে লাগলো। বললে—হুজুর আপনার ঘরে ফার্নিচার নেই, আপনি শনিচরি-বাজারে অর্ডার দিয়ে ফার্নিচার বানিয়ে নেন, আমি দাম মিটিয়ে দেব—

বিচিত্র সব ঘটনা ঘটতে লাগলো আমার জীবনে। শেষকালে একদিন একজন সোনার একটা ইঁট নিয়ে এল আমার বাড়িতে। তখন অনেক রাত। আমি তো দেখে অবাক। আমার হাতেই কি শেষকালে হাত-কড়া পড়বে নাকি?

অনেকদিন পরে একদিন বাড়িতে এসে শুনি কে এসে সাইকেলটা নিয়ে চলে গিয়েছে। হয়ত বুঝেছে আমাকে দিয়ে তার কোন লাভ হলো না। কারণ তার দুদিন আগেই সরকারি গ্রেন-শপের পনেরোজন কর্মচারী চুরির অপরাধে আমার হাতে ধরা পড়েছে। 'নইলা' গ্রামের একজন উকিল সাহেবকে একদিন ধরলাম। সে জোর করে সরকারী কর্মচারীকে ঘুষ নিতে বাধ্য করতো আর গভর্মেণ্টকে ঠকাতো। মনে আছে এই ব্যাপারে

রাষ্ট্রপতির তরফ থেকে একটা প্রশংসা-সূচক অভিজ্ঞান-পত্রও দেওয়া হয়েছিল আমাকে।

পেণ্ড্রা রোড স্টেশনের একজন পি-ডবল্যু-আই-কে (পার্মামেণ্ট-ওয়ে ইন্‌সপেকটার) যখন হাতে-হাতে গ্রেফতার করা হলো সে ভদ্রলোক কেঁদে পড়লো আমার পায়ের ওপর। বললে—আপনি বাঙালী হয়ে বাঙালীকে ধরলেন, আমি এখন কী করে সমাজে মুখ দেখাবো ?

এই রকম অসংখ্য ঘটনা। আপনাকে এ সব তালিকা বলতে গেলে আজকে আর শেষ হবে না। বললে রাত কাবার হয়ে যাবে। কোথা দিয়ে যে দিন আর রাতগুলো কাটতে লাগলো তার আর হিসেব থাকতো না তখন। তখন গানের আর সাহিত্যের জগৎ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছি। চোখে আমার একটা গান্‌-গ্লাস আর পরনে কোট-প্যাণ্ট, মাথায় টুপি। মধ্যপ্রদেশের জলবায়ু লেগে আমার চেহারার অন্যরূপ হয়ে গেছে। আমি পুলিশ, আমি প্রহরী। মানুষের দুর্নীতি-রোধ করবার ব্রত নিয়ে চোখের অসুখের যন্ত্রণা ভুলছি।

এমন সময় রাস্তায় একজন বাঙালী ভদ্রলোক একদিন আমাকে হঠাৎ বললে—'দেশ' সাপ্তাহিকে আপনার একটা কবিতা পড়লুম, বিমলবাবু খুব ভালো হয়েছে—

আমি তো অবাক! আমি কবিতা লিখেছি 'দেশ' পত্রিকায়! গল্প নয়, প্রবন্ধ নয়, উপন্যাস নয়, কবিতা! আমি কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, কবে আমি কবিতা পাঠিয়েছি আপনার কাছে। তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফরমের ওপর হুইলার এর দোকানে গিয়ে দেখি যা শুনেছি সত্যি! কবিতাই বটে।

আমার মনটা যন্ত্রণায় টন্‌টন্‌ করে উঠলো। সেই রাত্রেই জব্বলপুরের নেপিয়ার টাউনের ডাক-বাংলোয় বসে একটা চিঠি লিখলাম আপনাকে। লিখলাম আপনি আমার এ কী করলেন ? আমার নামের কবিতা কেন ছাপলেন ? এককালে আমি একজন লেখক ছিলাম। লোকে জানতো সে লেখকের মৃত্যু হয়েছে। সেই-ই তো ভালো ছিল। সত্যিই আপনি আমার এ কী করলেন ? আমার প্রেতাত্মাকে দিয়ে এ প্রহসন কেন করালেন ?

বড় অদ্ভুত জবাব এল আপনার কাছ থেকে। আপনি জবাবে আমাকে জানালেন যে আমি যদি লেখা না পাঠাই তো আপনি ওই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি করবেন। সুতরাং আমাকে লিখতেই হলো। কবিতার উত্তরে

কবিতাই লিখলাম।, নেপিয়ার টাউনের সেই ডাকবাংলোতে বসে বহুদিন পরে আবার সেই কবিতাই লিখলাম। এবং কবিতাটা ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে জানালাম যে গল্পও পাঠাচ্ছি পরের ডাকে।

ততদিন দুর্নীতি নিবারণের কাজে আমি কতটুকু কী করতে পেরেছি তা এখানে বলা ভালো। মনে আছে বোধহয় তেত্রিশজনেরও বেশি ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত আমার কৌশলের ফলে গ্রেফতার বরণ করলো। সে-সব সেই স্বাধীনতার প্রথম যুগের ঘটনা। আমার অভিজ্ঞতায় দেখলাম যে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি এমন ভাবে অনুপ্রবেশ করেছে যে তা দূর করা আমার সাধ্যের বাইরে। এমন কি আমার নিজের দফতরের মধ্যেই ছিল দুর্নীতি। অর্থাৎ সরষের মধ্যেই ভূতের লীলা চলছে। স্বাধীনতার আগের যুগও দেখেছি, তার পরের যুগের তিক্ত অভিজ্ঞতাও আমার তখন হলো। দেখলাম সততা বজায় রেখে ওই চাকরিতে আর টিঁকে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। উচ্চপদস্থ অফিসারদের মধ্যেই যেন দুর্নীতির প্রাবল্য বেশি। অর্থ উপার্জনের নানা পন্থা আবিষ্কার করে পদস্থ অফিসারদের গৃহিণীরা পর্যন্ত যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতার খেলায় মেতে উঠেছে। কোনও অধস্তন কর্মচারী যদি সরকারী কোনও কাজে কলকাতায় যায় তো ফিরে আসবার সময়ে বড় সাহেবের গৃহিণীর জন্যে তাকে কপি, কড়াইশুঁটি, গল্‌দা চিংড়ি বা নলেন গুড়ের পাটালি সঙ্গে করে আনতে হবে। তার দাম? দাম তুমি তোমার নিজের পকেট থেকে এখন দাও, তাতে ভবিষ্যতে চাকরিতে তোমার উন্নতি হবে! একটা মালগাড়ির ওয়াগনের জন্যে ঘুষের বাজারদর তখন ছিল আট শো টাকা। তুমি সে ওয়াগন শালিমারে পাঠিয়ে চড়া দরে মাল বেচো। তাতে যদি পাবলিক মরে তো মরুক ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার ন্যায্য ঘুষ চাই। আর সে ঘুষ নেওয়ার পদ্ধতিও ছিল বড় অদ্ভুত। কোন্ দালালের হাত দিয়ে কত কৌশলে যে তা বড় সাহেবের হাতে গিয়ে পৌঁছতো তার খবর আমার কাছে ছিল, কিন্তু আমাদের দুর্নীতি-নিরোধ আইন তখন এত দুর্বল ছিল যে, তাদের ধরা-ছোঁওয়া ছিল আমার সাধ্যের বাইরে। আর আজ বলতে বাধা নেই সেদিন সেই বড় কর্তারাই ছিল দুর্নীতির সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগী। তাঁরা আমার সহযোগিতা তো করতেনই না, বরং আমার মুখের সামনেই বলতেন—এ চাকরি কেন করছেন, পরের সর্বনাশ করে আপনার কী লাভ হচ্ছে?

যাঁরা এ-সব উপদেশ আমাকে দিতেন পরবর্তীকালে দেখেছি তাঁদেরই

আরো পদোন্নতি হয়েছে। কেউ কেউ পদ্মশ্রী উপাধিও পেয়েছেন। মনে আছে যুদ্ধের আমলে দফতরের মধ্যেই আমাদের কানের কাছে নেতাজীকে গালাগালি দিয়ে যাঁরা আমাদের মনঃপীড়ার কারণ হয়েছেন, সেই বড় কর্তারাই আবার নেতাজী-জন্মোৎসবের দিনে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি ও টুপি পরে সভায় দাঁড়িয়ে সকল শ্রোতাকে নেতাজীর আদর্শ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে লেকচারবাজি করছেন।

যাক, হয়ত এই সব অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন ছিল আমার। পরবর্তী-কালে যখন আমাকে পলাশীর যুদ্ধের আমল থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত দু'তিনশো বছরের ইতিহাস নিয়ে খণ্ডে খণ্ডে ধারাবাহিক উপন্যাস লেখবার কাজ করতে হয়েছে, তখন এই চোখে দেখা ঘটনাগুলো আমাকে প্রচুর উপকরণ যুগিয়েছে। এর জন্যে সেদিনকার সেই কর্ম-জীবনের কাছে আমি অনেকাংশেই ঋণী।

জব্বলপুরের সদর দফতর থেকে আমার কাছে প্রায়ই চিঠি আসতো আমি যেন প্রত্যেক নতুন শহরে প্রত্যেক গ্রামে গঞ্জে গিয়ে সেখানকার মণ্ডল কংগ্রেস বা জেলা-কংগ্রেসের সভাপতিদের সঙ্গে দেখা করে সেখানকার সন্দেহজনক লোকদের সন্ধান নিই। কিন্তু আজ এতদিন পরে স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করছি যে, তখন তাঁদের কাছ থেকেও আমি কোনও সহযোগিতা পাইনি। কিন্তু তা বলে ভালো লোক কি তখন ছিল না? ছিল বৈকি! নিশ্চয়ই ছিল। সেই সৎ মানুষদের কথাও আমি লিখেছি। কিন্তু তাঁরা ছিলেন মুষ্টিমেয়। কালের ইতিহাস তো সেই মুষ্টিমেয়দের জন্যেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে।

চোখের যন্ত্রণা তখন আর নেই, তার ওপর চিঠির পর চিঠি। আপনি লেখলেন—বিলাসপুরে গিয়ে কি বিলাসী হয়ে গেলেন?

আসলে বোধহয় উপন্যাস লেখবার একটা উপযুক্ত বয়েস আছে। চল্লিশের আগে সাধারণত উচ্ছ্বাসেরই প্রাবল্য থাকে মানুষের কলমে। উচ্ছ্বাস ভালো কিন্তু তার প্রাবল্য উপন্যাস লেখকের পক্ষে মারাত্মক। পৃথিবীর উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাস সেই উচ্ছ্বাস-হীনতার ইতিহাস লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ চল্লিশের পর সেই উচ্ছ্বাসকে স্তিমিত করতে সাহায্য করে বলেই পণ্ডিতেরা মত ব্যক্ত করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে আমার বেলায় সেই দুঃখ-যন্ত্রণাভোগের পাত্র ততদিনে এত কানায়-কানায় পূর্ণ হয়েছিল যে ছোটবেলায় যা ছিল নৈরাশ্য তা তখন বীতরাগে পরিণত হয়েছে। জীবনের ওপর বীতরাগ,

কর্মজীবনের ওপর বীতরাগ, কর্তব্যের ওপর বীতরাগ, এমন কি আমার সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গীত বা সাহিত্যের ওপরেও বীতরাগ এসে গিয়েছিল। জীবনে আমি কী করতে চেয়েছিলাম আর কী করছি তা চিন্তা করেই দিন কাটাতো।

কিন্তু আপনার ওই রকম চিঠিগুলো পেয়ে পেয়েই আবার যেন আশার নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। আপনার চিঠিগুলো আমার জীবনে সঞ্জীবনী-মন্ত্রের মত ক্রিয়া করলো।

আমি আবার সাহিত্য-রচনা শুরু করবো বলে চেষ্টা-চরিত্র করে একদিন কলকাতায় বদলি হয়ে এলাম। চাকরির জীবনে বলতে গেলে এও একরকম অসাধ্যসাধনের মত। তবু বলবো আমার ধৈর্যকর্মক্ষমতা সহনশীলতা হয়ত আমার ভাগ্যদেবতাকে খুশীই করেছিল। কিংবা হয়ত অনেক যন্ত্রণা দিয়েও যখন তিনি দেখলেন যে এ মানুষটাকে কিছুতেই জব্দ করা গেল না, রোগেভোগেও যখন এ ম্রিয়মাণ হলো না, এত লোভ দেখিয়েও যখন একে শায়েস্তা করা গেল না, তখন অনন্যোপায় হয়ে বোধহয় তিনি নিজেই পরাভব স্বীকার করলেন। কিংবা হয়ত আমাকে কঠিনতর অন্য এক পরীক্ষায় নামাবার জন্যে অন্য এক নতুন ফন্দি আঁটলেন।

হ্যাঁ, আমি ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে আবার কলকাতায় ফিরে এলাম। আগেই তো আপনাকে বলেছি ছোটবেলা থেকে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে ঘুরতে ঘুরতে আমার পায়ে পাখা গজিয়ে গিয়েছিল। হিন্দিভাষায় একটা প্রবাদ আছে—চরণমে নারদ হ্যায়। নারদঋষি বোধহয় আমারও পায়ে ভর করেছিল। নইলে কে আমায় অত ঘোরালে? এবার মনে করলাম—না, কলিকাতা পরিত্যজ্যং পাদমেকং ন গচ্ছামি। তাতে অর্থ হয়ত পাবো না, কিন্তু পরমার্থ পেয়ে হয়ত বাঁচবো।

কলকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই কী জানি কেন গাদা-গাদা গল্পের কাঁচা মাল আমার মধ্যে গজ-গজ্ করতে আরম্ভ করলো। আপনাকে জানাতেই আপনি বললেন ওগুলো সমস্ত 'দেশ' সাপ্তাহিকের জন্যে সংরক্ষিত থাক। এক এক করে ছাড়বেন—

তাই-ই করতে লাগলাম। ঘটনাচক্রে কলকাতায় এসে দেখলাম সাবেক আমলের ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীটা নতুন নাম নিয়ে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী হয়ে আমার বাড়ির পাশেই বড়লাট সাহেবের বাড়িতে ঠাঁই নিয়েছে। এ যেন সেই মহম্মদের কাছে পর্বতের আসা। অন্ধকার প্রাসাদ, তার ভেতরে

যে অত আলো তা আগে জানতাম না। ঢালাও ব্যবস্থা সেখানে। তখন না আছে সেখানে কোনও সময়ের বাঁধা নিয়ম, না আছে কোনও রকমের কড়াকড়ি। তুমি সেখানে গিয়ে বই পড়লেই কর্তৃপক্ষ খুশী। কর্তৃপক্ষও চান যে সবাই সেখানে আসুক। তাতে তাঁদেরও চাকরি বাঁচে। তখন ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী সকাল ছটা সাতটা থেকে শুরু করে রাত এগারোটা পর্যন্তও খোলা থাকতো। পরে অবশ্য সে-নিয়ম বদলালো।

'আনন্দমঠে'র গোড়াতেই একটি উপক্রমণিকা আছে। গভীর অরণ্যের মধ্যে অন্ধকার মধ্যরাত্রে একজন মানুষের কণ্ঠের শব্দ উচ্চারিত হলো—আমার কি মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না?

প্রশ্ন এল—তোমার পণ কী?

—জীবনসর্বস্ব।

—জীবন তো তুচ্ছ। আর কী দিতে পারো?

উত্তর এল—ভক্তি!

বঙ্কিমচন্দ্রের উপক্রমণিকা এইখানেই শেষ।

কিন্তু আমারও মনে হলো এতদিন সাহিত্যের জন্যে সমস্তই দিয়েছি বটে, কিন্তু তবু কিছুই যেন দিইনি। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো শুধু দাসত্বেই ব্যয় করেছি। কাজ করছি এমন একটা প্রতিষ্ঠানে যার হাজার-হাজার লক্ষলক্ষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আমার অনুপস্থিতিতে সেখানে কিছুই অচল হবার নয়। আমার উপস্থিতিও সেখানে অনিবার্য নয়। আমার উপস্থিতি ব্যতিরেকেও কর্মস্থলের চাকা নিয়ম করে গড়িয়ে চলবে। সরকারী দফতর সহস্রপদী। তাই-ই যদি সত্যি হয় তাহলে কেন সেখানে নিয়ম করে যাই? কথাটা ভাবতে গিয়ে আমিও যেন কেমন একটা মানসিক নিষ্কৃতির স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি। কেবল মনে হয় আমি যেখানে অনিবার্য নই সেখানে আমার অনুপস্থিতিও নিশ্চয়ই মার্জনীয়।

এই অবস্থায় আপনি একদিন বললেন—আপনি আর একটি ধারাবাহিক উপন্যাস শুরু করুন—

এবার এটাই 'দেশ' সাপ্তাহিকে আমার দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রথম সন্তান প্রসবের সময় মায়ের মনে যত আতঙ্ক বা বেদনা থাকে, দ্বিতীয় সন্তানের সময় অতটা থাকে না। কিন্তু আমার বেলায় সে-নিয়ম কখনও খাটেনি। আতঙ্ক বেদনা অস্বাচ্ছন্দ্য আমার জন্মসঙ্গী। সেই বাল্যকালে যেদিন প্রথম লিখতে শুরু করেছি সেদিন থেকেই ওগুলো আছে। এতদিন বয়েস বেড়েছে, অভিজ্ঞতাজনিত জ্ঞানও বেড়েছে, নিন্দায়

প্রত্যাখ্যানে অবহেলায় কুৎসা পেয়ে পেয়ে মন কঠোরতর হয়েছে, কিন্তু যন্ত্রণা বেদনা যায়নি। কেন যে এত বেদনা কেন যে এত যন্ত্রণা তা আমার সৃষ্টিকর্তাই কেবল জানেন। উপন্যাস লেখার সময় আমি আগে যেমন যন্ত্রনায় কাতর হতাম আমার এই দ্বিতীয় উপন্যাস লেখার সময় তা দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, সহস্রগুণ হয়ে আমাকে চারপাশ থেকে আক্রমণ করলো। এবারে যেন আর চোখের যন্ত্রনায় আমাকে মাঝপথে উপন্যাসের সমাপ্তি না ঘটাতে হয়। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ত্রিফলার জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলতাম। মাত্র একটা চোখের দৃষ্টি দিয়ে কাজ, তার ওপরেই নির্ভর।' 'অল্প লইয়া থাকি তাই যাহা যায় তাহা যায়'। সুতরাং সরকারী দফতরে আমাকে কাজে ফাঁকি দিতে হয়। সংসার পরিবার সমাজ আত্মীয়-স্বজন সকলের সমস্ত দাবিকে উপেক্ষা করে আমার যাত্রা আরম্ভ করতে হয়। চারিদিকের বৃহৎ পৃথিবীর আর নিরবধি কালের দাবিটাই সামনে রেখে এগিয়ে চলি। সংসার পরে দেখবো, আত্মীয়স্বজনের কাছে অপ্রিয় হবো তাতেও পরোয়া নেই, কিন্তু নিজের ইচ্ছের পৃথিবীর দাবিটাকে আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখবো ?

তখনই 'আনন্দমঠের'র ওই 'ভক্তি'র কথাটা মনে পড়লো। জীবনসর্বস্ব পণ করলেই যথেষ্ট পণ করা হবে না। জীবনসর্বস্বের চেয়েও বড় হলো ভক্তি। সেই ভক্তি দিতে হবে। সেই ভক্তি দিতে গেলে চাই বিশ্বাস। আর শুধু বিশ্বাস নয় অটুট অকপট বিশ্বাস চাই।

দফ্তরে যাবার জন্যে সোজা বাড়ি থেকে বেরোই, কিন্তু মাঝপথে গন্তব্যস্থল পরিবর্তন করে চলে যাই লাইব্রেরীতে। লাইব্রেরীতে গিয়ে মনে হয় লেখক ছাড়া আর কোনও দ্বিতীয় সত্তা নেই আমার। সেখানে আমি স্বামী নই, পিতা নই, একজন সামাজিক মানুষও নই আমি, এমন কি তুচ্ছ সরকারী কর্মচারীও আমি নই। আমি স্বাধীন। সেখানে আমি শুধুই স্বাধীন লেখক একজন। লেখকসত্তাই সেখানে আমার একমাত্র সত্তা। লিখতে লিখতে আমি কল্পনায় চলে যাই সেই কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের তের নম্বর বাড়িটার সামনে। উল্টোদিকে ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরটা। সেখানে দাঁড়িয়ে সংস্কার আর সংস্কারমুক্তির সংগ্রামের শরিক হই। চোখের সামনে দেখতে পাই কলকাতা জুড়ে মানুষের ভিড় জমেছে। সে-কলকাতা আমাদের এ-কলকাতা নয়। আর এক কলকাতার আর এক রূপ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই ১৬৯০ সালের জোব-চার্নকের কলকাতা তখন চেহারা বদলাতে বদলাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে

এসে পৌঁছেছে। ইংরেজরা এসে ভগীরথের সেই গঙ্গার নাম দিলে হুগলী নদী যাকে আমরা বলতাম ভাগীরথী। প্লিনির আমল থেকেই সপ্তগ্রামের পাশের নদীকেই বলতো দেবী সুরেশ্বরী সঙ্গে। তারপর উত্থান আর পতনের অমোঘ নিয়মে যেদিন সাতগাঁর পতন হলো, মাথা উঁচু করে উঠলো হুগলী, সেদিন পর্তুগীজদের কল্যাণে ভাগীরথীর নাম বদলে গিয়ে হলো হুগলী নদী। সেই কলকাতার ঊনবিংশ শতাব্দীর বুকে একদিন শেয়ালদা স্টেশনে এসে একটা স্পেশ্যাল ট্রেন থামলো আর তা থেকে নামলো এক গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী। যে সন্ন্যাসীটি এই কলকাতারই ছেলে। যে সন্ন্যাসীটি আমেরিকায় যাবার সময়ে বলেছিল "I go forth to preach a religion of which Budhism is but a rebel child and Christianity is but a distant echo"। লিখতে লিখতে মশগুল হয়ে যাই আর কখন যে রাত দশটা বেজে যায় খেয়াল থাকে না। লাইব্রেরীর দরোয়ান সতর্ক করিয়ে দেয়—"বাবুজী, রাত দশ বাজ গয়া—"

তখন সময়ের কড়াকড়ি ছিল না লাইব্রেরীতে। যে যতক্ষণ ইচ্ছে বসে লেখাপড়া করতে পারতো। কড়াকড়ি হলো ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে। তখন রাত আটটার মধ্যেই সদর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সকলকে তখন ঘর থেকে বার করে দেওয়া হয়। কিন্তু ততদিনে জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষা আমার সমাপ্ত হয়ে গেছে। ততদিনে আমার সেই দ্বিতীয় ধারাবাহিক উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ লিখে শেষ করে ফেলেছি।

পাণ্ডুলিপির শেষ কিস্তিটা নিয়ে আমি বাড়ি থেকে একদিন দুপুরবেলা আপনার দফতরের উদ্দেশে রওনা দিলাম। কিন্তু, ক্লান্তিতে অবসাদে আমি তখন অবসন্ন। আমার পা আর চলতে চায় না তখন। সুরসপ্তকের শেষ পর্দায় এসে পৌঁছতেই তবলচি তেহাই দিয়ে তখন গানের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে, আর গায়কও সঙ্গে এসে পৌঁছে তার ক্ষীণ স্বর ক্ষীণতর করে গানের শেষ রেশটুকু টেনে চারদিকের আবহাওয়ায় সুরের তরঙ্গ মিলিয়ে দিচ্ছে।

আপনি আর আপনার সহকারী জ্যোতিষ দাশগুপ্ত আপনার পাশেই বসেছিলেন। আপনারা দুজনেই আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টি দিয়ে চাইলেন।

—কী হলো? চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন?

মনে আছে কিছুক্ষণ আমার মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোয়নি। আমি তখন নিঃস্ব রিক্ত সর্বস্বরহিত। কিছুক্ষণের জন্যে যেন আমিও

বোবা হয়ে গিয়েছি। আমার বোধশক্তি বাকশক্তি সব কিছু যেন তিরোহিত হয়ে গিয়েছে। তখন যেন চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে গেছে আমার। প্রকৃতপক্ষে তখন আমার কাঁদাই উচিত ছিল, কিন্তু তখন আমার চোখের জলও বুঝি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হচ্ছিল এতদিন যার সঙ্গে আমি ঘর-সংসার করেছি, যে-ছিল আমার সর্বক্ষণের সঙ্গিনী, যে-ছিল একান্তই আমার নিজস্ব সম্পদ সেই 'পটেশ্বরী'কে যেন আমি হাটের সকলের নির্লজ্জ লোভাতুর দৃষ্টির সামনে নিয়ে গিয়ে নিরাভরণ করে ছেড়ে দিলাম।

আর এই দ্বিতীয় উপন্যাস 'সাহেব বিবি গোলাম'ই বলতে গেলে আমার কাল হলো। কাল হলো এই জন্যে বলছি যে এই উপন্যাস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি এমন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম যার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমার মনে হলো আমার ভাগ্যবিধাতার বিচারে যেন আমার ওপর অমোঘ মৃত্যুদণ্ড নেমে এল। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কাগজে ছাপিয়ে আমার কাছে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া শুরু হতে লাগলো। তাদের কারো অভিযোগ আমি শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা থেকে আত্মসাৎ করেছি, কেউ বা অভিযোগ করলেন অন্য কোনও অখ্যাত লেখক তাঁর পাণ্ডুলিপি আমাকে পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন আর আমি তা নিজের রচনা বলে চালিয়েছি। আবার কেউ বা ডাকযোগে জানিয়ে দিলেন যে অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে শীঘ্রই আদালতে মামলা নথিভুক্ত হচ্ছে। একটি পত্রিকা তো সম্পাদকীয় আলোচনায় এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেল যে আয়কর বিভাগকে পর্যন্ত তারা অনুরোধ করলে যেন অবিলম্বে আমার আয়ের হিসেব নিয়ে আমাকে দণ্ডিত করা হয়। এমন কি নিউথিয়েটার্স কোম্পানীর মিস্টার বি. এন. সরকার পর্যন্ত এই ভীতিপ্রদর্শন থেকে অব্যাহতি পেলেন না। আর প্রকাশকের দোকানেও হামলা চললো আমি কেন কোনও অভিযোগের লিখিত জবাব দিচ্ছি না। আমি যখন এইভাবে চিঠিপত্র-পত্রিকায় বন্যার স্রোতে ভাসমান, তখন আপনাদের দফতরেও অনুরূপ অভিযোগ-পত্রের স্রোত বয়ে চলেছে আর আপনি সে-সব চিঠি-পত্র দৈনিক আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অনুরোধ করছেন—আমি যেন সে-সব পত্রের একটারও জবাব না দিই।

জবাব অবশ্যই আমার একটা ছিল। জবাব দিতে পারতাম যে হ্যাঁ আমি আত্মসাৎ করেছি। তবে শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা থেকে আমি

আত্মসাৎ করিনি, আত্মসাৎ করেছি ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ আর ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের রাগসঙ্গীত থেকে। কিন্তু এ-জবাবের মর্মার্থ কি তাঁরা তখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন ?

অন্যদিকে যাঁরা আমার বন্ধুস্থানীয় তাঁরা তখন শত্রুতে রূপান্তরিত হলেন, আবার এমন অসংখ্য নতুন বন্ধুও পেলাম যাঁরা সেই সময়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। কুৎসা যে এমন অশালীন হতে পারে, নিন্দা যে এত অপ্রতিহত হতে পারে, শত্রুতা যে এত অকুণ্ঠিত হতে পারে, ঈর্ষা যে এত অনাবৃত হতে পারে, আর অসম্মাননা যে এত অকরুণ হতে পারে আগে তা আমার এত সত্য করে আর জানা ছিল না। কিন্তু তবু বলবো সেদিন তাঁরা তাঁদের কুৎসা, নিন্দা, শত্রুতা, ঈর্ষা, অসম্মাননা দ্বারা আমার যে উপকার সাধন করেছিলেন তাতে আমার মঙ্গল হয়েছিল। তার জন্যে আমি তাঁদের ওপর চিরকৃতজ্ঞ। বেদনা আমি সেদিন পেয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু তাঁদের সেই বিষোদ্গারই যে আমাকে আবার প্রজ্ঞা দিয়েছিল তাও তো কম সত্যি নয়! সংস্কৃত 'বিদ্' শব্দ থেকেই 'বেদনা' শব্দটির উৎপত্তি। 'বিদ' অর্থ জ্ঞান। সংস্কৃত অভিধানে দেখেছি 'বিদ্' ধাতুর সঙ্গে অন্+আ প্রত্যয় করে 'বেদনা' শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ যাঁরা অনুগ্রহ করে অত জ্ঞান আমাকে দিলেন তার জন্যে তো তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। অথচ আশ্চর্য, তাঁরা জানতেও পারলেন না যে তাঁরা সেদিন আমাকে বেদনা দিয়ে সারাজীবন আমাকে কতখানি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে রাখলেন।

তা ছাড়া নিন্দা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা কথা আমার জানা ছিল। দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যুর পরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সম্বন্ধে একটি ছোট প্রবন্ধে লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধে নিন্দা ও যশ সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ ছিল। সেটি পাঠকদের জানা দরকার। তিনি তাতে লিখেছিলেন—"যেখানে যশ সেখানেই নিন্দা ; সংসারের ইহাই নিয়ম। পৃথিবীতে যিনিই যশস্বী হইয়াছেন তিনিই সম্প্রদায় বিশেষ কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছেন। ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথম—দোষশূন্য মানুষ জন্মে না ; যিনি বহুগুণ বিশিষ্ট তাঁহার দোষগুলি গুণ সান্নিধ্য হেতু কিছু অধিকতর স্পষ্ট হয়, সুতরাং লোকে তৎকীর্তনে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়—গুণের সঙ্গে দোষের চির বিরোধ, দোষযুক্ত ব্যক্তিগণ গুণশালী ব্যক্তির সুতরাং শত্রু হইয়া পড়ে। তৃতীয়—কর্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলে কার্যের গতিকে অনেক শত্রু হয়। শত্রুগণ অন্যপ্রকারে শত্রুতাসাধনে অসমর্থ হইলে নিন্দার দ্বারা শত্রুতা

সাধে। চতুর্থ—অনেক মনুষ্যের স্বভাবই এই প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা করিতে ও শুনিতে ভালবাসে। সামান্য ব্যক্তির নিন্দার অপেক্ষা যশস্বী ব্যক্তির নিন্দা বক্তা ও শ্রোতার সুখদায়ক। পঞ্চম—ঈর্ষা মানুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম। অনেকে পরের যশে অত্যন্ত কাতর হইয়া যশস্বীর নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই শ্রেণীর নিন্দুকই অনেক, বিশেষ বঙ্গদেশে।"

এ-জানার পর আমার আর কী-ই বা দুঃখ থাকতে পারে?

সেদিন একজন নিরপেক্ষ পাঠক আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ এসেছে আমি তার কোনও জবাব দিচ্ছি না কেন? আমি তাঁকে ডাঃ স্যামুয়েল জনসনের সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম। স্যামুয়েল জনসন একবার বলেছিলেন—"Every man has a right to say what he thinks truth···and every other man has a right to knock him down for it···"

কিন্তু প্রশংসা? প্রশংসাও কি পাইনি? হ্যাঁ, পেয়েছিলাম বৈকি। প্রচুরভাবে প্রভূতভাবেই পেয়েছিলাম। কিন্তু প্রশংসা স্তুতির কথা এখানে অবান্তর। কারণ প্রশংসা-স্তুতি ওগুলো আত্মসন্তোষ আনে, ওগুলো লেখকের পক্ষে মৃত্যু। ওগুলো তার চলার পথের বাধা। মনুই তো বলেছেন "সম্মানকে বিষ জ্ঞান করিবে, অপমানই অমৃত"। সুতরাং ও-প্রসঙ্গ থাক, শুধু এখানে এই প্রসঙ্গে একটা ছোট ঘটনার উল্লেখ করি।

মনে আছে এর কিছুকাল পরে একদিন আপনার দফ্‌তরে একটি জরুরী কাজে আপনি আমাকে তলব দিলেন। আমি তখনও জানি না সে কী এমন জরুরী কাজ যে আমাকে সশরীরে আপনার দফ্‌তরে হাজির হতে হবে।

আমি যেতেই আপনি একটি প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখালেন। প্রায় বারো পৃষ্ঠার অধিক সেই পাণ্ডুলিপিটি। প্রবন্ধ-লেখিকা আর কেউ নন, স্বয়ং শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী।

আপনি বললেন—প্রবন্ধটি আপনার 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করবার জন্যে প্রেরিত হয়েছে। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর চুরাশি বছর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে 'শান্তিনিকেতনে' যে সংবর্ধনা-সভার অনুষ্ঠান হয় সেই সভায় প্রবন্ধটি বহু বিখ্যাত গুণীজনের উপস্থিতিতে পঠিত হয়। প্রবন্ধটির বিষয়-বস্তু নাকি আর কিছু নয়, আমার এই দ্বিতীয়

উপন্যাসটিই।

আমি তো শুনে অবাক।

আপনি বললেন—প্রবন্ধটির সবটা পড়ার দরকার নেই, আপনি শুধু এর শেষ লাইনটি পড়ুন—

বলে পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠাটি শুধু আপনি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। দেখলাম সুদীর্ঘ প্রবন্ধটির শেষ লাইনে লেখা রয়েছে—"আমার মনে হয় লেখককে এই গ্রন্থের জন্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত!"

মনে আছে সেদিন কিছুক্ষণ আমার মুখে কোনও বাক্‌স্ফূর্তি হয়নি। আমার হৃদ্‌কম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমি লেখিকাকে চিনি না। কোনও দিন তাঁকে দেখিওনি, এমন কি তাঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপও নেই। আমি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রও নই যে আমার ওপর তাঁর অনুকম্পা-মিশ্রিত এক ধরনের সহানুভূতির উদ্রেক হবে। আমি ভালো লিখেছি কি খারাপ লিখেছি সে-প্রশ্ন নয়। একজন নিরপেক্ষ উচ্চশিক্ষিতা মহিলা এবং শান্তিনিকেতনের উপাচার্যের কাছ থেকে অযাচিত এবং অপ্রত্যাশিত এ-প্রশংসা আমার মতন সাধারণ লেখকের পক্ষে অকল্পনীয়। কিন্তু যত অকল্পনীয়ই হোক সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিকরও তো বটে। জীবনে আমার সামনে আরো অনেক পথ নাকি পড়ে রয়েছে। এই যাত্রার শুরুতেই যদি এত প্রশংসা লাভ ঘটে তাহলে যে আমার সংগ্রামের পক্ষে তা বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। তাতে যে আমি থেমে যাব। এতে যে আমার অহঙ্কার হবে। অহংটাই তো সংসারে সব চেয়ে বড় চোর, সে স্বয়ং ভগবানের সামগ্রী নিজের বলে দাবি করতে কুণ্ঠাবোধ করে না—এ কথা তো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলে গেছেন।

বললাম—আমার একটা কথা রাখবেন, আপনি দয়া করে এটা ছাপবেন না। এখন যেমন নিন্দা-কুৎসা-অপবাদ চলছে ওটা ছাপালে তা থেমে যাবে—

সেদিন আপনি আমার অনুরোধ রেখেছিলেন। ওই প্রবন্ধটি আপনি আপনার পত্রিকায় ছাপেন নি। ছাপলে যে-সমস্ত উপন্যাস পরবর্তীকালে লিখেছি তা হয়ত আর লেখা হতো না। আমার কলম সেই দিনই বন্ধ হয়ে যেত। লেখক হিসেবেও হয়ত আমার মৃত্যু হতো তাতে সেই দিনই।

কৌতূহলী পাঠকদের অবগতির জন্যে জানাই, এ-ঘটনার অনেক দিন পরে প্রায় দু'দশক অতীত হবার পর আপনারই অনুরোধে ইন্দিরা দেবী

চৌধুরানীর সেই শেষ অপ্রকাশিত রচনাটি 'সাহেব বিবি গোলামে'র সাম্প্রতিক সংস্করণের প্রথম ফর্মায় ভূমিকা হিসেবে সন্নিবেশিত করে দিয়েছি।

কিন্তু যা হোক এর পরে আমার বইএর বিক্রি যত বাড়তে লাগলো নিন্দা-কুৎসা-অপবাদের মাত্রাও যেন ততোধিক বাড়তে লাগলো। অনুরূপ অবস্থায় ইংরেজ লেখক টমাস হার্ডি লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। শহর ছেড়ে সুদূর গ্রামে গিয়ে নির্বাসিত জীবনযাপন করেছিলেন। মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত তিরিশ বছর ধরে কবিতা ছাড়া আর কিছুই তিনি লেখেন নি। মনস্থ করলাম আমিও তাই করবো। আমি স্বেচ্ছা-নির্বাসন দণ্ড মাথায় তুলে নিয়ে দূরে কোথাও গিয়ে আত্মগোপন করে জীবন অতিবাহিত করবো। রাশিয়াতে তখন কয়েকজন বাঙালী লেখক অনুবাদকের চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার বন্ধু ননী ভৌমিক, ফল্গু কর প্রভৃতির কাছে খবর পেয়ে ভাবলাম আমিও তাদের সঙ্গী হবো। আত্মগোপনের এমন সুবর্ণ সুযোগ বোধহয় আমার জীবনে আর দ্বিতীয়বার আসবে না। একদিন আমার এই সিদ্ধান্ত আপনার গোচরে আনতেই আপনি তীব্রভাবে নিষেধ করলেন। আপনিই সেদিন বলেছিলেন—আপনি কেন যাবেন? আপনি চলে গেলে এই উপন্যাসের পরবর্তী খণ্ডগুলো কে লিখবে?

আমি বলেছিলাম—এত নিন্দা-অপবাদের পরেও আপনি আমাকে লিখতে বলছেন? আমি কি আর লিখতে পারবো?

স্বামী বিবেকানন্দকে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মানুষ বলেই জানতাম, কিন্তু তাঁর এক এক চিঠিতে দেখেছি তিনি লিখেছেন, তিনি খুব ভাবপ্রবণ প্রকৃতির মানুষ। এই এখনই হয়ত তিনি আনন্দে উল্লসিত হয়ে আকাশে উড়ছেন আর ঠিক তার পরমুহূর্তেই আবার হতাশায় পাতালে ডুবছেন। সংসারে যারা মহৎ কিছু করেছে তারাই মাত্রাতিরিক্তভাবে ভাবপ্রবণ। স্বামী বিবেকানন্দের কথা আলাদা। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ সংসারী মানুষের মধ্যেই এমন অনেক ভাবপ্রবণ মানুষ দেখেছি যাঁরা ঝোঁকের মাথায় নিজের চরম সর্বনাশ-সাধন করেছেন, আবার ততোধিক ঝোঁকের মাথায় দেশ-দশের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রাতঃস্মরণীয়ও হয়েছেন। রজক-কন্যার মুখে 'বেলা যায়' আহবান শুনে কোটিপতি লালাবাবুর সংসার ত্যাগ করার কাহিনী তো বহু বিদিত।

আমিও একজন তেমনি অতি-সাধারণ ভাবপ্রবণ মানুষ। অতি-সাধারণ হলেও দাসত্ব-শৃঙ্খল আমার বিশেষ মর্মপীড়ার কারণ হয়ে

আমাকে যে কী নিদারুণ অস্থির করে তুলতো ভেবে দেখেছি তার অনেক কারণ ছিল। কর্মস্থানের বড় কর্তাদের বাড়িতে-বাড়িতে তাঁদের গৃহিণী-দের দ্বারা আয়োজিত চায়ের পার্টিতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাও নাকি আমার একটা অবশ্য পালনীয় অন্যতম কর্তব্য বিশেষ বলে তাঁরা মনে করতেন। যেহেতু স্বামীদের অধীনস্থ কর্মচারী আমি সেই হেতু যেন তাঁদের গৃহিণীরাও আমার প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ মনিব বিশেষ। আমার লেখক-সত্তার সঙ্গে আমার দাস-সত্তার একীকরণ করে তাঁরা মনে মনে প্রভুত্ব বিস্তারের কৃতিত্বে একটা পৈশাচিক আনন্দ পেতেন। তাতে কর্মস্থলে পদোন্নতির ভরসা পেয়ে আমার দাস-সত্তা যত খুশী হতো তেমনি আমার লেখক-সত্তা হতো ততো বিরক্ত। কিন্তু আমি বরাবর আমার লেখক-সত্তার প্রতিষ্ঠাপ্রতিপত্তির সুযোগ গ্রহণ করে আমার দাস-সত্তার প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির উন্নতিসাধন করাকে ঘৃণার্হ মনে করতাম। আমি বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে আমার নিজের মানসিকতার মধ্যেই সব সময়ে একটা স্ববিরোধিতার ভাব বিরাজ করে। আমার মনের গভীরে আমার Self-এর সঙ্গে পাশাপাশি আর একটা anti-self বরাবর ক্রিয়া করে। তাদের একজন যদি বলে এ সংসার মায়া তো আর একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে এ-সংসার স্বর্গ। একজন যদি বলে যে অর্থ অনর্থ তো আর একজন বলে অর্থ আশীর্বাদ। সারাজীবন এই দুই পরস্পর-বিরোধী সত্তা আমার জীবনে অনেক অনর্থপাত ঘটিয়েছে। সন্দেহ, ভয়, আনন্দ, প্রয়োজন, প্রীতি প্রভৃতি নানা প্রবৃত্তি যেমন আমাকে অনেকবার পথভ্রষ্ট করেছে আবার তেমনি নতুন পথের সন্ধানও দিয়েছে। একটা গ্রীক প্রবাদ আছে "Call no man happy until he is dead." শ্রীযুক্ত নিরোদ সি. চৌধুরী তাঁর "The Intellectual in India" নামক গ্রন্থে কথাটার ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে "Don't say that anyone has survived until he is dead." তাই জীবনে আমি কী-করেছি না-করেছি তার বিচার আমার জীবদ্দশায় না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় বলে বিশ্বাস করি।

এখানে যাঁরা আমার রচনার সমালোচক তাঁদের অবগতির জন্যেই জানিয়ে রাখি যে তাঁদের চেয়ে আমি নিজেই আমার রচনার সব চেয়ে বেশি নির্মম সমালোচক। কিন্তু আমার চেয়ে আরো নির্মম এবং আরো নিরপেক্ষ একজন সমালোচক আমার স্বগৃহেই আছেন। বই লিখলেই যেমন কেউ লেখক-তালিকা ভুক্ত হন্ না তেমনি বই পড়লেই কেউ পড়ুয়াও হন না। যাঁর কথা বলছি সাহিত্য-বিচার-বোধ তাঁর সহজাত। তিনি

পাস মার্কা দিলেই তবে আমি পাস এবং ফেল বললেই তবে আমি ফেল। কিন্তু তাঁর প্রতিভার পরিচয় কেউ কোনও দিন পাবে না, কেউ কোনও দিন জানতেও পারবে না তাঁর প্রকৃত পরিচয়। তিনি চিরকালই আড়ালে থেকে যাবেন। এবং বোধকরি আমার পরিচর্যা আর তুষ্টিসাধন করেই তাঁর জীবন নিঃশেষ হয়ে যাবার জন্যেই তাঁর সৃষ্টি! একদিন সেই তাঁর কাছেই আমার একটা কাজের অনুমতি নেবার প্রয়োজন জরুরী হয়ে উঠলো।

তাই আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আমি তাঁর কাছে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। জানিয়ে দিলাম যে সেইদিন থেকেই আমি স্বাধীন হতে চাই। তবে সিদ্ধান্তটা তাঁর অনুমতি-সাপেক্ষ। তারও একটা কারণ ছিল। কারণটা এই যে যৌবনে বিবাহের বাজার-মূল্য হিসাবে আমার মত পাত্রের মাত্র দুটি প্রত্যক্ষ গুণ ছিল। তার মধ্যে একটি হলো কলকাতা শহরের পৌর-এলাকায় আমাদের একটি ছোটখাটো পৈতৃক পাকা দ্বিতল বাড়ি আর দ্বিতীয় গুণ হলো কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নতিশীল স্থায়ী একটা চাকরি। প্রথমটি আগেই ত্যাগ করেছিলাম। এবার দ্বিতীয়টাও ত্যাগ করতে চাই। তাঁর পিতৃ-মাতৃকুলের যখন সবাই বিগত, তখন তাঁর অনুমতি বিনা সেটি ত্যাগ করতে পারি না। তা সেই অনুমতিটাও যখন এক-কথায় পাওয়া গেল তখন কোনও দিক থেকে আর কোনও দ্বিধা, কোনও বাধা রইল না। আমি এক মুহূর্তে স্বাধীন লেখক হয়ে গেলাম সেইদিন সেই সকাল বেলার সেই শুভ মুহূর্ত থেকেই। শ্যামুয়েল বাটলার যে-স্বাধীনতার কথা বলেছেন আমি সেই মুহূর্ত থেকে সেই স্বাধীনতাই পেলাম।

আর তখনই ভাবলাম যে বাঁচতে হলে আমি লিখেই বাঁচবো আর মরতে হলে আমি লিখেই মরবো। তখনই ঠিক করে নিলাম যে সর্ব-সময়ের বা পেশাদারি লেখক হতে গেলে জীবনে চারটে নিয়ম আমাকে কঠোরভাবে পালন করতেই হবে। সেগুলো হলো ঃ—

(১) সংসারে বাস করেও সংযমী হয়ে নিরাসক্ত জীবন-যাপন।

(২) সভা-সমিতির আক্রমণ থেকে যথাসম্ভব আত্মরক্ষা।

(৩) সম্মান যেখানেই লোভনীয় তার সংস্রব পরিহার।

(৪) অনলস পরিশ্রম।

কিন্তু হায় রে কপাল, তখন কি জানতাম যে দুর্নীতি-নিবারক-

অফিসার হিসেবে আমি যেমন ব্যর্থ হয়েছি, দুর্নীতি-নিবারক অফিসার হয়েও আমি যেমন দেশের কোনও উপকার করতে পারিনি, লেখক হিসেবেও একদিন আমি তেমনিই ব্যর্থ হবো। লেখক হিসেবেও আমি মানুষের বা সমাজের বা সাহিত্যের কোনও উপকারেই আসবো না! নইলে এত মানুষ থাকতে আমার নাম চুরি করেই বা বাজারে এত জাল-বইএর ঢালাও কারবার কেন? প্রায় ছ'শো উপন্যাস যে বাজারে 'বিমল মিত্র' নাম-যুক্ত হয়ে চলছে তাতে কি এই-ই প্রমাণ করে না যে আমার পৈত্রিক নামটা পর্যন্ত মুনাফার দৃষ্টিতে লাভজনক? কিংবা হয়ত সেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'এও আমার খ্যাতি-পরিমাপের এক বৃহৎ মাপকাঠি'!

আমার যন্ত্রণা-বেদনার কথা আগেই বলেছি। জ্ঞান থেকেই বেদনা। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি যতক্ষণ আমার জ্ঞান আছে ততক্ষণ আমার যন্ত্রণা বেদনা থাকবেই।

কিন্তু সুখ? সুখও কি পাইনি?

পেয়েছি বইকি। অপার সুখও পেয়েছি। সেই সুখের কথা না বললে আমার এই বিশ্বাসের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি দিনের পর দিন ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ আর ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের সামনে বসে রাগসঙ্গীত শুনে সুখ পেয়েছি। রবিশংকরের সেতার আর বিসমিল্লা খাঁ সাহেবের শানাই শুনে সুখ পেয়েছি। সায়গলের পাঞ্জাবী তরকিফ দেওয়া গজল আর হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে সুখ পেয়েছি, পরেশ ভট্টাচার্যের তবলা-সঙ্গতের সঙ্গে শচীন দেববর্মনের গাওয়া অজয় ভট্টাচার্যের লেখা 'আমি ছিনু একা বাসর জাগায়ে' গান শুনে সুখ পেয়েছি। আর সুখ পেয়েছি পান্না ঘোষের আড়-বাঁশীতে পিলু-বাঁরোয়ার আলাপ-তান-লয় যুক্ত ঠুংরি শুনে। এর চেয়ে বেশি সুখ আর পৃথিবীতে কী-ই বা আছে? 'শুক্লপক্ষ হতে আনি রজনীগন্ধার বৃন্তখানি যে পারে সাজাতে কৃষ্ণপক্ষ রাতে' সেই-ই তো একমাত্র সুখী। সুখ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা আমি মনে-প্রাণে মানতে চেষ্টা করেছি। লিখতে লিখতে যখন হঠাৎ কলম আটকে এসেছে, যন্ত্রণায় বেদনায় যখন মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করেছে, নিজেরই সৃষ্টিকরা গল্পের জটিল জালে জড়িয়ে গিয়ে যখন প্রাণপণে মুক্তির পথ খুঁজেছি, যখন গল্পের সৃষ্ট চরিত্রগুলোর প্রেতাত্মারা আমাকে তাড়না করে আমার মধ্যরাত্রের ঘুম কেড়ে নিয়েছে আর তার জন্যে যখন অত্যন্ত প্রিয়জনকেও অকারণে অপ্রিয়-ভাষণ শুনিয়েছি, অর্থাৎ যখন আমার চারপাশের এই সুন্দর পৃথিবীটাও

আমার চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে, তখন ওই ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, রবিশঙ্কর, বিসমিল্লা খাঁ সাহেব, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শচীন দেববর্মন, পান্না ঘোষের সামনে বসে গান-বাজনা শোনার সেই সব দিনগুলোর কথা স্মরণ করে সুখ পেয়েছি। কখনও ভৈরবীর সেই কোমল নিখাদ, ভূপালীর সেই শুদ্ধ গান্ধার, মালকোষের সেই মধ্যম আর ইমন-কল্যাণের সেই কড়ি মধ্যমের আর হাম্বীরের সেই একখানা যুৎসই ধৈবৎ-এর অনাবিল সমুদ্রে আত্ম-অবগাহন করেই আমি সুখ পেয়েছি। গান গাইবার ক্ষমতা আমার নেই। তা না-ই বা থাকলো। গান শুনতে তো আমি ভালবাসি। গান শুনেই তো আমি ব্রহ্মস্বাদ পাই। আর ব্রহ্মস্বাদই তো সুখের চরম স্তর অবাঙমনসোগোচর সুখ।

স্যামুয়েল বাটলারের কথা দিয়েই এই রচনা শুরু করেছিলাম। সেই যে যিনি বলেছিলেন, "Independence is essential to permanent but fatal to immediate success"। তাঁর শুরুটাই বলেছি কিন্তু শেষটা এবার বলি। তিনি তো ১৯০২ সালে মারা গেলেন। কিন্তু তাঁর নিজের সম্বন্ধে সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হলো ১৯৩১ সালে যখন হঠাৎ তাঁর রচনাবলী বার্নার্ড শ'র নজরে পড়তেই বার্নার্ড শ' তাঁর সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন এবং সেই প্রবন্ধ লেখার পর থেকে স্যামুয়েল বাটলারের সমস্ত রচনা যা তাঁর জীবদ্দশায় এক-কপিও বিক্রি হয়নি তা তখন সংস্করণের পর সংস্করণ নিঃশেষিত হতে লাগলো। তাঁর সম্বন্ধে অসংখ্য সমালোচনা-গ্রন্থ লেখা হতে লাগলো। সেই যে তাঁর সম্বন্ধে গবেষণা হতে লাগলো তা আর বন্ধ হলো না। এখনও তাঁর সম্বন্ধে গ্রন্থ লেখা হচ্ছে। স্বয়ং বার্নার্ড শ'র গুরু-স্থানীয় বলে তিনি স্বীকৃতি পেলেন। "ওয়ান হান্‌ড্রেড্ ক্লাসিকস" বলে ইংরেজি ভাষায় যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে তাঁর "দ্য ওয়ে অব্ অল্ ফ্লেশ" উপন্যাসটি সন্নিবেশিত হবার গৌরব অর্জন করেছে।

আপনি লিখেছিলেন, "যে-উপন্যাস প্রথম পাঠক-মহলে প্রভূত আলোড়ন ও সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল সেই উপন্যাসের প্রস্তুতিপর্বের এবং প্রকাশের নেপথ্য কাহিনী আজকের কৌতুহলী পাঠকদের কাছে সবিস্তারে তুলে ধরবার অনুরোধ জানাচ্ছি।"

মনে হয় হয়ত সবিস্তারেই আমি তা বলতে পেরেছি।

আপনার শেষ প্রশ্ন: 'কোন্‌টি আমার এতাবৎকালীন রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ'। এ-প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব? যে-ভূতটা আমার মত একজন

অলস-কর্মবিমুখ লোককে দিয়ে একটি চোখের সাহায্যে এত মোটা মোটা বই খেলালে, এত বেগার খাটালে, সেই তাকে যদি কোনওদিন কোথাও কখনও খুঁজে পাই তো তাকে জিজ্ঞেস করলে হয়ত সে এ-প্রশ্নের জবাব দিতে পারব। আমি কেউ না। আমি বিশ্বাস করি আমি শুধু কারক, কর্তা সেই ভূতটা।

আর একটা কথা।

ওই ব্রহ্মস্বাদের কথায় ব্রহ্মসঙ্গীতের কথাও মনে পড়লো। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে একদিন সন্ধ্যেবেলা সেই তেরো নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট-এর বাড়িটা থেকে বেরিয়েছি বাড়ি ফিরবো বলে। হঠাৎ সামনে ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরটার বাইরে দেখি অনেক গাড়ি অনেক লোক-জনের আনাগোনা। বুঝলাম সেখানে মাঘোৎসবের অনুষ্ঠান চলছে। কী জানি কী ভেবে আমিও মন্দিরে প্রবেশ করেছিলাম। তখন সেখানে ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে—

আমার বিচার কর তুমি তব আপন করে
দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচার-ঘরে।
যদি পূজা করি মিছা দেবতার
শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার
যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো পরে,
আমার বিচার কর তুমি তব আপন করে।
লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ
ভয় হয়ে থাকি ধর্ম-বিমুখ
পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক তরে
আমার বিচার কর তুমি তব আপন করে।

সেই চল্লিশ বছর আগেকার কথা আজ এতদিন পরে মনে পড়বার একটা সঙ্গত কারণও আছে। আজ আমারও দিনের কর্ম শেষ হয়ে এল। আমারও আজ শেষ-স্বীকারোক্তি করবার লগ্ন এল। আজ আমিও আমার দিনের কর্ম-সম্ভার নিয়ে তোমাকে নিবেদন করতে এসেছি। আমিও বিচার-প্রার্থনা করছি তোমার কাছে। আমি যদি কখনও প্রীতির চেয়ে প্রয়োজনকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি, যদি কখনও চিরকালটার চেয়ে ক্ষণকালটাকেই বেশি প্রশ্রয় দিয়ে থাকি, যদি শারীরিক ক্লান্তির জন্যে কখনও কর্তব্যচ্যুত হয়ে থাকি, পরমার্থকে অস্বীকার করে অর্থকে গরুত্ব দিয়ে যদি কখনও সাহিত্যকে পণ্য করে থাকি, সাহিত্যের জন্যে জীবন-

সর্বস্ব দেবার ব্যাপারে ভক্তির বদলে বাইরের পৃথিবীর চাপে যদি কখন
আপোস করে বাঁচবার চেষ্টা করে থাকি, যদি সাহিত্যকে কখন
কার্যসিদ্ধির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে থাকি, কিংবা পরে
অখ্যাতিতে যদি কখনও মনের কোণে এক বিন্দুও তৃপ্তি পেয়ে থাকি তে
তুমি আমায় ক্ষমা কোর না, তুমি আমার বিচার কোর। তোমার কাে
ক্ষমা চাইবার অধিকার আমার নেই। আমি শুধু আমার বিচার-প্রার্থী
তোমার বিচারের নিঃসঙ্কোচ নিরপেক্ষতায় আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস
করি।

আমি পরাজিত

আজ-কাল এ-দেশে ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার কথা নিয়ে তুমুল আলোচনা
চ্ছে। খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ঘুষ নেওয়ার
পারে একজন আর একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে আর অন্যজন
অস্বীকার করছে।

এই ঘুষ দেওয়া আর নেওয়ার ব্যাপারে আমার নিজেরও কিছু
ভিজ্ঞতা আছে। আজ আমার নিজেরও ভাবতে অবাক লাগে যে
মার মতো লাজুক আর নেপথ্যচারী মানুষকেও কিনা একদিন সি-বি-
াই বিভাগে চাক্‌রী করতে হয়েছিল।

সি-বি-আই মানে 'সেন্ট্রাল ব্যুরো অব্‌ ইনভেস্টিগেশন'। তখন
নিশশো আটচল্লিশ সাল। বলতে গেলে সবেমাত্র কয়েক মাস আগে
শ স্বাধীন হয়েছে। ঠিক তার কয়েকমাস আগে আমার চোখে একটা
ভূত রোগ হলো। রোগটার নাম 'অপটিক্যাল হারপিজ্‌'। ডাক্তাররা
বাই রক্ত পরীক্ষা করে জানালেন যে রোগের কারণ বসন্তের 'ভাইরাস'।
ষকালে আমার বাঁ চোখটা 'ইনফ্রো-রে'র আলো দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া
লো। তখন ভরসা রইল মাত্র একটি চোখ। সেই একটা চোখ দিয়েই
মার সব কাজ-কর্ম চালিয়ে নিতে হবে। বয়েস তখন আমার পঁয়ত্রিশ।

ডাক্তাররা সবাই নির্দেশ দিলেন যে 'সূর্য্যাস্তের পর কোনও রকম
খাপড়ার কাজ চলবে না।' লেখা-পড়ার কাজ করতে গেলে কি এ-
র্দেশ মানা চলে?

লেখা-পড়ার কাজই যদি না করতে পারি তা হ'লে বেঁচে থেকে লাভ
ক! আর তা ছাড়া লেখা-পড়াই তো আমার জীবিকা। দিনের বেলা
র্কীর করে বাকি যে-সময়টা পাই তখনই তো আমার লেখার কাজ চলে।
মি তো বড়লোকের ছেলে নই যে পৈতৃক সম্পত্তি ভেঙে পেট চালাবো।

লেখা বা পড়া না করলেও যে-চাকরি বাজারে চালু আছে তার নাম
স-বি--আই'। তখন সে-চাকরির নাম ছিল 'স্পেশ্যাল পুলিশ
সট্যাব্‌লিশমেণ্ট'। এক ভদ্রলোক সেই চাকরিটা আমায় দিলেন।
ইনেটা ভালো অথচ সে-চাকরিতে লেখা-পড়ার বালাই নেই।

ছ'মাস কাজ করতে হলো কলকাতা শহরে, তারপরেই হুকুম হলো 'মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর যাও। সেখানেই তোমার হেড্-কোয়ার্টার।'

প্রথম দিনেই আমার একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো। কী চাকরি করতে আমি বিলাসপুরে এসেছি, তা জানতে পেরেই আমাকে বিলাসপুর ষ্টেশনের রেলওয়ে হোটেলের মালিক ডিনার খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। হোটেলের মালিক নিজে বাঙালী। আমিও বাঙালী। ভাবলাম আমি বাঙালী বলেই বোধহয় আমাকে এই বিশেষ খাতির।

গেলাম ডাইনিং-রুমে। গিয়ে হতবাক। দেখলাম আমি যে সেখানে একলাই নিমন্ত্রিত তাই-ই নয়, নিমন্ত্রিত হয়েছেন আরো এগারোজন ব্যক্তি। সকলের সামনেই একটা করে গেলাস। গেলাসের ভেতর লাল জল রয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম—এতে কী রয়েছে?

হোটেলের মালিক বললেন—ওটা ব্র্যাণ্ডি, ওটা খান, খেলে খুব খিদে হবে—

আমি বললাম—না, ওটা মদ তো? ও আমি খাই না—

আর সবাই তখন তাদের নিজেদের গেলাসে চুমুক দিতে শুরু করেছেন। খানিক পরেই খাবার এলো। আমরা সেই খাদ্য খেতে শুরু করলাম।

কিন্তু সেদিন যে আমি হোটেল মালিকের অনুরোধে মদ খাইনি, সেজন্য কিন্তু তিনি আমার ওপর কোনও রাগ করেননি। সামান্য কারণে রাগ করবার মতো নির্বোধ লোক নন্ তিনি। যতদিন আমি বিলাসপুরে ছিলাম ততোদিন আমার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব সূত্র ছিল অক্ষুন্ন।

তারপরেই আর এক কাণ্ড হলো।

একজন ব্যবসায়ী সরকারী ঠিকেদারি পেয়ে উনত্রিশ হাজার টাকা দামের সরষের তেল সরবরাহ করেছে। একজন লোক এসে আমাকে গোপনে জানিয়ে দিয়ে গেল যে তেলটা পুরোপুরি ভেজাল। সরকারী অফিসারকে ঘুষ দিয়ে ওই ঠিকেটা সে পেয়েছে।

বিলাসপুরের আগের স্টেশনের নাম 'আকালটারা'। সেখানেই সরকারী খাদ্যসামগ্রীর গুদাম। চাল-চিনি-আটা-গম সব কিছুই সেখানে মজুত থাকে।

আমি থাকি বিলাসপুরে আর জব্বলপুরের নেপিয়ার টাউনে আমার অফিস। সেখানে গিয়ে পুলিশের দল নিয়ে এসে সমস্ত সরষের তেলের

টিনের মুখ 'সীল বন্ধ' করে দিলাম। শুধু নমুনা হিসেবে একটা বোতলে কিছুটা সরষের তেল নিয়ে চলে এলাম কলকাতায়। কলকাতায় 'আলিপুর টেস্ট হাউসে' গিয়ে দিলাম তেলটা। যাতে তারা পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দিতে পারে যে তেলটা খাঁটি না ভেজাল।

'টেস্ট হাউস' স্পষ্ট লিখে দিল যে 'তেলটা মানুষের খাওয়ার পক্ষে বিপজ্জনক'।

সেই সার্টিফিকেটটা নিয়ে সোজা চলে গেলাম জব্বলপুরের অফিসে।

ভাবলাম এই কাজের জন্যে খুব বাহোবা পাব আমি। সেই আনন্দেই তখন আমি বিভোর। দেশের ভালোর জন্য কষ্ট করার পুরস্কার হিসাবে 'সি-বি-আই' অফিসের বড় কর্তার কাছ থেকে প্রশংসা পাবো, একজন চাকরের পক্ষে এর চেয়ে বড়ো সম্মান আর কী হতে পারে?

আর সত্যিই তো, তখন আমি একজন চাকর ছাড়া আর কিছুই নই। যদিও আমার নামের পাশে বড় বড় করে লেখা থাকে 'সেকশন অফিসার'।

বিলাসপুরে এসে আমি আবার অন্য কাজে মন দিলাম। কাজ কি আমার তখন কম? মাসের মধ্যে অন্ততঃ সাতাশ দিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াই। আমার কাছে এমন একটা 'পাস' থাকে সেটা দেখালেই আমি যখন যেখানে ইচ্ছে যাতায়াত করতে পারি। অনেক নতুন-নতুন অভিযোগ আসে আমার কাছে। যারা আমাকে মদ দিয়ে একদিন আপ্যায়ন করতে চেয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগের প্রমাণ-পত্র এসেছে।

একদিন বাড়িতে এসে দেখি কে একজন একটা নতুন সাইকেল রেখে দিয়ে গেছে।

আমার আরদালীকে জিজ্ঞেস করলাম—এ সাইকেল কে দিয়ে গেল?

সে বললে—নাম জানি না স্যার,—

জিজ্ঞেস করলাম—কেন দিলে?

সে বললে—আপনার কাজের সুবিধার জন্য দিয়ে গিয়েছে—

ব্যাপারটা খুব রহস্যময় ঠেকলো। বিলাসপুরে তখন শহরে ঘোরা-ফেরার জন্যে এক মাত্র টাঙ্গা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যেত না। কিন্তু সেও খুব শ্লথ-গতির যান-বাহন। সাইকেলই বলতে গেলে সবচেয়ে দ্রুত-গতি যান। শহরের মধ্যে চলতে ফিরতে সাইকেলই তখন সুবিধেজনক পরিবহন। ঘণ্টা পিছু দু'-আনা ভাড়ায় সাইকেলের সাহায্য নিয়েই তখন আমি এখানে-ওখানে যেতাম।

কিন্তু কে আমার এতো শুভাকাঙ্খী যে আমার ব্যবহারের জন্যে

বাড়িতে সাইকেল দিয়ে গেল, অথচ একটা পয়সাও নিলে না ?

যাকে হাতের কাছে পাই তাকেই জিজ্ঞেস করি—সাইকেলটা কার ? কে এ সাইকেলটা আমাকে দিয়ে গেল ? কেউ আমার প্রশ্নের উত্তর দেয় না বা দিতে চায় না।

বলে—সে-সব ভেবে আপনার লাভ কী ? আপনি যখন ওটা পেয়ে গেছেন তখন চড়ে বেড়ান না—

অগত্যা সেইটে শেষ পর্যন্ত আমারই নিজস্ব বাহন হয়ে উঠলো। যখন মাসের মধ্যে দু'তিন দিন বিলাসপুরে থাকি তখন ওইটে চড়েই ষ্টেশনের রিফ্রেশমেণ্ট রুমে গিয়ে আড্ডা দিয়ে আসি।

কিন্তু তখন থেকেই লক্ষ্য করতে লাগলাম একটা অচেনা লোক প্রায়ই আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে মনে ভাবতাম কী ওর মতলব ! কেন আমার বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে অমন করে ?

ততোদিনে অনেক ঘুষখোরকে ধরে ফেলেছি। প্রায় তেত্রিশ জন সরকারী কর্মচারী আমার জালে ধরা পড়েছে। পেণ্ড্রা রোড ষ্টেশনের পি-ডব্লু-আইও তাদের মধ্যে একজন। তারপর একজন দালালকে ধরেছি যে লোকটা 'বরদুয়ার' ষ্টেশনের মালবাবুকে ঘুষ নিতে বাধ্য করতো। আর তার ফলে রেলওয়ের হাজার-হাজার টাকা লোকসান হতো।

সেদিনও বাড়িতে ফিরে এসেছি সকালের ট্রেণে। এসে দেখি সাইকেলটা নেই। কী হলো ? কে সেটা নিয়ে গেল ?

বুঝলাম যিনি আমাকে তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গদের না-ধরবার জন্যে সাইকেলটা দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা ধরা পড়ার পরে তিনিই আমার অজ্ঞাতসারে সেটি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। আমার আরো একটি অপরাধ এই যে আমি তাঁদের সঙ্গে এক টেবিলে মদ খেতে রাজি হইনি।

তা সাইকেলটা তিনি নিয়ে চলে যান তাতে কিছু আমার ক্ষতি নেই, আমি না হয় ঘণ্টায় দু' আনা ভাড়ায় কাজ চালাবো কিন্তু এই লোকটাকে নিয়ে আমি কী করবো ? এই যে লোকটা সব সময়ে আমার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করে ?

সেদিনও বিলাসপুর ষ্টেশন থেকে ট্রেণ ধরতে চলেছি। পেছন-পেছন সে লোকটি আসছিল।

আমি আর থাকতে পারলুম না। হঠাৎ পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলাম —কে তুমি ? কী চাও ? আমি দেখি তুমি রোজ আমার পেছন-পেছন ঘোরো। তোমার মতলোবটা কী ?

লোকটা আমার মেজাজ দেখে আর কথা শুনে প্রথমেই ঘাবড়ে গেল। তারপর বললে—সাহেব, আপনার ঘরে দেখেছি ভালো ফার্ণিচার নেই। আপনি ফার্ণিচার কেনেন না কেন?

আমি বললাম—আমি গরীব লোক, গরীবের মতো থাকি। ফার্ণিচার কেনবার মতো পয়সা কোথায় পাবো?

লোকটি বললে—ফার্ণিচার আপনাকে কিনতে হবে না। আপনি শুধু দোকানে গিয়ে ফার্ণিচারের অর্ডার দিয়ে দেবেন, আমি ফার্ণিচারের দাম দিয়ে দেব—

বললাম—তুমি কেন ফার্ণিচারের দাম দিয়ে দেবে? তোমার কী স্বার্থ?

লোকটা বললে—আমার সেই উনত্রিশ হাজার টাকা দামের সরষের তেলটা ড্রামের মধ্যে থেকে পচে যাচ্ছে, আমার অনেক টাকা লোকসান হচ্ছে···

বললাম—তুমি আমাকে ঘুষ দিতে চাইছ?

লোকটা বললে—একে আপনি ঘুষ বলছেন কেন সাহেব? এটা আমি আপনাকে উপহার হিসেবে দিচ্ছি—শুধু সামান্য একটা উপহার হিসেবে ভাবুন না।

বললাম—না, আমার অচেনা লোকের কাছ থেকে উপহার নেব কেন? তোমার ভেজাল সরষের তেল আমি না ধরলে তো তুমি আমাকে উপহার দিতে চাইতে না। তোমার উপহার নিলে ঘুষ নেওয়ার অপরাধে আমার চাকরি চলে যাবে।

লোকটা তখন বললে—তাহলে আপনি সোনা নিন্। সোনার বিস্কুট নিন, সেটা নিলে তো কেউ জানতে পারবে না।

আরো অনেকক্ষণ ধরে সে আমার পেছন-পেছন চলতে লাগলো, কিন্তু আমি তাকে কোনও পাত্তা না দিয়ে সোজা ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেণ ধরে আমার ডিউটি করতে চলে গেলাম।

তারপর থেকে যখনই আমি হেডকোয়ার্টারে থাকতাম সে প্রায়ই আমার পেছন-পেছন ঘুরতো, আমাকে ঘুস নেওয়ার প্রলোভন দিত।

ছোটবেলা থেকেই ঠিক করেছিলাম যে আমি লেখক হয়েই জীবন কাটাবো। আংশিক সময়ের লেখক নয়, পুরোপুরি সময়ের লেখক। লেখাই হবে আমার নেশা-ধ্যান-জ্ঞান। সারা জীবন আমি বিবাহ করবো না। কোনও রকমের নেশা করবো না। একটা সস্তার মেসে থাকব আর

মাস পঁচিশ টাকা উপার্জন করলেই আমার ভরণ-পোষণ চলে যাবে।

কিন্তু বাবাই অঘটন ঘটিয়ে দিলেন। তিনি জোর করে আমাকে একটা সরকারী চাকরীতে ঢুকিয়ে দিলেন আর একদিন আমার বিয়েও দিয়ে দিলেন। তিনি পিতার কাজই করেছেন। সত্যিই তো, পৃথিবীতে কোন্ পিতা চান যে তাঁর ছেলে অবিবাহিত থাকুক আর সাহিত্যকে তার জীবিকা করুক।

তা সে যা-ই হোক, তখন আমার অবস্থা যা তাতে আমি ঠিকই করে ফেলেছি যে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে গেলে সব রকম দুর্নীতি আর নেশা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। তাই যখন লোকটা আমাকে ঘুষ দিতে চাইলে, তখন আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম।

আমার কাজ ছিল সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে ঘুষখোরদের সন্ধান দেওয়া। আর যতো ঘুষখোর ধরবো, ততোই আমার চাকরিতে উন্নতি হবে। লেখা-পড়ার কোনও বালাই নেই সে-চাকরিতে। শুধু সাতদিন অন্তর আমার গতিবিধির ডায়েরি লিখে পাঠাতে হবে সেই জব্বলপুরের অফিসে। সোমবারে কোথায় গেলাম, কী করলাম বা কার সঙ্গে কথা বললাম। তারপর মঙ্গলবার কী করলাম, কার সঙ্গে কী কথা বললাম, তার বিবরণ। এমনি করে বুধ, বৃহস্পতি শুক্র শনি, রবিবার কোথায় কোথায় গেলাম কাদের সঙ্গে দেখা করলাম—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেদিন আমায় ডায়েরীতে ওই সরষের তেল সাপ্লায়ের কথা লিখলাম। লিখলাম যে ওই ব্যাপারী আমাকে ঘুষ দিতে চাইছে। ফার্নিচার চাইলে ফার্নিচার দেবে, সোনা চাইলে সোনা দেবে—ইত্যাদি ইত্যাদি—

ডায়েরীটা ডাক-যোগে না পাঠিয়ে আমি নিজেই জব্বলপুরে যাবো ঠিক করলাম। গিয়ে ডায়েরীটা নিজের হাতেই কর্তাকে দেখাবো।

অফিসটা ছিল জব্বলপুরের 'নেপিয়ার টাউনে'। যথারীতি সেখানকার ডাক-বাঙ্‌লোয় উঠে খাওয়া-দাওয়া সেরে অফিসে গেলাম।

সেখানকার অফিসে আমার যাঁরা সহকর্মী সবাই তাঁরা অবাঙালী। মাত্র একজন বাঙালী। তাঁর নাম মিষ্টার এ-ঘোষ।

তাঁকে গিয়ে বললাম আমার কেসটার কথা।

মিষ্টার ঘোষ সব কথা শুনলেন। শুনে বললেন—বিমলবাবু, আপনি যদি আমার কথা শোনেন তাহলে ও-কাজ করবেন না।

জিজ্ঞেস করলাম—কেন ? সে আমাকে কেন কোন্ সাহসে ঘুষ দিতে চাইছে ? আমি যদি তাকে ধরিয়ে দিই তাহলে গভর্মেণ্ট তো আমার কাজে

খুশীই হবে। আগে তো আমাদের ডিপার্টমেণ্টে এ-রকম ঘটনা কখনও ঘটে নি। এই ঘটনায় প্রমাণ হয়ে যাবে যে পুলিশের মধ্যেও সৎলোক আছে। পুলিশের সম্বন্ধে জন-সাধারণের মনে একটা ধারণা আছে যে তারা ঘুষখোর। এই ঘটনায় পুলিশের সেই বদনামটা অন্ততঃ ঘুচবে। পুলিশের সুনাম হবে।

মিষ্টার ঘোষ সব শুনে বললেন—না, বরং উল্টো ফল ফলবে।

আমি তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম--কেন?

মিষ্টার ঘোষ বললেন—তখন আমাদের আই-জি ভাববেন যে নিশ্চয় এই সেকশন্ অফিসারের ঘুষখোর হিসেবে বদনাম আছে। তা না থাকলে ওই সরষের তেলের মার্চেণ্ট কোন্ সাহসে আপনাকে ঘুষ নিতে প্রস্তাব করে?

তাঁর কথা শুনে আমি তো অবাক।

মিষ্টার ঘোষ বললেন—আপনি এই ডিপার্টমেণ্ট নতুন কিনা তাই আমার কথা শুনে অবাক হচ্ছেন। কিন্তু আমি নিজে পুলিশ অফিসার হয়ে আপনাকে বলছি আপনি ও ডায়েরী কর্তাকে দেবেন না। ওটা ছিঁড়ে ফেলে অন্য কথা লিখে দিন। যে-তারিখে ওই মার্চেণ্টের কথা বলার ঘটনার কথা লিখেছেন, সেই তারিখে আপনি লিখে দিন আপনি নাগপুর গিয়েছিলেন। কিন্তু যার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আপনি গিয়েছিলেন তাঁর দেখা পাননি।

—কিন্তু সেটা তো মিথ্যে কথা লেখা হবে। সে-তারিখে আমি তো নাগপুরে যাইনি।

মিষ্টার ঘোষ বললেন—তা মিথ্যে কথা লিখতে দোষ কি? আমরা তো সবাই মিথ্যে কথা লিখি। তাতে যদি আমাদের চাকরিটা বেঁচে যায় তো সেটাই তো আমাদের লাভ!

আমি তখনও হতবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে দেখছি।

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে মিষ্টার ঘোষ বললেন—তার চেয়ে এক কাজ করুন, আপনি ঘুষটা নিন্—

বললাম—কী বলছেন আপনি? আমি পুলিশ হয়ে ঘুষ নেব?

—হ্যাঁ নেবেন। আপনি যেমন ঘুষ ধরার চাকরি করেন, আমিও তেমনি ঘুষ ধরার চাকরি করি। আমরা সবাই ঘুষ নিই—

—কি করে ঘুষ নেন?

মিষ্টার ঘোষ বললেন—আমরা কী করে নিই তা আপনাকে শিখিয়ে

দিচ্ছি। আপনি ওই মার্চেণ্টকে রাত একটার সময়ে আপনার বাড়ির সদর-দরজার লেটার-বক্সে ঘুষের টাকাটা ফেলে দিয়ে যেতে বলবেন। তারপর আপনি রাত দু'টোর সময় লেটার-বক্সের চাবি খুলে টাকাগুলো নিয়ে নেবেন। কারোর সাধ্য নেই আপনাকে ধরতে পারে। আর একটা কথা...

বলে মিষ্টার ঘোষ আবার বলতে লাগলেন—আসলে কী ব্যাপারটা হয়েছে আমি আপনাকে তা খুলে বলি! যে উনত্রিশ হাজার টাকার সরষের তেলটা ধরতে পেরেছেন বলে আপনি এত বড়াই করছেন, সেই পুরো তেলটা মার্চেণ্টকে ফেরত দিতে হবেই। কারো সাধ্য নেই ওকে শাস্তি দেয়!

বললাম—কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে ও লোকটা সোনা দেবার জন্যে আমাকে অতো ধরাধরি করছে কেন?

মিষ্টার ঘোষ বললেন—ও জানে না তো। ও ভেবেছে পুলিশ যখন তেলটা ধরেছে তখন ওর মোটা শাস্তি হবেই। আসলে আমরা ওর কিছুই ক্ষতি করতে পারবো না।

বললাম—কেন? ওকে আমরা কোনও শাস্তি দিতে পারবো না কেন? খাঁটি তেল বলে ভেজাল তেল সাপ্লাই করা তো অপরাধ। গভর্নমেণ্টকে ঠকানোটা কি শাস্তি-যোগ্য অপরাধ নয়?

মিষ্টার ঘোষ বললেন—আসলে মার্চেণ্ট-টার সঙ্গে রেলওয়ের যে চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তিটাতেই গোলমাল ছিল। চুক্তিতে লেখা ছিল সে যদি তার সাপ্লাই করা সরষের তেল পরীক্ষা করে দেখা যায় যে তা ভেজাল, তাহলে ভেজাল তেল ফেরৎ নিয়ে আবার খাঁটি তেল সাপ্লাই করতে হবে।

আশ্চর্য্য! বললাম—এ-রকম গোলমেলে চুক্তি করা হয় কেন?

মিষ্টার ঘোষ বললেন—এ-রকম চুক্তি কবা হয় ইচ্ছে করে, যাতে ঘুষ খাওয়ার রাস্তা খোলা থাকে। আরো করা হয় এই জন্যে যে যদি পুলিশ ভেজাল তেলটা ধরে তাহলেও মার্চেণ্টের কোনও শাস্তি হবে না। তাকে পুলিশ বেকসুর খালাস করে দেবে।

আমি বললাম—তা যদি হয় তো সেই আমাকে অত ঘুষ দিতে চাইছে কেন?

মিষ্টার ঘোষ বললেন—মার্চেণ্টটা জানেনা বলেই আপনাকে ঘুষ দিতে চাইছে। আসলে ওই উনত্রিশ হাজার টাকার তেলটা আমাদের ফেরৎ দিতেই হবে। ওই গোলমেলে চুক্তির ফলে আমাদের কোনও কিছু করবার

নেই। তাই বলছি, আপনি যা ঘুষ পাচ্ছেন তা নিয়ে নিন্।

শেষ পর্যন্ত যে-ডায়েরীটা আমি নিয়ে গিয়েছিলাম তা ছিঁড়ে ফেললাম। তার বদলে আবার নতুন ডায়েরী লিখতে হলো। সে-ডায়েরীতে সত্য কথার জায়গায় মিথ্যে কথা লিখে পাতা ভর্তি করলাম।

ঘটনাটা আমার মনের ওপর একটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। আমার মনে হলো চাকরিটা করতে গিয়ে আমি নিজেকে কেবল প্রতারণা করে চলেছি। আমি জীবনে কারো সঙ্গে কখনও আপোষ করিনি। আর তার ফলে চাকরি করতে গিয়ে আমার আদর্শের সঙ্গে আমার নিজের সংঘাতই হচ্ছে বরাবর।

এ-সব ১৯৪৯ সালের কথা। এর পর আমি কলকাতায় চলে এলাম। চোখের ডাক্তার বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন যে সূর্যাস্তের পর আমার লেখার বা পড়ার কাজ চলবে না।

কলকাতার অফিসে এসে দেখলাম আমার বাড়ির কাছে বড়লাটের বেলভেডিয়ার হাউসটা 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী'তে রূপান্তরিত বয়েছে। অবাধে বই পড়া বা লেখার সুবিধে রয়েছে। তার জন্যে কোনও টাকা খরচ করবারও দরকার নেই। সেইখানে বসে বই পড়তে পড়তে আমার মনে হলো যে এই যে-দেশে আমি জন্মেছি সেই দেশের ইতিহাসটা কী? কবে এই কলকাতা শহরটার সৃষ্টি হলো? কোন্ সালে? কে এই শহরটার স্রষ্টা? মনে হলো সেই ১৬৯০ সালের ২৪শে আগষ্ট থেকে যে শহরটার জন্ম হলো তখন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত তা নিয়ে যদি খণ্ড-খণ্ড ভাবে উপন্যাস লিখি তাহলে কেমন হয়?

কিন্তু তা কি আমি পারবো আমার একটা চোখে নিয়ে?

একটা মানুষের জীবন নয়, একটা দেশের জীবন হবে সেই সব উপন্যাসের বিষয়-বস্তু। সে সব কি সহজ কাজ? তাহলে আমার সংসার চলবে কী করে? আমার তো পৈতৃক সম্পত্তি নেই যে তা দিয়ে আমার জীবিকা নির্বাহ হবে। আমার সেই সব বই যদি বিক্রি না হয় তাহলে আমি সংসার পরিচালনা করবো কেমন করে?

মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথের কথাঃ "কিছু না দিলে কিছু পাওয়া যায় না, আপনাকে দিলে সব পাওয়া যায়।"

ঠিক কবলাম আমি আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে আপনাকেই দেব। নিজের ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে নিজেকেই আমি আহুতি দেব। সরকারী অফিসার হিসেবে আমি দেশ থেকে যা দূর করতে পারিনি, এবার চাকরি

পেনসন্ সব কিছু পরিত্যাগ করে দেখবো সাহিত্যের মাধ্যমে তা করতে পারি কিনা।

সুতরাং একদিন আমার সাহিত্য যাত্রা শুরু হলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কথাটা মনে পড়লো। তিনি লিখে গেছেন ঃ

"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"

তখন সেই একটি চোখ নিয়ে চল্লিশ বছর বয়েসেই 'আমার সাধন" চলতে লাগল দিন-রাত ধরে। ১৬৯০ সালের ২৪শে আগষ্ট দুপুরে বারোটার সময় একদিন এক ইংরেজ সাহেব জোব্ চার্ণক এসে হাজির হলেন কোলকাতার গঙ্গার 'বাবুঘাটে'। সেই থেকে শুরু হলো 'বেগম মেরী বিশ্বাস', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'একক দশক শতক', 'আসামী হাজির' 'এই নরদেহ' প্রভৃতি উপন্যাস। সাপ্তাহিক পত্রিকায় একটার পর একটা বই লিখে গিয়েছি আর কখন দিন শেষ হয়েছে রাত শেষ হয়েছে তা লক্ষ্য করার সময় পাই নি।

কিন্তু আমি যা করতে চেয়েছিলাম তা করতে পারিনি। কারণ সরকারী দপ্তরের মতো সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ততোদিনে 'ঘুষে'র প্রচলন শুরু হয়ে গেছে। তখন থেকেই সেই যে সাহিত্যের জন্যে দেশে পুরস্কার প্রথা শুরু হলো, তার পাশাপাশি ঘুষের প্রথাও চালু হয়ে গেল। একটা দশ হাজার টাকার পুরস্কারের জন্যে কুড়ি হাজার টাকার তোষামোদ আর তেল খরচ হতে লাগলো। কিন্তু আমি তো বরাবরই 'ঘুষ'-প্রথার বিরোধী। তার ফলে কলকাতার বাজারে আমার নামে পাঁচ-ছশো জাল বই বাজারে চলতে লাগলো, যা আমার লেখা নয়।

আর তার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বাজার আমার নিন্দেয় মুখর হয়ে উঠলো। প্রত্যেকটি পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হতে লাগলো এমন সব কুৎসা যা আমার পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে উঠলো। নিন্দা যে কত আশীর্বাদ-স্বরূপ হতে পারে তার প্রমাণ হাতে হাতে পেয়ে গেলাম। এখনও সেই সব জাল বই প্রকাশিত হয়ে চলেছে যা আমার লেখা নয়।

আর সাহিত্য-পুরস্কার? সাহিত্য-পুরস্কারের বাজারে ঘুষের প্রচলন তখন থেকেই আরো জোরদার হয়ে উঠলো। যারা চিরকাল বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের নিন্দায় মুখর ছিল তারা ঘুষের জোরে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের নামাঙ্কিত পুরুস্কার পাওয়ার আশায় ঘুষ দেওয়া আর ঘুষ নেওয়ার প্রয়াসে উদ্দাম হয়ে উঠলো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজনীতি, সমাজনীতি আর বিয়ের উৎসবে ঘুষ সীমিত ছিল। একমাত্র সাহিত্য-

ক্ষেত্রই 'ঘুষে'র আওতার বাইরে ছিল, এবার সাহিত্য-একাডেমী প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে সেখানেও 'ঘুষ' প্রথা পুরোদমে চালু হয়ে গেল।

এই কলকাতা শহরেরই একজন ধনী মানুষ একটি দশ হাজার টাকার সরকারী সাহিত্য পুরস্কার পাওয়ার জন্য এক লক্ষ্য নব্বই হাজার টাকা ঘুষ দিলেন এবং তা পেয়েও গেলেন। সেই ঘুষটা নিলেন তাঁরাই যাঁরা নামী দামী বিচারক ছিলেন সেবারে। এরকম ঘটনা ভারতবর্ষে এখনও ঘটে চলেছে।

শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নামের মতো এখন ঘুষেরও অনেক নাম হয়ে গেছে। 'ঘুষ'কে কেউ বলে 'কমিশন', কেউ বলে 'কিক্ ব্যাক', কেউ বলে 'দালালী'। এখন 'ঘুষ' একটা আন্তর্জাতিক 'ইনডাস্ট্রী' হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের 'প্রাইম মিনিষ্টার' পর্যন্ত এই 'ইনডাস্ট্রী'র সরিক হওয়ার বদনাম রটেছে। সুতরাং সাহিত্য এই বদনাম থেকে মুক্ত থাকবে, এমন আশা কয়া যায় না। তাই সাহিত্যের পুরস্কারের ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপারে প্রধান বিবেচ্য হলো কে আমার দলে, কে আমার আত্মীয়, কে আমার বন্ধু, কে আমার শিবিরে, কাকে পুরস্কার দিলে আমার লাভ, কে কোন্ পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত, কাকে পুরস্কার দিলে আমার ছেলে-মেয়ের উন্নতি ইত্যাদি ইত্যাদি—

আমি 'সি-বি-আই' অফিসে 'সেকশন্ অফিসার' হয়ে 'ঘুষ-খোর'দের গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়েছি। ভেবেছিলাম সাহিত্য-ক্ষেত্রে এসে দেশ থেকে 'ঘুষ, খাওয়া দূর করবো। কিন্তু তাতেও আমি ব্যর্থ হলাম। আমি অকপটে স্বীকার করছি যে আমি আজ পরাজিত।

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম

আমার কাছে বহু লোকের একটি কৌতূহলী প্রশ্ন বার বার আমাকে তাড়না করেছে—'আপনি 'সাহেব বিবি গোলাম' নামটি কোথা থেকে পেলেন ?'

প্রশ্নটা সঙ্গত। কারণ আমার আগে যাঁরা লিখতেন তাঁরা সাধারণতঃ বই-এর নাম দিতেন 'দেবদাস', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'গৃহদাহ', 'চোখের বালি' বা ওই জাতীয়। যখন পাঠকরা উপন্যাস পড়তে পড়তে প্রায় ক্লান্ত, তখন সবাই উপন্যাসের বদলে রম্যরচনা জাতীয় রচনা পড়তে লাগলেন, তখনও নাম দেওয়া হতো 'দৃষ্টিপাত' বা 'দেশে বিদেশে' এই জাতীয়। তখন সবাই বলতে লাগলেন উপন্যাসের যুগ শেষ হয়ে গেছে, এবার এসেছে 'রম্যরচনার' যুগ। উপন্যাস পড়া আর চলবে না। উপন্যাস মৃত।

ঠিক এই সময়ে একটা নতুন ধরনের নাম সবাইকে আকৃষ্ট করলো—'সাহেব বিবি গোলাম'। এবং তারপর 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'।

কোথা থেকে যে এ নামগুলো পেলাম তা একরকম বিস্ময়কর ঘটনাই বটে। আমার তখনকার সমকালীন বন্ধুদের কাছে আমি ছিলাম তাদের কৃপার পাত্র। আমাকে তারা সবাই করুণা করতো, এবং বোধহয় এখনও করে। তাদের সঙ্গে আমি খুব মেলামেশা করতাম বটে, কিন্তু কখনও আমার সঙ্গে তাদের মতের বা মনের মিল হতো না। তবু যে মিশতাম তার কারণ এই যে তারা আমার কাছে আসতো। এবং যেহতু আমি আমার নিজ-গৃহে লাঞ্ছিত ও অবহেলিত সেই হেতু আমার বিপদ-তারণ আশ্রয় ছিল তারা। তাদের সঙ্গে মিলে মিশে আমি দিনের বেশির ভাগ সময় নিজের নিঃসঙ্গতার দুঃখ ভুলে থাকতাম।

কিন্তু তারা কি তাহলে আমাকে, আমার সঙ্গকে পছন্দ করতো ?

না, মোটেই পছন্দ করতো না।

তা ভালো করে জেনেও আমি তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ভান করতাম। কারণ একা একা জীবন বেশিদিন কাটে না। তারা পছন্দ করতো 'অলড়াস হাক্সলিকে', আমি পছন্দ করতাম 'আপটন্ সিনক্লেয়ার'কে। আপটন্ সিনক্লেয়ারের 'দ্য জানগল' আমার প্রিয় উপন্যাস। তাদের ভালো লাগতো 'থ্যাকারেকে' আমার ভালো লাগতো ডিকেন্সকে। তারা বলতো অলডাস্ হাক্সলি শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, আমি বলতাম অলডাস হাক্সলি উপন্যাস লিখতেই জানেন না। তাঁর চেয়ে বেশি ভালো লেখেন 'ইশারউড্'। আমার মতে ইশারউডের 'গুডবাই টু বালিন' ভালো উপন্যাস। তাদের মতে হাক্সলি'র 'পয়েন্ট—কাউন্টার-পয়েন্ট' বেশি ভালো উপন্যাস।

এই রকমই তর্ক চলতো সব সময়ে।

'সমারসেট মম্' তারা পছন্দ করতো না, কারণ তাঁর উপন্যাস পড়ে সবাই বুঝতে পারে। তাঁর আর একটি অপরাধ, তাঁর বই খুব পপুলার। তাঁর চেয়ে 'মাইকেল আরলেন' আরো বড় লেখক। কারণ তাঁর বই পড়তে বিদ্যে-বুদ্ধির দরকার

হয়, আর তাঁর আর একটি গুণ মাইকেল আরলেন বিরাট বড়লোক। লন্ডনের যত মটরগাড়ি আছে তার চেয়ে 'মাইকেল আরলেনে'র গাড়ি এক ফুট বেশি লম্বা। মাইকেল আরলেনের গাড়িতে কোনও নম্বর প্লেট নেই, নম্বর প্লেটের জায়গায় বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকেঃ মাইকেল আরলেন। যেমন এখানকার নেটিভ-স্টেটের রাজাদের বেলায় থাকতো। কুচবিহার মহারাজার গাড়িতে ইংরেজীতে লেখা থাকতো 'কুচবিহার স্টেট্', মাইকেল আরলেনের গাড়িতে তেমনি লেখা থাকতো তাঁর নিজের নাম। এটাই ছিল তাঁর ঐশ্বর্য্যের রবার-স্ট্যাম্প।

কিন্তু সেই ঐশ্বর্য্য আমাকে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। ঐশ্বর্য্য মানেই অর্থের প্রাচুর্য্য। অর্থের প্রাচুর্য্য কোন দিনই আমাকে আকর্ষণ করেনি। যে-কারণে পার্থিব সুখ-সম্পত্তির চাইতে ইন্দ্রিয়াতীত সুখ-সম্পত্তির দিকে আমার আজীবন লোভ।

তারা বলতো, 'পিকাসো' বড় শিল্পী, কারণ তাঁর ছবি বহু কোটিপতির বাড়িতে কোটি কোটি টাকা দিয়ে কিনে দেওয়ালে টাঙানো থাকতো। আমার কাছে বেশি ভালো লাগতো 'রেমব্রাণ্টে'র বা 'দ্য ভিঞ্চির' ছবি। আর্কিমিডিস থেকে আইনস্টাইন পর্যন্ত বিজ্ঞানের অনেক অমূল্য আবিষ্কার আজ আমাদের বোধগম্য হয়েছে কিন্তু 'মোনালিসা'র হাসির রহস্য আজও রহস্যই হয়ে রয়েছে।

আমার বন্ধুরা আমাকে বলতো—তোমার দ্বারা লেখক হওয়া সম্ভব নয়, কারণ তুমি মদ খাও না, সিগারেট খাও না, কোনও নেশা করো না—নেশা না করলে কি শিল্পী হওয়া যায়? বোহেমিয়ান না হলে কি লেখক হওয়া যায়?

আমি উদাহরণ দিতাম আপটন্ সিনক্লেয়ারের। আপটন্ সিনক্লেয়ার তো জীবনে কখনও বিড়ি সিগারেট বা মদ কিছুই খান নি। তিনি তাহলে কী করে লেখক হলেন?

এমন দিন গেছে যখন আপটন্ সিনক্লেয়ার রাতের পর রাত শুঁড়িখানায় শুঁড়িখানায় নিজের বাবাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। কোথাও তাঁকে তিনি খুঁজে পান নি। সংসার খরচের সমস্ত টাকা নিয়ে বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। বাড়িতে ছেলে-মেয়েরা কি খাবে তাও যেন তাঁর ভাববার কথা নয়। মার তখন পাগলের মত অবস্থা। ছেলে-মেয়েরা বাড়িতে কী খাবে তার সংস্থান নেই। আপটন্ সিনক্লেয়ার অনেক কষ্টে শেষ কালে খুঁজে পেলেন তাঁর বাবাকে এক তাড়িখানায়। তিনি সেই মাতাল বাবাকে কাঁধে তুলে নিয়ে অতি কষ্টে তাঁকে বস্তি-বাড়ির ভেতরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। মা সঙ্গে সঙ্গে বাবার প্যান্টের পকেটে হাত গুঁজে দিয়ে যে-কটা পয়সা পেলেন তুলে নিলেন। সেই দিয়েই তাঁর ছেলে-মেয়েদের মুখে কিছু গুঁজে দিতে পারবেন। ছেলে-মেয়েরা ক্ষিধের জ্বালায় উপোস করে মরবে আর তাদের বাপ সব টাকা শুঁড়িখানায় উজাড় করে ঢেলে দেবে তা তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

বাবা ছিলেন হুইস্কির সেলসম্যান। মদ ফেরি করাই ছিল তাঁর জীবিকা। কিন্তু বেহিসেবী। জীবনের ছ'টি বছর আপটন্ সিনক্লেয়ার ক্ষিধেয় ছট্‌পট্ করেছেন। কাকে বলে ক্ষিধে, কাকে বলে দারিদ্র্য তা তাঁর মত নিবিড় করে আর কেউ অনুভব

করেননি। দশ বছর বয়েসের আগে তিনি কাকে বলে ইস্কুল তা জানতেন না। তাঁর দুই বন্ধু এবং লেখক 'জ্যাক্ লন্ডন' আর 'ইউজিন ভি ডেবস্' যে খুব অল্প বয়েসে মারা যান তার একমাত্র কারণ অত্যধিক মদ্যপান। কিন্তু আপটন সিনক্লেয়ার সেই অল্প বয়সেই 'ডিকেন্স' আর 'থ্যাকারে'র সমস্ত রচনাবলী পড়ে শেষ করে ফেলেছেন। যখন তিনি কলেজে ঢুকলেন তখন তিনি নিজের আর মা'য়ের খরচ চালাতেন শুধু লিখে। সমস্ত রাত জেগে তিনি মাসে দুটো করে উপন্যাস লিখতেন আর সেগুলো সস্তা পত্রিকায় লিখে লেখাপড়া আর মায়ের খরচ-পত্র চালাতেন। কারণ তাঁর মাথার ওপর কেউ ছিল না তাঁদের পালন-পোষণ করবার। কলেজ থেকে যখন বেরোলেন তখন তাঁর বয়েস মাত্র কুড়ি। সেই বয়েসেই তিনি বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কাগজে গল্প লিখে সপ্তাহে সত্তর ডলার উপায় করতেন। তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তিনি পৃথিবী থেকে অন্যায় অবিচার আর দারিদ্র্য দূর করবেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন চিররুগ্না। একবার তাঁর স্ত্রী দোকান থেকে তিরিশ সেণ্ট্ দিয়ে একটা বাহারি টেবিল-ক্লথ্ কিনে এনেছিলেন। তিনি রেগে গিয়ে সেটা দোকানদারকে ফেরত দিতে বাধ্য করেছিলেন,—কারণ তিরিশ সেণ্ট মানে একদিনের খাওয়া খরচ।

আমি যখন প্রথম আপটন্ সিনক্লেয়ারের লেখা 'দে কল মী কারপেণ্টার' পড়ি তখনই অবাক হয়ে যাই। তখন আমার বয়স কুড়ি। তাঁর ষষ্ঠ বই হচ্ছে "দ্য জানগল' ; এবং সেই বইটা দেশের পাঠক-সমাজে ঝড় তুললো। সেই বই লিখে তিনি উপায় করলেন তিরিশ হাজার ডলার। সেই টাকা দিয়ে তিনি একটা কলোনী গড়ে তুললেন "নিউ জার্সি" নদীর ধারে। সে এমন এক সমবায় প্রতিষ্ঠান যেখানে সাহিত্যিক শিল্পী আর সঙ্গীতজ্ঞরা নীরবে নিভৃতে নিঃসংকোচে সাধনা করতে পারবেন। পরবর্তীকালের সুবিখ্যাত লেখক সিনক্লেয়ার লুইস সেখানে থাকতেন। তাঁর কাজ ছিল উনুনে আগুন দেওয়া। কিন্তু একদিন তাঁরই ভুলে বাড়িটাতে আগুন লেগে ভস্মসাৎ হয়ে গেল। সে-পরিচ্ছেদের সেখানেই শেষ। তারপর কতবার তিনি কত চেষ্টা করেছেন মানুষের ভালো করবার তার হিসেব নেই। এই সমাজ সংস্কারের জন্যে তিনি জীবনে চার বার জেল পর্যন্ত খেটেছেন।

এ-সব কথা কাকে শেখাবো, কাকে শোনাবো ? আমার বন্ধুরা তখন মদ-সিগারেট আর তাস খেলায় মত্ত থাকতেন সারাদিন। আর আমি ছিলাম তাদের প্রতিবাদী। আমি বলতাম—ও সব ছাই-ভস্ম কেন গেল ? ও-সব ছাই পাঁশ কেন খাও ?

তারা আমার ওপর রাগ করতো না, শুধু আমাকে কৃপা করতো। বলতো—তুমি তো জানলে না অমৃতের কী স্বাদ—

শেষ জীবনে প্রতিদিন আমি সকাল সাড়ে আটটার সময় শৈলজানন্দের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতাম। এখনও তাঁর একটা কথা আমার মনে আছে। তিনি বলতেন—বিমল, আমি হাতের সুখে গড়েছি আর পায়ের সুখে ভেঙেছি—

তাঁর কথা শুনে আমার খুব কষ্ট হতো। আমি বলতাম—আপনি দেখবেন আপনার মৃত্যুর পর আপনার খুব খ্যাতি হবে!

তিনি বলতেন—তা হয়ে আর কী হবে, তখন তো আমি আর তা দেখতে

পাবো না—

আমি বলতাম— আপনি অত মিটিং-এ যান কেন ? ওতে তো শুধু সময় নষ্ট—

তিনি বলতেন—না, বিমল, সময় নষ্ট নয়, আমার মিটিং-এ যাওয়ার একমাত্র কারণ আমার নাম খবরের কাগজে উঠবে। লোকে জানবে যে আমি এখনও বেঁচে আছি—

এর পর আমার আর কিছু বলবার থাকতো না। তাঁর ওপর যে আমার কত শ্রদ্ধা ছিল তা কেবলমাত্র তিনিই জানতেন। তাই আমার কাছে তিনি অকপটে সব কথা বলতেন। আমি তাঁর খুব অনুরাগী ছিলাম বলেই তাঁর একটা বই 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' 'নিউ এজ্' থেকে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। আর তাঁর শেষ বইটা প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম 'মিত্র ও ঘোষ' থেকে। বইটার নাম 'নিবেদনমিদং'।

গ্যেটে একটা কথা বলে গিয়েছিলেন। আমি সেটা কণ্ঠস্থ করে রেখেছি। তিনি লিখে গিয়েছিলেন—"Everyone believes in his youth that the world really began with him, and that all merely exists for his sake."

এই কথাটা দেখেই আমার নতুন চিন্তা মাথায় এল। ভাবলাম আমিও তো তাই ভেবে এসেছি। আমিও তো ভেবে এসেছি যে যেদিন আমি এই কলকাতায় জন্মেছি সেইদিন থেকেই এই কলকাতার সৃষ্টি হয়েছে। তার আগে কলকাতার অস্তিত্বই ছিল না। আর যা কিছু এখানে আছে সমস্তর ওপরেই আমার ভোগ করবার অধিকার আছে। কিন্তু আমার জন্মের আগে যদি এই কলকাতার অস্তিত্ব থেকে থাকে তো তাহলে সে কোন্ কলকাতা ? সে কলকাতার সৃষ্টি কেমন করে হলো ?

তখন থেকে লাইব্রেরীতে গিয়ে বই পড়তে শুরু করলাম। ইতিহাসের বই। বিশেষ করে সভ্যতার ইতিহাস। একটা বই পেলাম। বইটার নাম 'A Survey of World Civilization.' জামোবোডা থেকে প্রকাশিত এবং সম্পাদিত। উইল-ডোরাণ্টের লেখা বই 'Our Oriental Heritage.' আর পড়লাম—Crane Briton, John. B. Christopher এবং Robert Lee রচিত 'A History of Civilization.'

সেই তখন দেখতে পেলাম যে 'কলকাতা'র জন্ম ১৬৯০ সালের ২৪শে আগস্ট। যেদিন জোব চার্ণক পাল তোলা নৌকা করে এসে প্রথম নামলেন এই জলাজমির দেশে, এসে প্রথম পা দিলেন। তখনই জানতে পারলাম যে আমার জন্মের আগেও এই কলকাতা ছিল, এবং আমার মৃত্যুর পরেও এই কলকাতা থাকবে। তখনই ঠিক করলাম যে ইংরেজদের আসার পর থেকে ইংরেজদের চলে যাওয়ার দিন পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে একটার পর একটা মোটা-মোটা উপন্যাস লিখে যাবো।

মনে মনে একটা কাহিনীও তৈরি করতে লাগলাম। সে-কাহিনী কী রূপ নেবে তা আমি তখনও জানতাম না। উপন্যাস কী করে লিখতে হয় তা আমি জানতাম। কিন্তু যাকে বলে এপিক্ উপন্যাস তা লেখবার আদব-কায়দা আমার জানা ছিল না।

কিন্তু শোনা ছিল ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ সাহেব আর ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। তা থেকে একটা বিদ্যে শিখে নিয়েছিলাম। সে-বিদ্যেটা হলো কোন্‌টা গ্রহণ করবো আর কোন্‌টা বর্জন করবো তারই শিক্ষা।

সবচেয়ে যে-প্রশ্নটা আমাকে বেশি ভাবিত করে তুললো সেটা হচ্ছে সাহিত্য কী? মানুষের জীবনে সাহিত্যের কী প্রয়োজনীয়তা?

এইটে সব চেয়ে আগে জানা দরকার। কিন্তু এ-কথা কোন্ বই পড়ে জানতে পারবো?

আমরা জানতাম 'সহিত' শব্দ থেকেই সাহিত্য এসেছে। কিন্তু না, শুধু সাহিত্য নয়, সাহিত্য মানে তাকেই বোঝায় যা রসের সহিত থাকে। তার মানে এমন রসের সঙ্গে থাকা যা সকলের প্রিয় হবে, যা স্বাধীন হবে, অর্থাৎ যা পরের ইচ্ছের অধীন থাকবে না। হিরন্ময় পাত্র দিয়ে সত্যের মুখ সব সময় ঢাকা থাকে। সেই সত্যকে প্রকাশ করবার জন্যে অনেক কষ্ট করতে হয়, অনেক তপস্যা, অনেক সাধনা করতে হয়। সত্য বরাবর ঢাকা থাকার কারণ এই জন্যে যে যার চিত্ত অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি দ্বারা পীড়িত নয় সে যেন সহজে সেই সত্যকে দেখতে না পায়। হিতের আর এক মানে হলো সন্নিহিত, অর্থাৎ সকলের কাছাকাছি থাকা, সকলের আত্মীয় হওয়া। যা সকলকে কাছে আনে তার নামই সাহিত্য।

কিন্তু সাহিত্যের আর এক তত্ত্ব হলো 'প্রহিত'। অর্থাৎ যা তুমি নিজে পড়েছ বা অন্যলোক যা তোমাকে পড়িয়ে শুনিয়েছে এবং যা অন্যের খবর তোমার কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। এই কাজ এত শক্ত যে রচনা করবার আগে রক্তাক্ত হতে হবে রচনাকারকে। আর যা সৃষ্টি করে রচনাকারের মনে হবে তিনি অকৃতকার্য হয়েছেন। অর্থাৎ সৃষ্টির আগেও তাঁর যে কষ্ট ছিল, সৃষ্টির পরেও অকৃতকার্যতার জন্যে তাঁর ব্যর্থতা-বোধের যন্ত্রণা তাঁকে আরো অনেক বেশি কষ্ট দেবে।

এই যে আগে 'সহিত' বা 'হিতের' কথা বলেছি, তার আসল অর্থ হলো 'বিহিত' অর্থাৎ যার দ্বারা সংসার রূপান্তরিত হয়, যার দ্বারা নতুন বিসৃষ্টি হয়, সংসারের নব নির্মিতি হয়। যার দ্বারা সাহিত্যিক তাঁর সৃষ্টি দ্বারা নিজেকে এবং পাঠককে অমরত্ব প্রদান করেন, নিজেকে এবং পাঠককে মৃত্যু-ভয়রহিত করেন। সাহিত্য এইভাবে পাঠককে মুক্তির আস্বাদ পরিবেশন করে।

এর পরে আরো একটা প্রশ্ন আসে। সে প্রশ্নটা হলো সাহিত্য সমাজের জন্যে না সাহিত্য সাহিত্যের জন্যে? পাশ্চাত্ত্য দেশে এই প্রশ্ন তখনই উঠলো যখন সে দেশে সাহিত্য জীবনের প্রয়োজন না হয়ে সেটা অহংকারের তুষ্টি বিধান করতে আরম্ভ করলো। আর সাহিত্য উপজীব্য না হয়ে উপজীবী হয়ে উঠলো। রাজনীতিকরাই এই শ্লোগান দিতে লাগলো যে 'সাহিত্য সমাজের জন্যে'। আর তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে এক নতুন স্লোগান উঠলো যে 'সাহিত্য সাহিত্যের জন্যে'।

আসলে এই সমস্ত কূট তত্ত্ব আমি তখন যে বেশ ভালোভাবে স্পষ্ট করে বুঝেছিলাম তা নয়। অল্প বয়েসের অভিজ্ঞতায় আমি যে-টুকু বুঝেছিলাম সে-টুকু সম্বল করেই আমি কাজে নেমে পড়েছিলাম। কেবল সব সময় রবীন্দ্রনাথের এই সামান্য কথাটুকু মনে রেখেছিলাম যে "যাহা অবহেলায় রচিত তাহা অবহেলার সামগ্রী'। তাই সব সময় যন্ত্রণা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলাম। কাকে বলে রাত, কাকে বলে দিন তা তখন খেয়াল রাখতাম না। তখন আমার আর একটা সুবিধে ছিল

এই যে, সে-সময়ে আজকালকার মত "সাহিত্য-পুরস্কারে"র অত্যাচার ছিল না, তাই সেদিন শরৎচন্দ্রের একটা কথাকে আমি সাহিত্যের মূলমন্ত্র হিসেবে মনে মনে জপ করতাম। সে-কথাটা হচ্ছে "বর্তমান কালটাই সাহিত্যের সুপ্রীম-কোর্ট নয়।"

আমি ওপরের কথাগুলো স্মরণ করে একদিন আমার উপন্যাস লিখতে বসে গেলাম। নাম দিলাম "সতী বিলাপ"।

আমার উপন্যাস লেখা আরম্ভ করবার খবর বন্ধুরাও জানতে পারলে। তারা তখনও বলতে লাগলো—তুমি মদ খাও না, সিগারেট খাও না, চা খাও না, পান খাও না, তোমার কিস্সু হবে না। নেশা না করলে লেখক হওয়া যায় না—

কিন্তু তাদের কথায় যেমন আমি তখন হতোদ্যম হইনি, এখন এই বৃদ্ধ বয়সেও কারো নিন্দা বা অপমানে বিচলিত হই না, এবং কারো প্রশংসাতেও বিচলিত হই না। এটা অভ্যাস করা বড় কষ্টকর জেনেও এখনও এইটে হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা চালিয়ে আসছি!

এখনকার মত তখন এত লোড্-শেডিংও ছিল না। দিন-রাতই লিখতাম। যখন বড় নিঃসঙ্গ লাগতো তখন পুরোন বন্ধুদের বালিগঞ্জের বাড়িতে গিয়ে বসতাম। তখন সেখানে তাদের তাস খেলা চলছে। সকলের পাশে মদের গেলাস, আর আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। তাদের সকলের নিজের নিজের হাতের তাসের দিকে দৃষ্টি-নিবদ্ধ। আমি তখনও তাস চিনতাম না, এখনও চিনিনে। কিন্তু তাদের চিৎকার উচ্ছ্বাস উল্লাসের শব্দ আমার কানে এসে বিঁধত। আমার সঙ্গে সব সময়ে আমার লেখার ফ্ল্যাট্-ফাইলটা থাকতো। তারা যখন তাস খেলায় উন্মত্ত, তখন আমি ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে বসে আমার "সতী বিলাপ" নিয়ে একমনে লিখতাম। মেঝের ওপর ফরাস পাতা। সেখানেই তারা তাসের জুয়ার জয়-পরাজয় নিয়ে এতই ব্যস্ত এবং এতই বিব্রত যে আমার দিকে চেয়ে দেখবার অবসরও হতো না তাদের।

যদি কোনও দিন আমার দিকে তাদের নজর পড়তও তো জিজ্ঞেস করতো—কী করছো হে, উপন্যাস লিখছো? কেন ও-সব ছাই-ভস্ম লিখছো? তোমার লেখক হওয়া হবে না।—

ব'লে যে-যার গেলাসের অমৃতে চুমুক দিত।

আমি যেমন এখনও সহ্য করি তখনও তা তেমনিই সহ্য করতাম।

'দেশ' পত্রিকার সাগরময় টেলিফোনে জিজ্ঞেস করতেন—"সতী বিলাপ" কত দূর হলো?

আমি বলতাম—এগোচ্ছে—

—কত স্লিপ্ লিখলেন?

আমি বলতাম—এই পঞ্চাশ স্লিপের মতন—

—এত কম কেন?

বলতাম—বড্ড কষ্ট হচ্ছে। আমার তো মাত্র একটা চোখ। এক চোখ দিয়ে লিখতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

পরদিন থেকে আরো রাত জাগতে সুরু করলাম। শরীর যায় যাক, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। যেমন করেই হোক, মন্ত্রের সাধন করতেই হবে। কোনও নেশা আমি করবো না। মদ সিগারেট বিড়ি পান চা কিছু খাবো না। সত্যের মুখ হিরন্ময় পাত্রের দ্বারা আবৃত রয়েছে, তা আমাকে উদ্ঘাটন করতেই হবে। যত আংশিক'দর্শনই হোক আমি সত্যের সম্পূর্ণ স্বরূপ দেখবোই।

হঠাৎ বন্ধুদের চিৎকারে আমার ধ্যান ভেঙে যেত। সে-চিৎকারের মানে আমি বুঝতে পারতাম না। কারণ আমি তাসের রহস্য বুঝি নে। তাদের খেলা সুরু হতো দুপুর বেলা। আর আমি গিয়ে যখন হাজির হতাম তখন সন্ধ্যে সাড়ে ছটা সাতটা। সেই তখন থেকে রাত ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত লিখে আমি চলে আসতাম। আর তারা খেলতো রাত তিনটে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত।

এমনি রোজ!

সেদিনও গিয়েছি ওখানে। ওরা একবার গেলাসে চুমুক দিচ্ছে আর তাস খেলছে। হঠাৎ একজন চিৎকার করে উঠলো—'সাহেব বিবি গোলাম'—'সাহেব বিবি গোলাম'—

সে-চিৎকারে আমিও চমকে উঠলাম। এই তো, এতদিন পরে পেয়ে গিয়েছি! আমি তো এতদিন ধরে এই জিনিসটাই খুঁজছিলাম! 'সাহেব বিবি গোলাম'— 'সাহেব বিবি গোলাম'—

পর দিন 'দেশ' পত্রিকার সাগরময় আবার জিজ্ঞেস করলেন—"সতী বিলাপ" কতদূর হলো?

আমি বললাম—আর "সতী বিলাপ" নয়, একটা ভালো নতুন নাম খুঁজে পেয়েছি—

—কী নাম?

বললাম—সাহেব বিবি গোলাম—

সাগরময় বললেন—বাঃ খুব ভালো নাম পেয়ে গেছেন। এইবার আমাকে স্লিপ্ দিতে আরম্ভ করুন।

আমি বললাম—কাল থেকেই দিতে আরম্ভ করবো। কিন্তু এ আমার উপন্যাস নয়, এপিক উপন্যাস—

তা সে হচ্ছে আজ থেকে তিরিশ বছর আগেকার কথা। ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাস থেকেই 'দেশ' পত্রিকায় 'সাহেব বিবি গোলাম' প্রকাশিত হতে শুরু করলো। আর তখন থেকেই আমার যন্ত্রণার জীবন আরম্ভ হলো। আমার অকৃতকার্যতার যন্ত্রণা আর অসাফল্যের আনন্দ!

আমি লেখক হতে পারিনি

আমি কেন লেখক হতে গেলাম, এই সম্বন্ধে অল্প-কথায় কিছু লেখবার নির্দ্দেশ হয়েছে আমার ওপর।

কিন্তু আমার ধারণা এই যে পড়লেই যেমন কেউ পাঠক হয় না, তেমনি লিখলেও কেউ লেখক হয় না। তাই যদিও আমি অনেক বই লিখেছি কিন্তু তবুও আমি লেখক হতে পেরেছি বলে মনে করি না। অথচ এই গত পঞ্চাশ বছরে আমার নামে এমন চার-পাঁচশো বই ছাপা হয়েছে যা আমার লেখা নয়। অথচ ওনামে অন্য কোনও লেখকও নেই। তেমন কেউ থাকলে আমি তার সঙ্গে দেখা করে একটা মিটমাটের ব্যবস্থা করতে পারতাম। কিন্তু অনেক খুঁজেও তাকে আমি আবিস্কার করতে পারিনি। পৃথিবীর আর কোনও লেখকের ভাগ্যে এমন দুর্ভাগ্য ঘটেছে বলে আমি জানতে পারিনি। আমি যখন এই অভাবনীয় যন্ত্রণায় কষ্টভোগ করছি তখন অন্য লেখকরা নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছেন। আর মনে মনে বলছেন—বেশ হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে!

তবু যখন সম্পাদকের নির্দেশ হয়েছে তখন লিখতেই হবে আমার নিজের কথা। আর নিজের কথা মানেই হলো আমার যন্ত্রণার কথা। যে যন্ত্রণার তো কেউ সাক্ষী নেই যে সে জানাবে। সাক্ষী যদি কেউ থাকে তো সে মাঝ রাতের অন্ধকার আর শেষ রাতের কুয়াশা। যারা কথা বলতে পারে না, যারা বোবা। সুতরাং এখন আমাকেই আমার কথা বলবার দায়িত্ব নিতে হলো।

আমার পারিবারিক অবস্থা কোনও দিনই অস্বচ্ছল নয়। সুতরাং অর্থ আমার কাছে কোনও দিনই আকর্ষক বস্তু হিসেবে উপস্থিত হয়নি। কিন্তু যেটা আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু ছিল তা হলে মৈত্রী। ঘরে বাইরে এমন কোনও মিত্র পাইনি যে আমার মনের কথাগুলো শুনবে, যে আমাকে তার নিজের মনের কথাগুলো বলবে। অন্যের মনের কথা আমি শুনতে চাইলেও আমার মনের কথা শোনবার মত কোনও বন্ধু ছিল না।

সেইটেই ছিল আমার কাছে সব চেয়ে কষ্টকর অভিজ্ঞতা। সারা জীবনে মাত্র তিন বা চারজন ছিল আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গী। তার বেশি নয়। তারা সবাই কলকাতায় নানা দিকে ছড়িয়ে ছিল। তাই স্কুলে বা কলেজে গেলেই তাদের সঙ্গে দেখা করে বা তাদের সঙ্গে কথা বলে আমার নিঃসঙ্গতা কাটতো। আর বাড়িতে এসেই আবার সেই নিঃসঙ্গতার শিকার হয়ে পড়তাম। স্কুল কলেজের পাঠ্য বইএর মধ্যে পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হয়তো মিটতো। কিন্তু তেমন প্রীতির কোনও সন্ধান তাতে পেতাম না। আমি জানতাম যে একলা চলাই আমার বিধিলিপি। এবং বিশ্বাস করতাম যে সারা জীবন আমাকে একলাই চলতে হবে, এবং একলা চলার দুর্ভাগ্যের দায় বহন করতে হবে।

বাড়িতে দেখতাম আলমারিতে অনেক বই রাখা আছে। কিন্তু নাবালকদের কাছে সে-সব বই অস্পৃশ্য। তাই তারা তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে থাবতো। শুধু লেখকদের নামগুলো বাইরে থেকে দেখা যেত। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রভৃতি। নাবালক ছেলেদের ও-সব বই পড়তে দেবার নিয়ম ছিল না।

কিন্তু হঠাৎ দৈবক্রমে একটা অঘটন ঘটে গেল।

আমার তখন সতেরো বছর বয়েস। স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে সবে কলেজে ঢুকেছি।

ক্লাশের একজন সহপাঠী দেখলাম খুব সঙ্গীত ভক্ত। গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইতো। আমি তার গানে আকৃষ্ট হলাম। গান চিরকাল আমার প্রিয় সঙ্গী। একমাত্র গানের মধ্যেই আমি পরমার্থ খুঁজে পাই। বিশেষ করে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। সেই সহপাঠীর বাড়িতে গিয়ে আমি যখন তার গান শুনছি, শসে অগ্যান্‌ বাজিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে গাইছে, আর তার গান শুনতে শুনতে হঠাৎ আমার নজর পড়লো জানলার নিচের তাকের ওপর ধুলো-বালি মাখা একটা মোটা বই এর দিকে। বইটার নাম—'এ টেল অব্‌ টু সিটিজ্‌' আর লেখক হলেন 'চার্লস্‌ ডিকেন্স্‌'। একেবারে নতুন নাম আমার কাছে। ও নাম আগে কখনও কারো কাছে শুনিনি।

তার কাছে সেই বইটা চেয়ে নিয়ে বাড়ি চলে এলাম। কথা ছিল বইটা পড়ে তাকে ফেরত দেব। কিন্তু সেই বইটাই আমার কাল হলো। পর-পর সেই বইটা আদ্যোপান্ত প্রায় বার কুড়ি পড়লাম। তাই করতেই প্রায় দু'-বছর কেটে গেল। কিন্তু তবু তার কলা-কৌশলের চাবিকাঠিটা আবিষ্কার করতে পারলাম না।

আবিষ্কার করতে পারলাম অনেক পরে। তখন বি-এ ক্লাসে পড়ি। অনুপম ঘটক তখন খুব বিখ্যাত গায়ক। তার সঙ্গে আমার বহু বছরের ঘনিষ্ঠতা। সে জানতো আমি গান গাই এবং কবিতা লিখি। শুধু তাই-ই নয়, তখনকার নানা বিখ্যাত পত্রিকায় আমার গল্প ছাপা হয়। এবং তখন থেকেই আমি পর্য্যাপ্ত টাকা উপায় করি। সেই সুবাদে অনুপম আমাকে গান গাওয়া এবং গান লেখার জন্যে অনুরোধ করলে। সেই বয়েসেই রেডিওতে কয়েকবার গানও গেয়েছি। সে-গানও আমার নিজের লেখা। তাই অনুপম যখন আমাকে গান লিখতে অনুরোধ করলে তখন গান তো লিখলামই, তার সঙ্গে একটা আমার নিজের গলায় গাওয়া গানও রেকর্ড-বন্ধ হয়ে বাজারে বেরোল। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ আর ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর গান শোনার সৌভাগ্য হলো। তখন সেই সুবাদে সবচেয়ে ভালো লাগলো আবদুল করিম খাঁ সাহেবের ঠুমরি গান। এক-একটা গান তিনি গাইছেন দু'ঘণ্টা ধরে। আমার মনে হতে লাগলো আমি যেন গান শুনছি না, ডিকেন্সের লেখা কোনও উপন্যাস পড়ছি। আর সেই গান শুনেই এপিক উপন্যাস লেখার কলা-কৌশলটা শিখলাম। এক সঙ্গে গানও লিখছি গল্পও লিখছি বটে। কিন্তু তাতে মন ভরছে না। আমি তখন উপন্যাস

লিখতে চাইছি আর সে এমন উপন্যাস যা বাঙলা ভাষায় কখনও আগে লেখা হয়নি।

তখন কলেজের পড়া পড়বার সময় আর হয় না। সেটা পরীক্ষার আগে এক মাস রাত জেগে পড়লেই পাস করা যায়। কিন্তু উপন্যাস লিখতেই হবে। সেটা কী করে লিখি? তার জন্যে আরো উপন্যাস পড়তে হবে। কিন্তু সে-উপন্যাস কী করে পাই? শেষ পর্যন্ত পেলাম তেমন উপন্যাস। ধর্মতলার ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীর সন্ধান পেলাম এক দিন। সেখানে পেলাম রোঁমা রোঁলার 'জ্যাঁ ক্রিসতফ্' বা 'জন্ ক্রিস্তফার'। ভিক্টর হ্যুগোর-'লা মিজারেবল্', টলস্টয়ের 'ওয়ার এ্যান্ড পিস', প্রুস্তের 'রিমেম্ব্রেন্স্ অব্ দি থিংস্ পাস্ট্', ডস্টয়েভস্কির 'ব্রাদার্স কারমাজফ্'। সেগুলো পড়তে পড়তে একবারও মনে হলো না যে উপন্যাস পড়ছি, মনে হলো যেন ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁর গান শুনছি। সে-সব যখন শেষ করলাম তখন মনে হলো বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়ে দেখি। তখন বয়েস হয়েছে, বাঙলা উপন্যাস পড়তে আপত্তি নেই। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে কোথাও ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁকে খুঁজে পেলাম না। তাঁকে খুঁজে পেলাম শুধু 'রামায়ণ' আর 'মহাভারতে'। মনে হলো বাংলা ভাষায় বোধহয় কোনও এপিক উপন্যাস লেখা হয়নি।

এই সময়ে হঠাৎ হাতে এলো একটা অদ্ভুত বই। সে বইটার নাম 'কন্ফেশন্'। লেখক হলেন 'জ্যাঁ য্যাক্ রুশো'। সে বইটার প্রথম প্যারাগ্রাফেই লেখা রয়েছে— "আমি আজ যা করতে যাচ্ছি তা আমার আগে আর কেউই করেন নি। আমার এই বই পড়ে যদি কোনও পাঠক মনে করেন যে লেখক আমার চেয়ে বেশি বিদ্বান বা বেশি বুদ্ধিমান তাহলে বুঝবো যে আমার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হয়েছে।" পড়ে মনে হলো যে এতোদিনে আমি যেন সামান্য কিছু শিখেছি।

আর তারপর চললো আমার লেখক হওয়ার অমানুষিক সংগ্রাম। সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস লেখার যে কী যন্ত্রণা তা আমার মত আর কেউই জানে না। আর শুধু তো একটা নয়, পর পর অনেকগুলো। প্রথমে প্রকাশিত হলো 'সাহেব বিবি গোলাম'। সমস্ত দেশময় নিন্দে-কুৎসার ঝড় উঠলো। তারপর সম্পাদকের অনুরোধ এলো আরো বড় উপন্যাস চাই, অনেক বড়। কোথাও সংকুচিত করবেন না। তখন 'সাহেব বিবি গোলামে'র পর লিখলাম 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', তারপর 'একক দশক শতক', তারপর 'বেগম মেরী বিশ্বাস', 'পতি পরম গুরু', 'আসামী হাজির', 'এই নরদেহ'। আর শুরু থেকেই অনেক প্রকাশক আমার নামে প্রকাশ করতে লাগলেন চার-পাঁচশো নকল বই। যা আমার নিজের লেখা নয়। পৃথিবীর কোনও ভাষায় কোনও প্রকাশক আগে আর কখনও এমন জালিয়াতি করেন নি। আর তারই সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষায় আমার সব বইগুলির অনুবাদ। কেউ বা অনুমতি নিয়ে, কেউ বা বিনা অনুমতিতে। কেরলে শম্ভুশিবম্ নামে এক ভদ্রলোক গ্রামে গ্রামে কথকতা করে বেড়াতে লাগলেন আমার 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' কাহিনীটি। আর তারপর যখন 'একক দশক শতক, কথকতা করতে শুরু

রেছেন তখন তখনকার যুগের জরুরী-আইনের কবলে পড়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে চললো সব বইগুলোর সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, আর তারপর এখন ন্যাশন্যাল নেট ওয়ার্কের টি. ভি. সিরিয়াল।

এখন বৃদ্ধ হয়েছি। এখন আমার কাছে অনেকে আসে পরামর্শ নিতে। তারা জিজ্ঞেস করে—আমি লেখক হতে চাই, কী করলে লেখক হতে পারবো বলে দিন।

আমি জিজ্ঞেস করি পুরোপুরি সময়ের লেখক হতে চাও, না একটা বাঁধা চাকরির পর বাকি সময়ের লেখক হতে চাও?

কেউ বলে—পুরোপুরি সময়ের লেখক হতে চাই—

আমি তখন জবাব দিই—তাহলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে। জানো না ফ্রান্সের ভলটেয়ার বলে গেছেন 'তুমি যদি ভালো লেখ তাহলে সবাই তোমার সর্বনাশ করতে চাইবে, তার মানে সবাই তোমাকে হিংসে করবে। আর তুমি যদি খারাপ লেখ তাহলে সবাই তোমাকে অবহেলা করবে।'

তারা বলে—তা'হলে কী করবো? লেখক হতে পারবো না?

আমি বলি—কেন লেখক হতে পারবে না? নিশ্চয় হতে পারবে।

—কেমন করে?

আমি বলি—এটা তো সোজা কাজ। কোনও পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করো। তাদের লেখার প্রশংসা করো, দরকার হলে তাদের খোসামোদ করো। তাদের জন্মদিনে দামী-দামী উপহার দাও। তারপর বাড়ীতে তাদের নেমন্তন্ন করে, সম্বর্দ্ধনা দিয়ে তাদের খুশী করো।

তারা আমার কথা বুঝতে পারে না। বলে—আপনিও কি তাই করেছেন?

আমি বলি—আমি তা করিনি বলেই তো লেখক হতে পারিনি।

—কিন্তু আপনার বইগুলো তো সমস্ত ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। আপনার বই সিনেমায়, থিয়েটারে, যাত্রায়, টি-ভিতে দেখানো হয়েছে।

আমি বলি—কিন্তু সেটাই কি লেখক হওয়ার বড় প্রমাণ? দেখ রবীন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছেন "যে লেখক তাহার রচনার মধ্যে মনের সমস্ত অনুরাগ অর্পণ না করিবে সে কখনও সমস্ত লোকের মনের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারিবে না।" আমি তা হয়ত করতে পারিনি। হয়তো সেইজন্যেই আমার লেখক হওয়া হয়নি। আমার অনুরাগ দেওয়ার ব্যাপারে বোধহয় কোথাও ফাঁকি ছিল, সেই কারণেই বোধহয় আমি লেখক হতে পারিনি। নইলে আমার নামে এত নকল বই প্রকাশিত হয় কেন? আমায় সবাই এত হিংসে করে কেন? এত নিন্দে করে কেন?

———

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর শেষ অপ্রকাশিত রচনা

স্বর্গীয় ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর এই অপ্রকাশিত রচনাটির একটি পূর্ব-ইতিহাস আছে। আমার এক তরুণ পাঠক বন্ধু একদিন ডাক-যোগে দৈনিক সংবাদপত্র 'যুগান্তরের' একটি পৃষ্ঠা আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। 'যুগান্তর' পত্রিকাটি ১৯৫৭ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখের। পত্রিকার সম্পাকীয় পৃষ্ঠার একটি সংবাদ আমার লেখা "সাহেব বিবি গোলাম" উপন্যাস সংশ্লিষ্ট বলে ওই তরুণ বন্ধুটির এই অকৃপণ উদারতা। সংবাদটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি :

"……চুরাশী বছর বয়সেও শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে দেখা যায় আসরে আসরে এবং আজও বাড়ীতে বসে তিনি গানের দলকে তৈরী করছেন, হাজারো বার সুরের পুনরাবৃত্তি করে-করে। মহিলা সমিতি 'আলাপনী'র কাজ তো আছেই। তার মুখপত্র নতুন প্রকাশিত 'ঘরোয়া'র তদ্বির, প্রদর্শনীর জন্য শিল্প-সামগ্রীর সংগ্রহ তার খুদে-খুদে হিসেবনিকেশ—তা সত্ত্বেও ক'দিন আগে যেমনি এল আহ্বান, অমনি হাতে তুলে নিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্যের কাজ। গত ২৯শে ডিসেম্বর সান্ধ্য বিনোদনপর্বে চীনভবনে 'সাহিত্যিকা'র তরফ থেকে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর তিরাশি পেরিয়ে চুরাশী বছরে উপনীত হওয়া উপলক্ষে শুভ জন্মতিথি উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়েছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে মাল্যচন্দনে যথারীতি ইন্দিরা দেবীকে বরণ করা হলে পর আচার্য ক্ষিতিমোহন যেন প্রেরিত একটি শুভেচ্ছার বাণী পাঠ করে শোনান সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় মহাশয়। কয়েকটি সুমধুর গান ও সুলিখিত কবিতা গীতও পঠিত হয়। ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক মহল থেকেও স্বর্গত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের একটি অপ্রকাশিত গদ্য রচনা এবং ইন্দিরা দেবীর সদ্য-রচিত অপ্রকাশিত রচনার প্রথম শ্রুতি-আস্বাদনের সৌভাগ্য হয়েছিল সকালের সভার দু'দফা পাঠপ্রসঙ্গে। ইন্দিরা দেবীর লেখাটি ছিল শ্রীবিমল মিত্র রচিত 'সাহেব বিবি গোলাম' বইখানির সমালোচনা। আন্তরিক উদ্দীপনায় চিন্তার প্রাখর্যে অপূর্ব সরসতায় মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল তাঁর প্রতিটি কথা সমস্ত সভাকে। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর রায় উঠে বললেন—'আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে ক'জন এ লেখা লিখতে পারবেন জানি না—

এই বিবরণটি পড়ে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে আমার ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে একটি পত্র লেখবার লোভ হয়। তিনি আমার সেই ছোট পত্রটি পেয়ে একটি চমৎকার চিঠি লেখেন আমাকে। চিঠিটা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করি :

"কল্যাণবরেষু,—

তোমার 'সাহেব বিবি গোলাম' বইটি পড়ে আমার খুব ভাল লেগেছিল বলে আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে (এবং কতকটা অনুরুদ্ধও বটে) তার একটি সমালোচনা লিখি

সেটি এখানকার সকলের প্রশংসালাভ করেছে ও সেইজন্যই তাঁরা আমার গত জন্মদিনে পাঠ করে।

আমার বরাবরই ইচ্ছা ছিল, এবং সেটি অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, এই প্রশংসিত প্রশংসা-প্রবন্ধটি লেখকের চোখে পড়ে, যাকে উদ্দেশ করে সেটি লেখা। কারণ মহাকবি বর্ণিত 'করুণা'র ন্যায় প্রশংসাও, যে করে এবং যে পায় উভয়কেই আনন্দ দান করে।

তাই তুমি নিজে থেকেই এ বিষয়টি উত্থাপন করেছ দেখে সুখী হয়েছি। এবং জানাবার জন্য লিখছি যে, যতদূর জানি প্রবন্ধটি বর্তমানে 'দেশ' সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষের কাছে আছে। আমার নাম করে তাঁকে বললে তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে সেটি দেখতে দেবেন, এবং তুমিও পড়ে খুশী হবে আশা করি। সেটি প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁদের কী অভিপ্রায়, আমি ঠিক জানিনে।

আঃ

২৯. ১. ৫৭ ইন্দিরা দেবী

শেষ পর্যন্ত একটি বিশেষ কারণে এই রচনাটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পথে অনেক বাধা আসে। অগত্যা সম্পাদকের কাছ থেকে প্রবন্ধটি সংগ্রহ করে আমি নিজের কাছে এনে রাখি।

আজ থেকে তেরো বছর আগে 'সাহেব বিবি গোলাম' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে বাংলা ভাষার পত্র-পত্রিকায় এই 'সাহেব বিবি গোলাম' গ্রন্থ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ সম্বলিত নিন্দের ঝড় বয়ে যায়। ব্যক্তিগতভাবে কুৎসা-কটূক্তি থেকেও আমি সেদিন রেহাই পাইনি। বাঙলা সাহিত্যের গবেষকদের কাছে অবশ্য সে সংবাদ অজ্ঞাত নয়। আমার সাহিত্য-জীবনের সেই দুর্যোগের দিনে অনেক-বার অনেক প্ররোচনা সত্ত্বেও এই অমূল্য প্রবন্ধটি আমার গ্রন্থের বিজ্ঞাপন হিসেবেও এটিকে ব্যবহার করে এর যে অমর্যাদা করিনি, তার একমাত্র কারণ স্বর্গীয়া ইন্দির দেবীর উপর আমার অগাধ শ্রদ্ধা। তিনি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ঔদার্যে, মাধুর্যে, মনুষ্যত্বে সরলতায়, আন্তরিকতায় আদর্শ স্থানীয়া। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় দূরের কথা, চাক্ষুষ পরিচয়ও ছিল না। সেই একবার মাত্র ছাড়া তাঁর সঙ্গে আর কখনও পত্র-ব্যবহারও করিনি। সেদিন সমস্ত বাংলাদেশের তাবৎ পত্র-পত্রিকা যখন আমার নিন্দা-কুৎসায় মুখর, তখন তিনি যেভাবে এই গ্রন্থকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তারপর আর আমার কোনও পাওনা বাকি ছিল না। তাই সেদিন তাঁর প্রবন্ধকে অস্ত্র হিসেবে কিম্বা বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার করে তাঁর অমর্যাদা করতে আমার বিবেকে বেধেছিল।

আজ সেই অপ্রকাশিত প্রবন্ধটি "সাহেব বিবি গোলাম"-এর নতুন সংস্করণের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁর স্বর্গত আত্মার প্রতি আমার অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম।

ইতি—বিমল মিত্র

সাহেব বিবি গোলাম

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

এতদিন 'সাহেব বিবি গোলাম' বইখানিতে মশগুল ছিলেম। শেষ হয়ে গিয়ে খালি খালি লাগছে। যেন বহুদিনের বন্ধু-বিচ্ছেদ হল, সঙ্গহারা হয়ে পড়লেম। সেই সঙ্গসুখ আরও কিছুদিন টেনে রাখবার জন্যে ইচ্ছে হল বইখানির একটা সমালোচনা লিখি, তবু তো সেই সব লোক নিয়ে আবার কিছুদিন নাড়াচাড়া করতে পারব।

লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি যে যদিও আমি খুব গল্প-ভক্ত, তবুও বাঙলা গল্পের বই খুব কমই পড়ি, বিশেষতঃ আজকাল। খবরের কাগজই আমাদের বেদ কোরাণ, বাইবেল। দিনান্তে একবার সে নিত্যকৃত্য সমাপন করতেই হয়, তা একঘেয়েই লাগুক আর ঝিমুনিই পাক। তার উপর যদি কখনো ছেলেপিলের পড়বার টেবিলে ইংরিজি কোন পুরানো টিকটিকির বই পড়ে থাকতে দেখি গোপনে নেশাখোরের মত সেটা সংগ্রহ করে রাত ১২টা/১টা পর্যন্ত উপভোগ করি। এহেন লোকের হাতে কি সূত্রে 'সাহেব বিবি গোলামে'র মত মস্ত মোটা একটা বাঙলা বই এসে পড়ল, তা ঠিক মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে যে প্রথম ক'পাতা পড়েই নেশা ধরেছিল, তারপর কে একজন বিনা বাক্যব্যয়ে বইটি পড়তে নিয়ে গেল এবং মলাট ছেঁড়া অবস্থায় ফেরত দিলে। তারপর থেকে যে ধরেছি। শেষ করে তবে ছেড়েছি; খবরের কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ঘড়ির প্রতিযোগিতা কিছুতেই আটকাতে পারেনি। দুঃখের বিষয় সব জিনিসেরই শেষ আছে।

শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন যে "মলাট সমালোচনা" নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। আমিও মহাজনের পন্থানুসরণপূর্বক মলাট থেকে সমালোচনা শুরু করছি, আমার একটি ইঁচড়ে-পাকা নাতি মনে করেন সমালোচনা মানেই বিরুদ্ধ আলোচনা। যদিও আমি তাঁর মতে সায় দিইনে, তবে মনে করি যে বিরুদ্ধ সমালোচনা যা আছে (কিছু ত থাকবেই) তা আগেভাগে সেরে ফেলাই ভাল। তারপর মধুরেণ সমাপয়েৎ।

মলাটের ছবিগুলির মধ্যে সাহেবের (অর্থাৎ বাবুর) প্রতিকৃতিটি ভাল হয়েছে, অর্থাৎ বাবরিকাটা চুল, সাফরঙ ও হাতে ফরসীর বর্ণনার সঙ্গে মিলেছে। কিন্তু বিবির (বা বউয়ের) ছবিটি আমার মনঃপূত হয়নি। অবশ্য যে সৌন্দর্য লেখনীতে ফোটে এ পর্যন্ত তুলিতে কেউ তা ফোটাতে পারেনি। শকুন্তলা বা পার্বতীর ছবি কি কেউ কালিদাসের কবিতার সমতুল্য আঁকতে পেরেছেন? তবু ছোট বউয়ের সুন্দর, সূক্ষ্ম, সরস রূপ-বর্ণনার তুলনায় ছবিটি নিতান্ত নিরেশ হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু 'গোলামে'ই আমার সবচেয়ে বেশী আপত্তি। আমাদের ত স্মৃতি পৌনে শতাব্দীতে পর্যন্ত পিছিয়ে যায়, কিন্তু কোন বড়বাবুর বা বড় সাহেবের চাকর

বা খানসামার এ রকম বেশ দেখেছি বলে ত মনে পড়ে না। হয়ত হিন্দুস্থানী দারোয়ানের মাথায় এ রকম পাগড়ী ও পরনে এ রকম মালকোঁচা মারা ধুতি থাকতে পারে, কিন্তু গোঁফজোড়া সত্ত্বেও চেহারা নেহাৎ অর্বাচীন। ওকে দেখলে কি চোর-ডাকাত ভয় পাবে?

যা হোক মলাট ছেড়ে এখন দেউড়িতে ঢোকা যাক, নইলে কোনদিনই গৃহপ্রবেশ হবে না। বোধ হয় বইয়ের মুখপাতটা প্রথম থেকেই যে আমার ভাল লেগেছিল, তার কারণ জোড়াসাঁকোর মহর্ষি ভবনের সঙ্গে বড়-বাড়ির চেহারার অনেকটা মিল পেয়েছিলাম। কি ভাগ্যি ঐ বাইরের মিল ছাড়া আর বেশি দূর এগোয় নি। ঐ রকম বাড়ির ভিতরে যাবার পথে রেলিঙ ঘেরা সরু বারান্দা তার উপর থেকে ঝুঁকে দেখলে নিচে রান্নাঘরের রোয়াকে বসে দাসীরা বাটনা বাটছে, কুটনো কুটছে ও নর্দমা দিয়ে মশলা ধোওয়া রঙীন জল গড়িয়ে যাচ্ছে—এ দৃশ্য আমি জোড়াসাঁকোয় ৬নংয়েও দেখেছি, ৫নংয়েও দেখেছি। তফাতের মধ্যে ঠাকুর বংশ বৈষ্ণব ছিলেন বলে কুটনো কোটা না বলে আমরা তরকারী বানানো বলতুম। তারপর নানা মহলের ভিতর দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে বেঁকতে-বেঁকতে ঘুরতে-ঘুরতে অন্দর মহলে পোঁছনো যেত। ওদিকে বার-বাড়ির দরাজ উঠান, তার এক পাশে পুজোর দালান, দেউড়ির একদিকে তোষাখানা, আর একদিকে খাজাঞ্চিখানা, দোতালায় (?) বৈঠকখানা, সবই মিলে যায়। কিন্তু এ সব তুলনামূলক বর্ণনা এখানে অবান্তর। সেকালের বনেদী বড়মানুষের সব বাড়িই বোধহয় মোটামুটি একই ছাঁচে ঢালা ছিল।

প্রথমেই বলেছি দোষের পালা আগে সেরে নেব। এতগুলি চরিত্রের মধ্যে প্রথম যিনি নায়ক—অর্থাৎ ভূতনাথ চক্রবর্তী—তাঁর চরিত্র কি বেশ ভালরকম ফুটেছে? তাঁর বাইরের চেহারা অন্ততঃ আমার কাছে তেমন পরিস্ফুট ত মনে হয় না। যখন মাঝে-মাঝেই শুনতে পাই তাঁর কেমন 'ভয় করতে লাগল', তখন সত্য কথা বলতে গেলে তাঁর প্রতি একটু অশ্রদ্ধাই হয়। তবে পাড়াগেঁয়ে মানুষ, প্রথম-প্রথম কলকাতার মত অত বড় শহরের অত বড় লোকদের কাণ্ডকারখানা দেখে একটু ভড়কে যাওয়া আশ্চর্য নয় বলে প্রথম দিককার অসহায় মনোভাব মার্জনীয়। বিশেষতঃ তাঁর একমাত্র ভরসাস্থল ব্রজরাখাল যখন অত শীঘ্র তাঁকে একলা ফেলে সরে পড়লেন।

স্ত্রীজাতির প্রতি কি ভূতনাথের একটু অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল? সেই বয়সে সখীদের কথা ত ক্রমাগত ঘুরে ফিরে মনে আসে দেখতে পাই। আর কলকাতার দুই দিকে দুই সুন্দরীর পাল্লায় পড়ে ত বেশ হাবুডুবু খেয়েছিলেন। তবে কখনো তাদের প্রতি কোন অসম্মান প্রদর্শন করেন নি, বা সুযোগ পেয়েও অশোভন ব্যবহার করেন নি, তা স্বীকার করতেই হবে। বরং সকল সময়ে তাদের উপকারই করবার চেষ্টা করেছেন। আর শেষ কাণ্ডে সংসারের সমস্ত বাঞ্ছিত সুখ-যাকে সংক্ষেপে কামিনীকাঞ্চন বলা যেতে পারে—করতলন্যস্ত আমলকীবৎ পেয়ে কি রকম অবলীলাক্রমে, কেমন অনায়াসে কলমের এক আঁচড়ে পরিত্যাগ করলেন, তা ভাবলে বাস্তবিক তাঁকে মহাপুরুষই বলতে ইচ্ছে হয়। তাঁর একটু কবিপ্রকৃতি, ভিতরে একটু

সাধুপ্রকৃতিও ছিল। পরিণামে শেষোক্তেরই জয়লাভ হল। এই সকল গুণের সংমিশ্রণে তাঁর স্বভাবটি খুব স্পষ্ট না হোক শেষ পর্যন্ত আকর্ষণীয়ই হয়ে উঠেছে। জবার চেহারাও স্পষ্ট নয়। শারীরিক সৌন্দর্য ত নয়ই, যদিও কানে শুনে আসছি যে সুন্দর। আর মানসিক ছবিও ভাল ফোটে নি। কেবল গোছাল ও কর্মক্ষম এই পর্যন্ত বোঝা যায়। তাই জন্যই কি সুপবিত্র'র মত অক্ষম, অসহায় মানুষের প্রতি একটা স্বাভাবিক অনুকম্পা অনুভব করেছিল? এ স্থলেও বলা যেতে পারে যে, ও বেচারা যেরকম সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুই সমাজের আওতায় মানুষ হয়েছিল, তাতে স্বভাবের মধ্যে বিপরীত টান থাকা আশ্চর্য নয়। বাইরের সাজসজ্জায় বিনুনী ঝোলানো ও লম্বা হাতার জামার বর্ণনা দিয়ে কতকটা ঐক্য আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেটা ত দেখছি ব্রাহ্মসমাজের ফ্যাশন বলে আজও গণ্য, অন্ততঃ রঙ্গমঞ্চে। যদিও আমার হাসি পায়, যখন ভাবি যে সুবিনয়বাবু যে শাখার ব্রাহ্ম, নিদেন তার শীর্ষস্থানীয় মহিলাদের আমি স্বচক্ষে দেখেছি হাতকাটা জামা পরতে। তবে বুককাটা পছন্দ করতেন না বটে।

সুবিনয়বাবু সদ্ব্রাহ্ম ও সদাশয় সরল প্রকৃতির মানুষ। তবে তাঁর উপদেশগুলি ভূতনাথ মনে-মনে যতই শ্রদ্ধা করুক না কেন, এই বইয়ের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যখন-তখন তুলে না দিলেও চলত। কারণ ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস এমন অজানা জিনিস নয়, আর বইখানি এমনিই যথেষ্ট বড় হয়েছে। তাঁর আচরণেই ত তাঁর ধর্ম প্রতিফলিত হয়েছে। তবে আবার পরিচিত আত্মীয় বন্ধু ও পূর্বপুরুষের এই সূত্রে নামোল্লেখ দেখে খুব ভালোই লাগে ও যেন ঘরোয়া মনে হয়। বিশেষতঃ জবার গানগুলির প্রত্যেকটি চেনাশোনা এবং এই এক জিনিসে অন্ততঃ তার বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে। কিন্তু সে এমন কিপ্‌টে হল কেন? সুবিনয়বাবুরও টাকার অভাব ছিল না। না সেটা কেবল ঠাকুরের চুরিবিদ্যে?

আবার বড় বাড়িতে ফিরে আসা যাক। বনমালী সরকার লেনের বাড়িটি ভূতনাথের মত আমাদের মনকে টানে। তবে এখানেও কতকগুলি সমস্যা সমাধান করতে পারিনি। বদরিকাবাবুর মত এমন একটা আস্ত পাগলা ওঁরা কেন এতদিন ঘরে রেখে পুষেছিলেন এবং তিনিই বা কেন পাগলা গারদের বাইরে রইলেন তা বুঝলাম না, তাঁর শেষ পরিণামও যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি বীভৎস ছাড়া আর কি বলব।

তারপরে বৃন্দাবনের সঙ্গে চুনীদাসীর কি সম্বন্ধ? সেটাও বলি-বলি করে শেষ পর্যন্ত খুলে বলা হল না। যার যা ইচ্ছে মনে করে নাও। ছোটবাবুই বা হঠাৎ বাড়িতে থেকে-থেকে অধৈর্য হয়ে আবার বেরুতে আরম্ভ করলেন কেন, তাও পরিষ্কার বোঝা গেল না। যদিও তার উপরেই গল্পের পরিসমাপ্তি নির্ভর করছে।

আর একটা আপত্তি তুলেই অভিযোগের পালা সাঙ্গ করব। ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ শুধু নয়, সমাজও বটে। যে কালে, যে সমাজে, যে রীতিনীতি প্রচলিত মোটামুটি সেইটেই লোকে মেনে নেয়, তার ভালমন্দ বিচারের জন্য বেশি কেউ মাথা ঘামায় না। এক সমাজ-সংস্কারক ছাড়া। সাহিত্যিক সমাজ-সংস্কারক নন—শিল্পীমাত্র। এবং

শিল্পীকে ছবি আঁকতে গিয়ে আলোর সঙ্গে ছায়াপাতও করতে হয়। কিন্তু এস্থলে ছায়ার কালো পোঁছ কি একটু বেশি গাঢ় করে লেপে দেওয়া হয়নি? কয়েক বৎসর আগে মিস মেয়ো আমাদের দেশ সম্বন্ধে যে বই প্রকাশ করেন, তার বিরুদ্ধে আমাদের এই নালিশ ছিল যে, কেবল হাসপাতাল ও নর্দমা ঘেঁটে তথ্য সংকলন করলে সব দেশেই ঐরকম দুর্গন্ধময় দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব দেখানো যেতে পারে। তাই এক-একবার মনে হয় যে এক তিনতলার মানুষপ্রমাণ উচ্চ ঝিলমিল ঘেরা শুদ্ধান্তঃপুরের নিচে থেকে ধরে বাকি বাড়িটা অমন নরককুণ্ড বলে না দেখালে কি যথাযথ ছবি আঁকা যেত না? অবশ্য "সুকুমারমতি বালক-বালিকা" (যাদের আগে বলত) তাদের হাতে এ বই পড়বার কথা নয়। কিন্তু যে চলচ্চিত্র "for adults only" বলে সরবে ঘোষিত হয়, সেইগুলি দেখবার জন্যই কি উক্ত শ্রেণীর মন বেশি ছোঁক্-ছোঁক্ করে না? মাইকেলের মতে যথা গুণহীন সন্তানের প্রতিই জননীর স্নেহ হয় সর্মাধক? প্রায় শতাবধি বৎসর আগে শুনেছি বঙ্কিমচন্দ্রের বই নাকি বালিশের তলায় রেখে রাত্রে লুকিয়ে পড়তে হয় চতুর্দশ বর্ষীয় বালকেরও। কিন্তু এখন তো পঞ্চদশীদের হাতে ভারতচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের বই প্রকাশ্যভাবে ঘুরলেও মা-বাবা কোন আপত্তি করেন না দেখতে পাই। আজকাল আবার একটা মতবাদ হয়েছে শুনতে পাই যে সংসারের ভালমন্দ সব কথা ছেলেমেয়েদের অল্প বয়সেই জানিয়ে দেওয়া ভাল; যাতে পরে নিজেরাই বুঝেসুঝে নীর থেকে ক্ষীর গ্রহণ করতে পারে। একজন ষোড়শী ত আমাকে স্পষ্টই বললে যে—"সব জানা ভাল, না করলেই হল।" তথাস্তু! আমার সৌভাগ্যবশতঃ যখন ছেলেপিলে মানুষ করতে হয়নি, তখন "ভাবতে পারিনে পরের ভাবনা গুলো।" আবার যখন শুনি তখন হাসি পায় যে Victorian Age-এ মেয়েদের পায়ের উল্লেখ পর্যন্ত করা এত অশালীন ছিল যে, একজন ইংরেজ রমণীর, সেদিন কোথায় পড়েছিলুম ভুলে যাচ্ছি, কোন আগ্নেয়গিরির গহ্বরে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার উপক্রম হওয়ায় এক পুরুষ সঙ্গী পা ধরে টেনে তাকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়েছিল বলে তার এত লজ্জা ও ধিক্কার বোধ হয়েছিল যে বলবার নয়। ভাবটা বোধহয় "এর চেয়ে মৃত্যু ভাল।" কাশী যাই কি মক্কা যাই, এই দোটানার পাল্লা থেকে বোধ হয় সামাজিক জীব কোনদিনই রেহাই পাবে না।

যাক গে, মরুক তো এসব অপ্রিয় কথা। এখন প্রাণ খুলে প্রশংসা করবার মুক্ত শ্রীক্ষেত্রে পেঁছতে পারলেই বাঁচি। আঃ—কি আরাম!

প্রথমেই চোখে পড়ে বইখানির পশ্চাদ্‌পট কি বৃহৎ, কি বিশাল, কত লোকের মিছিল নিয়ে তার নাড়াচাড়া, আনাগোনা। অথচ এমন নিপুণভাবে সাজানো যে, কেউ কারো ঘাড়ে পড়ছে না, যেন নানা রঙের পশমে বোনা একখানি সুন্দর কাশ্মীরী শাল, যার প্রতি সূতো সমগ্রের নক্সাটি ফুটিয়ে তুলছে। আমি অনেক সময়ে বলি যে, কলকাতা শহর একাই সমস্ত ভারতবর্ষের একটি সংক্ষিপ্তসার, তার সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়ের নমুনাই দেখতে পাওয়া যায়। তেমনি এই বইখানিও যেন সেকালের কলকাতার একটি বিশেষ সময়ের বৃহদায়তন ছবি—যখন পুরাকালের সনাতন হিন্দু সমাজের উপর য়ুরোপীয় সাহিত্য সমাজ ও ভাবধারার প্রভাবের ঝাপটা এসে পড়ে, রাজনীতি, সমাজ-

নীতি, ধর্মনীতি সব কিছুকেই বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত করে তুলতে আরম্ভ করেছে।

দেশ, কাল ও পাত্র--এই তিন নিয়েই তো ইতিহাস এবং ভূগোল। এখানে সমস্ত কলকাতাটাই দেশ। তার গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে বাড়বাড়ন্ত অবস্থা পর্যন্ত এমন ধারাবাহিক ইতিহাস ভিতরে দেওয়া আছে যে ছাত্ররা পড়ে পরীক্ষা পর্যন্ত দিতে পারে। সেই কিপ্‌লিং-এর কবিতাটুকুর পুনর্দর্শন পেয়ে কি সুন্দর লাগে। যেন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে পথ চলতে-চলতে হঠাৎ দেখা হওয়া। Chance directed, Chance-erected। কিপ্‌লিং খুব বড় কবি না হতে পারেন, কিন্তু শব্দচয়ন যুৎসই হয়েছে। তার 'If' কবিতাটি কি একালের কেউ পড়েছে? আমার বড় ভগ্নীপতি শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় আমাকে কতকাল আগে পড়তে দিয়েছিলেন, কিন্তু এখনো মস্তিষ্কের ও বাক্সের কোণ খুঁজলে তার দু'চার ছত্র হাতড়ে পাওয়া যেতে পারে। অতি প্রতিভাবান কবির পক্ষে নিজেদের প্রায় সমকক্ষ একজনের কবিতা ঝুমঝুমি বাজাতে মন্দ লাগে না, ভাল থিয়েটারের মানসিক দ্বন্দ্বের পর সার্কাসের শারীরিক কসরৎ দেখে যেমন মুখ বদলায়।

কলকাতার ইঁটপাটকেল রেখাচিত্রের পরে আসে শহরবাসীর রক্তেমাংসে গড়া তৎকালীন সমাজের ছবি। কেউ কেউ বলেন, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বই থেকে অনেক অংশ নকল করা হয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যখন এই এক জন্মের মধ্যে ত্রিকালজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয়, তখন সেকালের লোকের বই পড়ে ছাড়া সেকাল সম্বন্ধে ধারণা আর কি উপায়ে করা যেতে পারে বলো? বরং লেখককে বাহাদুরি দিতে হয় যে অতগুলি বই পড়ে, তার সারমর্ম আত্মসাৎ করে এত বিভিন্ন সমাজ, সমাজিক আন্দোলন ও বিচিত্র ঘটনা এবং ব্যক্তি-পরম্পরার একটা পরিচ্ছন্ন চলচ্চিত্র পাঠকের সামনে তুলেধরতে পেরেছেন। যার মধ্যে থেকে পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগ্নী নিবেদিতা, অনুশীলন সমিতি ও গুপ্তহত্যা এবং সন্ত্রাসবাদ কোনটাই বাদ পড়েনি। কত বড় মাথা, কত দরদী হৃদয়, কত তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং কত সিদ্ধ হস্তের সমাবেশে এই মণিকাঞ্চন যোগ হতে পারে, তাই ভাবি। দেশটা তাহলে কলকাতা, কালটা ধরো অনুমান ১৮৫০—১৯২০। তারপরে পাত্র। সেইটেই আসল। কারণ যতই বল—সবার উপরে মানুষ সত্য। এই বিস্তীর্ণ পশ্চাদ্‌পটের উপর নায়কের জীবনের আলেখ্য আঁকা। নায়কের এবং তার অন্তরঙ্গ গুটিকয়েক মানুষের।

জড় জগতের চেয়ে এই জীব জগতের ছবি আঁকতেই লেখকের বেশি কৃতিত্ব দেখতে পাই। যদি শুধু কল্পনাচক্ষেই তাদের দেখে থাকেন, তবে এমন বাস্তবের রূপ তাদের দিলেন কি করে যাতে পাঠকেরও মনে হয় যেন তারা চোখে দেখছেন, কানে শুনছেন, মনে জানছেন? যদি ঐ বনমালী সরকার লেনের বড় বাড়িতে বাস না করে থাকেন, তবে তাঁর প্রতিনিধি ভূতনাথ কেমন করে তার প্রত্যেক অলিগলি মায় সিঁড়ির তলায় কবরের খবর পর্যন্ত জানে? প্রতি দিনে-রাতে একই জিনিস এবং একই সময় প্রত্যেক চাকর মনিবকে একই কর্মে (বা দুষ্কর্মে!) রত দেখে? যদি দাসু মেথর বলে কেউ না-ই থাকবে, তবে সব কাজে তার ছেলেরা এসে দাঁড়াবে কেন, এবং দূর থেকে বাঁশি বাজাবে কেন? যদি ছোট বউয়ের ঘরে সে না গিয়ে থাকে—সে বংশের বধূরা এমন সুন্দর

এবং সুরক্ষিতা— তবে কেমন করে সে আলমারীর প্রত্যেক পুতুলের এবং খাট-বিছানার এমন খুঁটিয়ে বর্ণনা দিতে পারে ; কেমন করে সে জানে ছোট বউয়ের আলতা-ঘেরা পায়ের আঙুলগুলি টোপাকুলের মত টুসটুসে। যা দেখে আর এক কবি বলেছেন—

"কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা।।"

আর কত বলব? কর্তাবাবুদের নামেরই বা কি বাহার—বৈদূর্যমণি, হিরণ্যমণি, কৌস্তুভমণি। যেন নামের মধ্যে থেকেই আভিজাত্যের হীরকদ্যুতি ঠিকরে পড়ছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বাইরে চিকণ-চাকণ, ভিতরে খ্যাড়। এক-এক সময় মনে হয় Salvation Army থেকে লেখকের স্বর্ণপদক পাওয়া উচিত—অমিত মদ্যপানের ভয়াবহ পরিণাম চিত্রণের সাফল্যের জন্য।

মণিদের ঠাকুরদাদার নাম ছিল নাকি 'ভূমিপতি' কিন্তু বাবার নাম সূর্যমণি ঠিক আছে। আর এই বংশের ধারা শেষ হয়েছে চূড়ামণিতে,—যিনি কালো চাপকান পরে রোজ আদালতে যান, আর ফেরার পথে বউবাজারের ট্রামে বসে বড়বাড়ি দেখতে-দেখতে সেকালের কথা মনে-মনে আলোচনা করেন। সেই স্বর্ণ মন্দিরের চূড়া ধূলায় ধূলিসাৎ হয়েছে। হায়-হায়! কোথায় সেই মেজকাকীর পুতুলের বিয়েতে ফ্রান্স থেকে গয়না আসা, কোথায় ছোটবাবুর দুধের মত সাদা জুড়ি ঘোড়া ব্রিজ সিংয়ের "হুঁশিয়ার হো" হাঁকের সঙ্গে টগবগ করতে-করতে ফটকের বাইরে সন্ধ্যায়বেরিয়ে যাওয়া আর ভোরে বাড়ি ফেরা, কোথায় হাটখোলার ছেনি দত্তের সঙ্গে মেজবাবুর পায়রা ওড়ানোর খেলা ; আর কোথায় নিচের বৈঠকখানা ঘরে নিজের গানের মেলা—"চামেলী ফুলি চম্পার" সঙ্গে ভূতনাথের তবলার ঠেকা এবং মাঝে-মাঝে পরদার আড়ালে গিয়ে মুখ পুঁছে ফিরে আসা। ঐ করেই ত সব গেল—জুড়িগাড়ি, বড় বাড়ি, বউদের গয়নাগাটি, সুখচরের জমিদারী, চাকরবাকর সব। নিজের বিয়েতেই শেষ জাঁকজমক। তারপর থেকেই তো শ্বশুরের আধিপত্য, বাড়ি বন্ধক রেখে কয়লার খনি কেনা ও ফেল মারা, স্বর্গ হতে রসাতলে দারুণ পতন। কেবল রইল বংশী, আর তার বোন চিন্তা। আগে বলেছি তিনতলার নিচ থেকে ফল্গুনদীর মত পাপের স্রোত বয়ে চলেছে। কিন্তু তার মধ্যে বংশীর প্রভুভক্তি পাঁকে পদ্মের মত ফুটে রয়েছে। একবার ছোটবাবু অত শীঘ্র ফিরবেন না জেনে সে ঠিক সময়ে তাঁকে নামাবার জন্য গাড়ির কাছে যেতে পারেনি বলে তিনি কোচম্যানের কাছ থেকে শংকর মাছের চাবুক চেয়ে নিয়ে তাকে শপাশপ মেরে ক্ষতবিক্ষত করে তুললেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে কেমন সহজে মেনে নিলে যে তার দোষের উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে এবং তারপর থেকে ছোটবাবু সেই যে শয্যা নিলেন, সকল সময় কি সরলভাবে তাঁর কুশল প্রশ্ন এবং আন্তরিকভাবে তাঁর সেবাযত্ন করেছে, যতদিন না হিমকলেবর ছুঁয়ে বুঝতে পারলে যে তিনি সকল সেবার অতীত হয়ে গেছেন। আর একটিমাত্র বোন চিন্তার জন্য কত ভাবনা. তার ম্যালেরিয়া জ্বর সারাবার জন্য কত চিকিৎসা-পথ্য। অবশ্য খরচটা সব ছোট বউমার কিন্তু যত্নটা তো তার। চিন্তার নামে ভূতনাথের কাছে নালিশও কি স্নেহের সঙ্গে করত! না, বংশীটা

এ অমানুষের দলের মধ্যে একটা মানুষের মত মানুষ, তা স্বীকার করতেই হবে। আর ছোট বউমা? একদিকে যেমন বংশীর ঐ প্রভুর প্রতি প্রভুভক্তি, অপরদিকে তেমনি তার ঐ পতির প্রতি পতিভক্তি। তিনি আদ্ধেক কেঁদে প্রথম আলাপেই ভূতনাথকে বলেছিলেন—এ এক অবাক বাড়ি ভাই—অবাক বাড়ি। আমারও তেমনি বলতে ইচ্ছে করে—এ এক অবাক দেশ ভাই—আজব দেশ। স্বামী যেমনই হোক না কেন, তাকে সেবা করাই স্ত্রীলোকের পরমধর্ম, জন্ম-জন্ম যেন ঐ স্বামীই পায় বলে কি কষ্টই না সে করতে প্রস্তুত। স্বামীর পাদোদক এনে না দিলে ছোট বউমার উপোস ভাঙা হবে না, তা সে সারাদিন দাঁতে দাঁড় দিয়ে পড়েই থাকুক, আর স্বামী যে অবস্থায় যেখানেই পড়ে থাকুক, বা লাথি মেরে জলের বাটিই উল্টে ফেলুক। যে গুণী বংশী তাই সে অবস্থায়ও পাদোদক পাওয়া যায়। শুধু ছোট বউমাই বা কেন—ভারতবর্ষের ইতিহাসের গঙ্গোত্রী থেকে যে প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী-কুলের মিছিল চোখের সামনে দিয়ে নেমে চলে আসছেন—সেই গান্ধারী, দ্রৌপদী, সাবিত্রী, সীতা, সতী, পার্বতী, বেহুলা থেকে আরম্ভ করে লক্ষহীরা পর্যন্ত—কে না স্বামীর জন্য অসাধ্য সাধন করেছেন, এবং কার স্বামী না তাঁকে অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন? বেহুলা যখন ছ'মাস ধরে ভেলায় ভাসতে-ভাসতে লখিন্দরের কখানা হাড় নিয়ে বলতে গেলে ভেল্কি খেলালে তখন লখিন্দর বেঁচে উঠে প্রথম কথা তাকে বলে যে ছ'মাস ভেসে-ভেসে বেড়াচ্ছ, আমি কি করে তোমাকে ঘরে নেব।—কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। সাধে কি বলি যে অবাক দেশ! আশেপাশে অনেক সময় ছেলেপিলের বাড়িতে যে শুনি "এক চড় মারব", ইচ্ছে করে সেই কথাটা কাজে প্রয়োগ করতে। আরে বাপু, তোর হাঁটুর হাড়টা বেয়াল মাছের পেটের ভিতর থেকে বের না করলে তুই থাকতিস কোথায়?—আর রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনার্থে গর্ভবতী সীতাকে বনবাসে পাঠালেন। শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত এমন দগ্ধালেন যে সে শেষে "হে ধরণী দ্বিধা হও" বলে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে আদর্শ স্বামীর হাত থেকে রক্ষা পেলে।

জানি না একালের ছেলেরা দাক্ষিণাত্যের প্রখ্যাত শিল্পী রাজা রবি বর্মার আঁকা ছবি দেখেছে কিনা। আমাদের ছেলেবেলায় বোম্বাই অঞ্চলে তাঁর খুব নাম ও চল ছিল। অনেকগুলি পৌরাণিক ছবির মধ্যে একটা ছিল সীতার পাতাল প্রবেশ। সিংহাসন করে ধরণী জননী যখন সীতাকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন গহ্বরের ধারে বসে রামচন্দ্রের হতভম্ব মুখের ভাব শিল্পী মন্দ ফুটিয়ে তোলেননি। স্ত্রীলোকেরও যে সহ্যশক্তির একটা সীমা আছে সেটা বোধ হয় তাঁর এই প্রথম হৃদয়ঙ্গম হল। কুছ পরোয়া নেই, সোনার সীতা আছে! আমি রবি বর্মার মূল ছবির অনেকগুলি ফোটো এনে কলাভবনে দান করেছিলুম; এখনও বোধ হয় সেখানেই রক্ষিত রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ছোট বউ তো নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ—লজ্জা-সরম সম্ভ্রম—সব স্বামীর জন্য বিসর্জন দিলে, তার বদলে কি পেলে তা সে-ই জানে। সবশেষে লাভ হল রাস্তার মাঝখানে গুণ্ডাদের হাতে অপমানিত হয়ে অপঘাতে মৃত্যু। জানি না তখন তার মান-অপমান জ্ঞান কিছু অবশিষ্ট ছিল

কিনা। আর কে তাঁর বিচারক হয়ে ঐ গুণ্ডা লেলিয়ে দিলেন?—না তাঁর মেজ ভাসুর। যিনি বরানগরের বাগানে লীলা খেলাচ্ছলে গোপিনীদের বস্ত্রহরণ অভিনয় করেন। কিন্তু বাবুরা যা খুসি করুন, বিবিদের ঠিক থাকা চাই। এই হচ্ছে আবহমান কাল বাঙলাদেশের সামাজিক আদব কায়দা-কানুন। তাই তো একালের ইংরেজী শিক্ষিত ভারত ললনা অগত্যা নিখিল ভারত নারী সম্মেলনে সমবেত হয়ে পুরুষদের সঙ্গে সাম্য স্বাধীনতা দাবী করছে। মুসলমান নারীকুলও শারিয়াতের বিধিলিপি সত্ত্বেও অন্তপুরে চৌঘুড়ি হাঁকানো পছন্দ করছেন না। ইংরাজী শিক্ষাই হয়েছে কাল। যবনিকা পতনের পূর্ব দৃশ্যে কবরের ভিতর এক অপরিচিত কঙ্কাল, তার গায়ে গোটের একটু সোনাদানা চিকচিক করছে।

আবার ঘুরে ফিরে শেষে না বলে থাকতে পারছিনে যে, লেখকের বাহাদুরি আছে। কত তান বিস্তার করে দুন চৌদুন করে আবার ঠিক সময়ে 'সমে' এনে ফেলেছেন। কিংবা বিলাতী অর্কেস্ট্রার উপমা দিতে গেলে বলা যায় যে কতরকম যন্ত্র কতরকম বিভিন্ন সুরতালে বেজে যাচ্ছে অথচ, তাঁর বেটনের ইঙ্গিতে এক অখণ্ড সঙ্গীতে পরিণত হয়ে শ্রোতার কানে অমৃত বর্ষণ করছে। বহু পরে যে ঘটনা ঘটবে, তার জন্য কেমন আগে থাকতে মনকে প্রস্তুত করতে হয়। যেমন পরে যে গুণ্ডার হাতে মার খাবে, সে রকম চোরাই লোককে ভূতনাথ কতদিন থেকে দেখতে পেয়েছে, অলিগলিতে গোপনে তাকে অনুসরণ করতে। আর যেদিন জানবাজারে খুনোখুনি হবার দরুন ছোটবাবু অসময়ে দৈবাৎ বাড়ি ফিরলেন, সেদিন কি সামান্য সূত্রে ছোট বউ আর ভূতনাথও বিস্মৃত পানসুপুরির তল্লাস করতে ঠিক সেই সময়ে বরানগর যাবার পথ থেকে ফিরে এলেন। সামান্য হলেও কি সুন্দর, কি স্বাভাবিক, সর্বোপরি কি সত্য। একজন পাঠক আমাকে বলেছিলেন যে, অতবড় লেখকের পক্ষে জবার সঙ্গে ভূতনাথের কলকাতায় মিলন সংঘটন করাটা লিপিকুশলতার দিক থেকে ভাল হয়নি—যেন জোর করে টেনে-বুনে গল্পের খেই মেলানো। কিন্তু পূর্বেই বলেছি কলকাতাটা যেন এক পৃথিবী বিশেষ, তার মধ্যে যে কোন দুজন লোকের পরস্পরের সঙ্গে ঘটনাচক্রে দেখা হওয়া এমন কিছু বিচিত্র নয়। আর তার জন্য যে পূর্ব কাহিনীটুকু উদ্ধার করেছেন, সেটি কি মিষ্টি, কি অপ্রত্যাশিত, কি সম্পূর্ণ অভিনব। তার জন্যই সাতখুন মাপ হওয়া উচিত। ভেবে দেখো একটি নবীন সুকোমল কাঁচা-কচি দু মাসের খুকি হাত-পা ছুঁড়ছে পিঁড়েয় শুয়ে, আর আত্মীয়স্বজন পুরোহিত চারিদিকে ঘিরে বসে গম্ভীরভাবে একটি অপেক্ষাকৃত বড় মাতব্বর খোকার সঙ্গে মন্ত্র পড়ে তার বিয়ে দিচ্ছেন—যে শুভ বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রমতে জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী ধ্রুবতারার মত স্থায়ী এবং অবিনশ্বর। যদিও ভূতনাথ একটিমাত্র মিথ্যা কথার ফুৎকারে সে পুণ্য অনুষ্ঠানকে উড়িয়ে দিয়েছিল। তার পরজন্মে যাই হোক, ইহজন্মেই নিশ্চয় এই পাপের জন্য তাকে পুন্নাম নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। সাধে কি বলি আজব দেশ! এরকম ঘটনা একমাত্র এ দেশেই সম্ভব। যাকে ওস্তাদি ভাষায় বলে—তুমহারি কাম।

এরপর আর কি বলার আছে? এই "আমার কথাটি ফুরাল" ছাড়া? কেউ-কেউ বলে ভূতনাথ নাকি এখনো বেঁচে আছে। কিন্তু থাকলেও তাকে বইয়ের পাতা থেকে

টেনে বের করে এই বুড়ো বয়সে ভূত দেখে পিলে চমকাতে চাইনে। থাকুক সে "সাহেব বিবি গোলাম" লেখকের উর্বর মাথায় আর তাঁর অগণ্য পাঠকের মনের খাতায়, অন্যান্য অসংখ্য অমন নায়ক-নায়িকার চরিত্র চিত্রাবলীর সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে। শুনতে পাই "সাহেব বিবি গোলামের" ফিল্মও নাকি ভাল হয়েছে! কপালে থাকে তো কোন দিন দেখব, আশা করি ঠকব না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমার মনে হয় এই বইয়ের জন্য লেখকের নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত, কিংবা তার অনুরূপ স্বদেশী কিছু।

শান্তিনিকেতন

১লা জুলাই, ১৯৫৬ **ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী**

কড়ি দিয়ে কিনলাম

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্য বিংশ শতকের বিচিত্র-জটিল পরিস্থিতি ও অন্তর্বিরোধদীর্ণ মর্মবস্তু বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যকে নানা সূক্ষ্ম ও স্থূলভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। জীবনবোধের বিপর্যয়, আদর্শের কেন্দ্রচ্যুতি, নানা বিরোধী উপাদানের অসংহত সংঘাত আচরণের উৎকেন্দ্রিতা—এই সমস্তই বিভিন্ন উপন্যাসে প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু এই বিশ্বব্যাপী নৈরাজ্যবাদ, সমগ্র পৃথিবীর মোহাচ্ছন্ন নিম্নাভিমুখিতার তীব্র আকর্ষণ-শক্তি কোনও একখানি উপন্যাসে এ পর্যন্ত কেন্দ্রীভূত হয় নাই। বিমল মিত্রের সুবৃহৎ উপন্যাস 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' এই সাধারণ প্রবণতার একটি অসাধারণ ব্যতিক্রম। জীবনের প্রত্যেক স্তরের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে যে ভাঙ্গন ধীরে ধীরে ক্রিয়াশীল, বিমল মিত্রের মহাকাব্যধর্মী উপন্যাসে তাহার বিরাট, অসংখ্য-জীবন-প্রসারিত কেন্দ্রপ্রেরণা প্রলয়ংকর মহিমায়, মনুষ্যত্বের মূলোচ্ছেদী বিদারণতীব্রতায় উদ্ঘাটিত। উহার বিপুল, বিচিত্রসংঘাতময় কণ্ঠে টাকার সর্বশক্তিমত্তা, অমোঘ প্রভাব, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'যেতে নাহি দিব' এই সর্বব্যাপ্ত মূল সুরের ন্যায়, 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর পুনঃপুনঃ উদ্গীত ধুয়া ধ্বনিত হইয়াছে। বাঁশীর সর্বরন্ধ্ররণিত সুরের ন্যায় উপন্যাসের প্রত্যেকটি ঘটনা হইতে এই লৌহকঠোর, বেসুরো ঝন্ঝনা আমাদের ভাবতন্ত্রীতে নিদারুণ আঘাত হানিয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় এই উপন্যাসের ঘটনাবস্তুর বিন্যাস। ইহার কিছু পূর্ব হইতেই সমাজনীতিতে যে ফাটল ধরিয়াছিল, অঘোরদাদুর নীতিসংযমহীন ভোগবাদ ও অর্থগৃধ্নুতায় তাহারই প্রকাশ। অঘোরদাদু যুদ্ধপূর্ব জগতে ও প্রাচীন আদর্শের কপট আবরণে অন্তরক্ষত গোপনপ্রয়াসী সমাজে একটি প্রতীকী চরিত্র। তাঁহার আত্মকেন্দ্রিকতা, অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস তাঁহার রূঢ় নিঃস্নেহ আচরণে ও সদাউচ্চারিত মুখপোড়া গালিতে সমগ্র বাতাবরণকে বিষাক্ত করিয়াছে। ইহারই

অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ছিটেফোঁটার খদ্দরাবৃত চোরাকারবারী ও মুনাফাবাজিতে ও লক্কা-লোটনের মত পণ্যনারীর ছদ্মগৃহিণীত্বগৌরবে।

প্রাক্-যুদ্ধ যুগে কিন্তু নীতির বন্ধন একেবারে শিথিল হয় নাই। দীপুর মা ও কিরণের মা অসহনীয় দারিদ্র্য দুঃখের মধ্যেও গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। কিরণের মার দুঃখবরণে কেবল নিষ্ক্রিয় সহিষ্ণুতা ছিল। কিন্তু দীপুর মা বৃহৎ সংসারের দায়িত্বপালন, তেজস্বিতা ও স্পষ্টবাদিতা, ছেলেকে মানুষ করার উপযোগী চরিত্রদৃঢ়তা ও বিন্তীর মত অসহায় মেয়েকে সমস্ত সংসারের তাপ ও অপমান হইতে স্নেহপক্ষপুটে আচ্ছাদনের আত্মপ্রত্যয় প্রভৃতি ব্যক্তিত্বসূচক গুণের অধিকারিণী ছিল। ইহারা ধর্মনীতিকেন্দ্রিক অতীত জীবনাদর্শের শেষ প্রতিনিধি। দীপুর মা উঞ্ছবৃত্তির মধ্যে যেরূপ প্রখর বুদ্ধি ও চরিত্রগৌরবের পরিচয় দিয়াছে, অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার মধ্যে তাদৃশ চারিত্র্যশক্তি দেখাতেই পারে নাই, চাকুরে ছেলের সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রীরূপে তাহার তীক্ষ্ণাগ্র ব্যক্তিত্ব যেন অনেকটা কুণ্ঠিত হইয়াছে। দীপুর চাল-চলনের নিয়ন্ত্রণব্যাপারে ও ক্ষীরোদার ভবিষ্যৎ বিষয়ে সে যেন অনেকটা বিহ্বলতা ও অস্থিরমতিত্ব দেখাইয়াছে। বরং কিরণের মা দীপুর সংসারে আশ্রয় লইবার পর ক্ষীরোদার সহিত দীপুর অনিশ্চত, অস্বীকৃত সম্পর্কের অবসান ঘটাইতে তীক্ষ্ণতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সন্তোষ কাকার চরিত্রটি পল্লী-সমাজের কৌতুককর অসঙ্গতি ও বিনা সম্পর্কে অধিকারপ্রতিষ্ঠার আত্মসম্মানজ্ঞান-হীনতার দিক্‌টা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে।

এই সমস্ত চরিত্রের মধ্য দিয়া সাবেকী জীবনযাত্রার ভাল মন্দ ও দুই দিকই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে ইহার মন্দের মধ্যেও এক প্রকার হাস্যকর সরলতা আছে; উহা আমাদের উগ্র প্রতিবাদ বা দারুণ জুগুপ্সার উদ্রেক করে না।

কলিকাতা অভিজাত-সমাজের স্বার্থান্ধতা ও বড়মানুষির সীমাহীন ঔদ্ধত্য রূপ পাইয়াছে শ্রীমতী নয়নরঞ্জিনী দাসীর মধ্যে। এইরূপ একটা বিকৃত চরিত্রপরিণতি কলিকাতায় বনিয়াদি বংশের মধ্যে কোথাও কোথাও কোন অজ্ঞাত কারণে, হয়ত বংশাভিমানের বিষক্রিয়ার জন্য আত্মপ্রকাশ করে। এই সমাজে মানুষের চারিদিকে একটা দুর্ভেদ্য আত্মগরিমার দুর্গ গড়িয়া উঠিয়া তাহাকে জড় পাষাণে পরিণত করে। নয়নরঞ্জিনীর ভয়াবহ অস্বাভাবিকতা, তাহার ছেলে-বৌ-এর সম্বন্ধেও একান্ত নির্বি-কাররত্বে, তাহার মায়া-মমতার নাড়ীগুলির সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ত্বে। তাহার যে বিকৃতি তাহা যুগনিরপেক্ষ যুদ্ধোত্তরকালের নীতিবিপর্যয়ের সহিত নিঃসম্পর্ক। অঘোরদাদুর মানববিদ্বেষ হয়ত তাঁহার কঠোর জীবনাভিজ্ঞতার অনিবার্য ফল, তিনি সংসারের নিকট যে অবজ্ঞা ও অনাদর পাইয়াছিলেন, তাহাই বহুগুণিত করিয়া সংসারকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু নয়নরঞ্জিনী ঐশ্বর্যের অপরিমিত প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করিয়াও এই আত্মসর্বস্ব নির্মমতা অর্জন করিয়াছে। জীবনের দুই প্রান্তে অবস্থিত এই দুইটি চরিত্র অতীত ও আধুনিক যুগের জীবনযাত্রাবিধির মধ্যে কতকটা ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছে। তবে উহাদের মধ্যে নয়নরঞ্জিনীকেই অসাধারণ ও খানিকটা অবিশ্বাস্য ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হয়। তাহার চরিত্রাঙ্কনে লেখকের কিছুটা সচেতন অতিরঞ্জন-

প্রবণতা ও হয়ত কিছুটা ব্যঙ্গাভিপ্রায় লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

কিন্তু যুদ্ধকালীন যে মূল্যবিভ্রান্তি ঘটিয়াছে তাহা একদিকে যেমন আকস্মিক ও অভাবনীয় অন্যদিকে তেমনি সার্বভৌম। প্রাচীন নীতিশাসিত সমাজে মোটামুটি একটা আদর্শপ্রভাব কম-বেশী পরিমাণে কার্যকরী ছিল। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে যে অর্থনৈতিক সংকট উৎকটরূপে দেখা দিল তাহা যুদ্ধসংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই একটা উন্মত্ত তাণ্ডবের ঘূর্ণিবায়ুরূপে চিরপোষিত নীতিসংস্কার ও ঔচিত্যবোধকে লণ্ডভণ্ড করিয়া ছাড়িল। এই উদ্‌ভ্রান্তি সর্বাপেক্ষা উদ্ধত, বেপরোয়া প্রকাশ পাইয়াছে লক্ষ্মীর আচরণে। স্বাভাবিক অবস্থায় তাহার চরিত্রের যে তেজস্বী আত্মনির্ভরশীলতা তাহাকে সমস্ত সামাজিক মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বেচ্ছাবৃত প্রণয়ীর সঙ্গে শান্ত গৃহনীড়রচনায় উদ্বুদ্ধ করিত, যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তাহাই একটা ভদ্রতার মুখোশপরা, সমাজের ধনী ও প্রভাবশালী একদল মানুষের সহযোগিতাপুষ্ট স্বৈরিণীবৃত্তির বীভৎস রূপ লইয়াছে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'-এ অভয়া-রোহিণীর সংযমপূত, একনিষ্ঠ মিলন যুগধর্মে এক কদর্য ব্যসন ও ব্যভিচারবিলাসের বিবৃত হইয়াছে। ইহার মূলগত কারণ ধর্মসংস্কার বিলোপ ও দুর্নিবার ঐশ্বর্যমোহ। অভয়ার চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল একটি দরিদ্র সংসার প্রতিষ্ঠা, লক্ষ্মীর লক্ষ্য সামাজিক সম্ভ্রম ও অপরিমিত ধন-সম্পদলালসা। অথচ মনের গভীরতম স্তরে লক্ষ্মীও স্বামী-পুত্র লইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেই চাহিয়াছিল। কিন্তু এই ন্যূনতম সাধটুকু মিটাইতেই যে বিপুল বস্তুসঞ্চয় ও ভোগোপকরণ নূতন যুগের মানদণ্ডে অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল তাহাই আহরণের জন্য তাহাকে আত্মাবমাননার অধমতম গহ্বরে অবতরণ করিতে হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত অবদমিত ধর্মবোধ তাহার উপর প্রচণ্ডতম প্রতিশোধ লইয়াছে, অবহেলিত নীতিবিধানে অমোঘ বজ্রপাতের ন্যায় তাহার মস্তকে অগ্নিবর্ষণ করিয়াছে। লক্ষ্মীচরিত্রের মধ্যে কোথাও অন্তর্দ্বন্দ্ব নাই, তবে তাহার সমস্ত স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের মধ্যে একটি অকুণ্ঠিত সরলতা আছে। মাঝে মধ্যে দীপুর কাছে, স্বামীসেবায় ও পুত্র-স্নেহে তাহার স্বরূপ-পরিচয়টি নিষ্কলুষ সত্যস্বীকৃতিতে, নিরুপায় অসহায়তায় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তাহার চরিত্রটি এত সজীব, বক্রপঙ্কিল পথে তাহার পদক্ষেপ এতই সহজছন্দময়, তাহার পাপাচরণের ভোগাসক্তির মধ্যেও এমন একটি স্বভাবসুষমার পরিচয় মিলে যে সে কখনই আমাদের সহানুভূতি হারায় নাই। আমরা নীতিবাগীশের অগ্নিবৃষ্টি দৃষ্টি দিয়া তাহার বিচার করি না, সে নাটক-উপন্যাসের প্রথাচিত্রিত পিশাচী-শয়তানী রূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় না।

উপন্যাসের নায়িকা সতী আরও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সহিত, আরও উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার ও লক্ষ্মীর মধ্যে চরিত্রের মূল কাঠামো সম্বন্ধে একটি পরিবারগত মিল আছে; আবার আদর্শ ও জীবনসমস্যার প্রকৃতিবিষয়ে গুরুতর প্রভেদও লক্ষণীয়। সতী গোড়া হইতেই লক্ষ্মীর পিতার অবাধ্যতার ও স্বাধীন প্রণয়চর্চার বিরোধী ছিল; পিতৃ-নির্বাচিত বরের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সুখী শান্ত পারিবারিক জীবনযাপনই তাহার একান্ত কাম্য ছিল। দীপুর প্রতি

একটি অস্বীকৃত অনুরাগের বীজ হয়ত তাহার অবচেতন মনে সুপ্ত ছিল, কিন্তু অনুকূল পরিবেশে এ বীজ কোনদিনই অংকুরিত হইত না। কিন্তু ভাগ্যের চক্রান্তে তাহার এই একান্ত-বাস্তব কিশোরী-কামনা মুকুলিত হইতে পারিল না। তাহার অদৃষ্ট-দেবতা এমন একটি পরিবারে তাহার স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন যেখানে তাহার আশ্রয়োৎসুক প্রকৃতি প্রতি মুহূর্তের রূঢ় আঘাতে, পুঞ্জীকৃত অমর্যাদা ও অবহেলার চাপে, স্নেহপ্রীতির অবলম্বনচ্যুত হইয়া সমাজবিধি সুরক্ষিত কক্ষপথ হইতে ছিটকাইয়া পড়িল। সতীর অবস্থা অনেকটা হার্ডির Tess-এর মত—সে প্রতিকূল দৈবের হাতে অসহায় ক্রীড়নক হইয়াছে। সনাতনবাবুকে লেখক দার্শনিক প্রজ্ঞা ও ঋষিসুলভ সমদর্শিতার আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাহার আচরণ কোথাও সঙ্গত ও স্বাভাবিক হয় নাই। সে একটি অশরীরী ভাব-মূর্তি মাত্র, রক্তমাংসের মানুষ হইয়া উঠে নাই। তাহার মুহুর্মুহুঃ উচ্চারিত উদার উক্তিসমূহ তাহার অন্তরসত্যের কোন্ উৎস হইতে উদ্ভূত তাহা মোটেই পরিষ্কার হয় না। সে যেন কর্মজগৎ হইতে নির্বাসিত একজন গ্রন্থকীটের পরনির্ভর অসহায়তা, কর্তব্যসংকটে স্থির-সংকল্প গ্রহণে অক্ষমতারই প্রতিমূর্তিরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। সুতরাং দীপংকরের প্রশস্তি সত্ত্বেও সতীর বিমুখতা ও অবজ্ঞাকেই আমরা তাহার ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া মনে করি।

কিন্তু মানসিক গঠন ও আদর্শে পার্থক্য থাকিলেও সতীকেও শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীর পথ অনুসরণ করিতে হইল। মা-মণির দুর্ব্যবহারে ও সনাতনবাবুর নির্লিপ্ততায় সে শ্বশুরবাড়িতে অতিষ্ঠ হইয়া হঠাৎ দীপুর আশ্রয় গ্রহণ করিল। দীপুর অতি সতর্ক শুচিতাবোধ ও উহার ও লক্ষ্মীর হিতৈষণা সতীকে আবার শ্বশুরালয়ে সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিল। কিন্তু এবারের নিদারুণ অপমান সতীকে একেবারে বে-পরোয়া করিয়া তুলিয়া তাহাকে প্রায় প্রকাশ্য রক্ষিতারূপে ঘোষালের আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য করিল। দীপুর প্রতি দারুণ অভিমান ও শ্বশুরবাড়ির উপর প্রচণ্ড প্রতিশোধস্পৃহা তাহাকে স্পর্ধিত প্রকাশ্যতার সহিত কলঙ্কিত জীবনযাপনের প্রেরণা দিল। ঘোষালের সহিত তাহার সম্পর্কের মধ্যে বিদ্রোহের উষ্মাই প্রধান উপাদান ছিল, কিন্তু মনে হয় যে এই আগ্নেয়গিরির পিছনে খানিকটা স্বেচ্ছাসম্মতি, এমন কি কিছুটা কৃতজ্ঞতাজাত অনুকূল মনোভাবেরও অভাব ছিল না। সে একবার নিজের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়াও ঘোষালকে বাঁচাইবার জন্য আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয়-বার একটা আকস্মিক মানসপ্রতিক্রিয়ার প্রভাবে ঘোষালের ঘুষ লওয়ার প্রমাণ দাখিল করিয়া তাহাকে ফাঁসাইয়াছে। সতীর আবেগপ্রবণ হঠকারী প্রকৃতি ও তাহার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ফলে তাহার মনের গভীরে প্রবাহিত বিপরীতস্রোতের ঘূর্ণিসংঘাত তাহার খামখেয়ালী আচরণকে খুবই স্বাভাবিক ও মনস্তত্ত্বসম্মত করিয়াছে। মজ্জমান ব্যক্তির তৃণকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিবার এই প্রয়াস তাহাকে একদিকে ঘোষালের আশ্রয়ের উপর নির্ভরশীল; অপরদিকে ঘোষালের স্থূল, ইতর-প্রকৃতি ও যৌনস্বেচ্ছাচারিতার প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা তাহাকে বিদ্রোহের বিস্ফোরণোন্মুখ করিয়াছে। এই ঘাত-প্রতিঘাতের সদা-সচলতায় তাহার আচরণে এইরূপ অতর্কিত

বৈষম্য ঘটিয়াছে। শেষদৃশ্যে ঘোষালই তাহার জীবন-রন্ধ্রে শনিরূপে প্রবেশ করিয়া তাহার উদ্‌ভ্রান্ত অপঘাত-মৃত্যুর কারণ হইয়াছে।

ঘোষালের গ্রেপ্তারের পর সতী অকস্মাৎ মূর্ছিত হইয়া হাসপাতালে নীত হইয়াছে ও সেখান হইতে দীপঙ্করের বার বার অনুরোধে লক্ষ্মীর গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর নিকটবর্তী বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছে। সেখানে নির্জন বাসের সময় দীপু ও তাহার মধ্যে নীরব, নিষ্ক্রিয় সাহচর্যের একটি অদৃশ্য আকর্ষণ, একটা নিরুত্তাপ, কিন্তু অমোঘ আত্মিক সম্পর্ক দৃঢ়তর হইয়াছে। ইতিমধ্যে সনাতনবাবু, এমন কি মা-মণি সতীকে শ্বশুরবাড়িতে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সে চেষ্টায় কিছুটা ভাবের আদান-প্রদান ঘটিলেও কোন স্থায়ী ফল হয় নাই। যে রাত্রিতে সতীর সমস্যাদুর্বহ জীবনের অবসান ঘটিয়াছে সেই সন্ধ্যায় স্বামীর সঙ্গে সতীর একটা স্থায়ী মিলনের ভূমিকা প্রস্তুত হইয়া এই মৃত্যুকে আরও করুণ করিয়াছে। স্বামীর সহিত বোঝা-পড়াতেও সতীর অব্যবস্থিতচিত্ততা, দৃঢ় সিদ্ধান্ত-গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র সত্তার উপর যে পর্বতপ্রমাণ সমস্যার বোঝা চাপিয়াছে, যে নিদারুণ কর্তব্যসঙ্কট তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে তাহার শ্বাসরোধী পেষণেই তাহার ইচ্ছাশক্তি কতকটা অসহায়ভাবে আন্দোলিত হইয়াছে। সতীর দোলকাবৃত্তি তাহার জন্য যে কণ্টকশয্যা বিছাইয়াছে তাহার দুঃসহ তীক্ষ্মতার জন্য। দীপঙ্কর সনাতনবাবু, মা-মণি, লক্ষ্মীর অস্বীকৃত, কিন্তু নীরবক্রিয়াশীল দৃষ্টান্ত, ঘোষাল ও প্যালেস-কোর্টের বিকৃত জীবনযাত্রা ও গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর নিয়তি-চিহ্নিত, অশুভ, নিগূঢ়চারী প্রভাব—সকলের সম্মিলিত শক্তি সতীর স্বভাব-পবিত্র, আনন্দ ও উৎসাহদীপ্ত, প্রাণোচ্ছল ব্যক্তিসত্তাকে এক অমোঘ ট্র্যাজেডির করুণ পরিণতির দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। তাহার তীক্ষ্ম উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব-দীপের নির্বাপণেই যুগের প্রলয়-ঝটিকার দুর্বার শক্তির যথার্থ পরিমাপ।

বিন্তী ও ক্ষীরোদা এই দুই কিশোরী হয়ত কোন যুগসংস্কৃতিপ্রভাবিত নয়, ব্যক্তিস্বভাবে বিশিষ্ট ও প্রথাসিদ্ধ প্রাচীন আদর্শের অনুসরণ প্রকাশ-কুণ্ঠ ও আত্ম-বিলোপপ্রবণ। কিন্তু তাহারা যে তাৎকালিক যুগপরিবেশে অত্যন্ত বিহ্বল ও সমাজধারাবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। এই নিঃসঙ্কোচ আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রসারণের যুগে তাহাদের চাপা, আপনার মধ্যে গুমরাইয়া-মরা প্রকৃতিই তাহাদের উপর যুগের পরোক্ষ প্রভাব। এমন কি উনবিংশ শতকের শেষপাদেও বাঁচিয়া থাকিলে বিন্তী যে দুঃসহ শূন্যতা-বোধপীড়িত হইয়া আত্মহত্যা করিত না তাহা অনুমান করা যায়। অঘোরদাদু তাহার চারিদিকে যে নিঃস্নেহ নিঃসঙ্গতার আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই দীপঙ্কর ও তাহার মাতার সহিত বিচ্ছেদকে তাহার পক্ষে এত মারাত্মক করিয়াছে। কড়ির ধাতব ঝঙ্কার তাহার কানে মৃত্যুর আহ্বানরূপে ধ্বনিত হইয়াছে। ক্ষীরোদা তাহার মন্দভাগ্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কেননা দীপঙ্করের আশ্রয় তাহার স্বেচ্ছাবৃত, তাহার আবাল্য জীবন-প্রতিবেশ নয়। আশাভঙ্গের গুরুতর আঘাত সে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু উহাতে উহার মূলভূত জীবন-সংস্কার একেবারে উচ্ছিন্ন হয় নাই। বিশেষতঃ সে আধুনিককালের যান্ত্রিক, নির্মম—প্রয়োজননিয়ন্ত্রিত,

সুকুমার বৃত্তির সহিত শিথিলসংলগ্ন জীবনপ্রত্যাশায় অভ্যস্ত হইয়াছে। কাজেই জীবনের মুষ্টি-ভিক্ষাতেই সে সন্তুষ্ট, উদার বদান্যতার আশা সে করে নাই।

এই উদ্‌ভ্রান্ত পরিবেশের প্রাণপুরুষ হইতেছে দীপঙ্কর সেন। এই বিষ-দিগ্ধ বাতাবরণের নিগূঢ়তম যন্ত্রণা তাহার অস্থিমজ্জাতে সংক্রামিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা হইতেই সে এক অদ্ভূত অমৃতরস আহরণ করিয়াছে। সে একাধারে প্রকৃতি ও ব্যক্তি-পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত চরিত্র। সে যেন এক অসাধারণ চুম্বকশক্তিবলে এই অস্বাভাবিক, বিপরীত-উপাদান-গঠিত যুগপরিস্থিতির সমস্ত ভাল মন্দ ভাবকণিকাগুলিকে নিজ আত্মার গভীরে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। বাল্যকাল হইতেই জীবনজিজ্ঞাসা তাহার মধ্যে এক অনিবার্য প্রেরণারূপে সর্বগ্রাসী শক্তিতে বিকশিত হইয়াছে। অঘোরদাদুর বিকৃত জীবননীতি, কালীঘাটের শুচি ও অশুচি, ভক্তিভোগমিশ্র পরিবেশ, সহপাঠীদের উৎপীড়ন ও সমপ্রাণতা, বিশেষ করিয়া কিরণের কৈশোর কল্পনার উদার অবাস্তবতা-তাহার শিশুমনকে এক অবোধ, অস্পষ্ট বিভোর করিয়াছে। ইহার মধ্যে শিক্ষক প্রাণমথবাবুর আদর্শবাদ ও কিরণের দুঃখজয়ী দেশসেবার মহিমা তাহার মনে গভীর রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। এই স্তরে তাহার মাতার প্রভাবই তাহার উপর সর্বাপেক্ষা কার্যকরী।

এই সময়ে তাহার জীবনে লক্ষ্মীদি ও সতীর আবির্ভাব তাহার মানসদিগন্তকে প্রসারিত করিয়া তাহার কৈশোর অনুভূতিগুলিকে গাঢ়তর বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে। লক্ষ্মীর ও সতীর জীবনের সহিত সে তাহার জীবনকে এরূপ একাত্মভাবে মিশাইয়াছে যে, উহাদের সুখ-দুঃখ, উহাদের জীবনসমস্যা যেন তাহার সম্প্রসারিত সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে রূপান্তরিত হইয়াছে। লক্ষ্মীর সহিত তাহার সম্পর্ক বাহিরের হিতৈষণাতেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু সতীর রক্তস্রাবী সমস্যাচক্রের প্রত্যেকটি পাক দীপঙ্করের মনেও প্রায় রক্তের অক্ষরেই কাটিয়া বসিয়াছে। সতীর অবস্থা-সংকটের একটা সুমীমাংসার জন্য তাহার জীবনে চিরঅশান্তিকে সে বরণ করিয়াছে। এমন কি সনাতনবাবু, স্নেহলেশহীনা, স্বার্থসর্বস্বা মা-মণির জন্যও তাহার সমবেদনার সীমাপরিসীমা নাই, তাহাদেরও ছটফটানির সে অংশীদার। চাকরিতে তাহার অভাবনীয় পদমর্যাদাবৃদ্ধি সত্ত্বেও ঘুষ দিয়া যোগাড়-করা চাকরির জন্য তাহার গভীর আত্মধিক্কার তাহাকে এক মুহূর্তের শান্তি দেয় নাই। অল্প বেতনের কেরানী গাঙ্গুলীবাবুর পারিবারিক জীবনের সুগভীর লাঞ্ছনা সে নিজের জীবন দিয়া অনুভব করিয়াছে। যুগজীবনের যে গ্লানি ও তিক্ততা প্রত্যেক মানুষের অন্তঃকরণে প্রতিনিয়ত জমিয়া উঠিয়াছে, তাহার সবটুকু যোগফল যেন দীপঙ্করের জীবনে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। নীলকণ্ঠের ন্যায় যুগযন্ত্রণার সবটুকু বিষ সে পান করিয়াছে। কেবল দুইটি প্রাণী তাহার সার্বিক গ্রহণশীলতা, সকল পাপের প্রায়শ্চিত্তচর্যার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই—ক্ষীরোদা ও মিঃ ঘোষাল। ইহাদের অন্তরলোকে প্রবেশের সে কোন চেষ্টাই করে নাই। হয়ত ক্ষীরোদার ব্যথা দূর করা তাহার সাধ্যাতীত ছিল, সতীর প্রতি নিঃশেষে সমর্পিত প্রাণ অপরকে দান করিবার কোন অধিকারই তাহার ছিল না। যে রেলদুর্ঘটনায় সতী প্রাণ দিয়াছে, সে দুর্ঘটনা দীপঙ্করকেও অক্ষত

রাখে নাই—নিয়তির একই অমোঘ বন্ধন উভয়ের জীবনকে একই পরিণতিসূত্রে জড়াইয়াছে। সতীর মৃত্যুর পর দীপংকর যেন ব্যক্তিসত্তা হারাইয়া একটি ভাবাদর্শের অমূর্ত রূপ ব্যঞ্জনায় পরিণত হইয়াছে। যে যুগ আদর্শকে হারাইয়াছে, ধন ও প্রতিষ্ঠার মোহে আত্মবিক্রয় করিয়াছে, তাহারই বধির কর্ণে সে বিস্মৃত আদর্শের বাণী শোনাইয়াছে, সব দিক দিয়া ফতুর বর্তমানকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাইয়াছে। সে নিজ ক্ষুদ্র জীবনসীমা ছাড়াইয়া বিরাট ভূমিকম্পে উন্মথিত বিশ্বের বিকারের মর্মমূলে প্রতীকী মহিমায় আসীন হইয়াছে। যাহার ব্যক্তিজীবনের প্রচেষ্টা কলিকাতার সংকীর্ণ সীমায় ও কয়েকটি নর-নারীর সহিত সংযোগরেখায় আবদ্ধ, তাহার বৃহত্তম চেতনা-তাৎপর্য সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক কালের বাংলা ঔপন্যাসিকগোষ্ঠীর মধ্যে দুইজন উপন্যাসের ঘটনা-পরিধির মধ্যে নিখিলব্যাপ্ত, বন্দনাপ্রসারী জীববোধের ইঙ্গিত দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তর্জীবন ও অধ্যাত্মলোকের অতল রহস্যময়তা ও অসীমাভিমুখিতা ব্যঞ্জিত করিয়াছেন। আর দ্বিতীয়, বিমল মিত্র সমগ্র বিশ্বব্যাপী বহির্ঘটনাপ্রবাহের সার্বভৌম তাৎপর্যটি বর্তমান উপন্যাসে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমগ্র জগৎ শুধু কবির ভাষায় নয়, বাস্তব ভাবসংঘাত ও জীবননিয়ামক শক্তিরূপে, জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে এক বিপুল, অভাবনীয় আলোড়ন তুলিয়াছে। যুদ্ধোন্মত্ত পৃথিবী শত্রুধ্বংসের জন্য যে বিরাট মারণাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে তাহারই নৈতিক বিস্ফোরণ সে শত্রুমিত্র সকলের উপর নির্বিচারে প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই নির্মম দানবীয় শক্তি বাঙালীর শান্ত, স্বল্পে তুষ্ট, নীতিসংযত জীবনযাত্রার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সেখানে তুমুল বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছে। ক্ষুদ্র কলিকাতা শহরের উপর সমস্ত যুধ্যমান জগৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—সুদূর রণক্ষেত্রের গোলাগুলিবারুদ আমাদের আকাশে-বাতাসে উগ্র গন্ধ ও দাহ ছড়াইয়াছে। প্রতিদিনকার প্রয়োজনের সামগ্রীতে, নিকট প্রতিবেশী ও পরিবারগোষ্ঠীর সহিত আচরণে, যুগযুগান্তরের নীতি-সংস্কার ও কর্তব্যবোধে, বিশ্বের উত্তাল তরঙ্গবিক্ষোভে সমস্ত স্থির সিদ্ধান্তকে অস্থির ছন্দে আবর্তিত করিয়াছে। বিশ্ব খুব স্বাভাবিক এমন কি অনিবার্য ভাবেই শুধু আমাদের দ্বারপ্রান্তে পেঁছে নাই, আমাদের নিগূঢ়তম অন্তর্জীবনেও কাঁপন ধরাইয়াছে। উপন্যাসটিতে এই পরিধিবিস্তারের সার্থক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। অবশ্য বিশ্বের আততায়ী দস্যুরূপেই এখানে প্রকটিত। শুধু আলংকারিক অর্থে নয়, শুধু ক্ষুদ্রের মধ্যে দার্শনিক ও ঐতিহাসিক অতিকায়ত্ব প্রবর্তনের নেশায় নয়, মৌলিক প্রয়োজনের দুরন্ত তাগিদেই আমরা বিপরীত অর্থে বিশ্বরূপ দর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। দীপংকরের অন্তরতম চেতনার মধ্যে এই বিশ্বানুভূতি অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহার এই সাঙ্কেতিক মহিমাই উপন্যাসের বস্তুবেষ্টনীতে এক অপূর্ব আত্মিক তাৎপর্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছে। বাংলার আধুনিকতম মানস রূপান্তরের স্মরণীয় চিত্ররূপেই উপন্যাসটির কালোত্তীর্ণ মূল্য।

বাঙালীর অন্তর্জীর্ণতার আর একটি নিম্নতর স্তর আসিয়াছে দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তুপ্লাবনের অনিবার্য ফলরূপে। লেখক এই চরম অধোগতির মূল্যায়ন এখনও

করেন নাই। হয়ত ভবিষ্যৎকালের কোন উপন্যাসে ইহা বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হইবে। কিন্তু তখন লেখক দীপংকরের মত সূক্ষ্মানুভূতিশীল, উদারচরিত, বসুধৈবকুটুম্বক নায়কচরিত্র উপহার দিতে পারিবেন কি? আপাততঃ দীপংকরই আমাদের উপন্যাসের আকাশে সমস্ত পাংশুল ধূম্রকলংকের মধ্যে ধ্রুবতারার মত ভাস্বর হইয়া রহিল। [বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা]

'আসামী হাজির' ও নয়নতারা

ডঃ অতুল সুর

অনেকসময়ই তার আচারণের দিক দিয়ে নারী রহস্যময়ী হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ এক রহস্যময়ী নারীর বিশ্বস্ত চিত্র এঁকেছেন বাঙলার অপরাজেয় কথাশিল্পী বিমল মিত্র তাঁর 'আসামী হাজির' উপন্যাসে। এই উপন্যাসের নায়িকা নয়নতারা এক রহস্যময়ী নারী। বিমল মিত্র তাঁর এই উপন্যাসে নয়নতারার যে জীবনকাহিনী বিবৃত করেছেন তার আঁকে বাঁকে নয়নতারার আচরণ নয়নতারাকে এক রহস্যময়ী নারী করে তুলেছে। অথচ এই জীবনকাহিনীর মধ্যে কাল্পনিক কিছু নেই। আমাদের বাস্তবজীবনে আমরা নয়নতারাকে এখানে সেখানে সর্বত্রই দেখতে পাই। সেদিক থেকে বিমল মিত্রের এই কাহিনী এক চলমান সমাজের জীবন্ত চিত্র। এই অসামান্য উপন্যাসখানা যারা পড়েননি, তাঁদের সকলকেই অনুরোধ করব, উপন্যাসখানা পড়তে। অবশ্য যাঁরা বিমল মিত্রের অন্যান্য উপন্যাস পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে বিমল মিত্র গত তিনশো বছরের বাঙালী জীবনের প্রশস্ত রাজপথ ও তার অলিগলির ভিতর প্রবেশ করে বিভিন্ন প্রজন্মের বাঙালী নারীর যে স্বরূপ দেখেছেন ও আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, তাতে নারী সর্বত্রই রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। তার মানে নারীর একটা কালজয়ী রূপ আছে। সে রূপ হচ্ছে নারী রহস্যময়ী।

নয়নতারা কেষ্টনগরের পণ্ডিতমশাই কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্যের একমাত্র সন্তান। পণ্ডিতমশাইয়ের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। সেজন্য তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্র নিখিলেশকেই সবসময়ে ডাকেন নিত্যনৈমিত্তিক জিনিসপত্তর কেনাকাটার জন্য, অসুস্থ হলে ডাক্তার ডাকবার জন্য, ওষুধপত্তর কিনে আনবার জন্য।

নয়নতারা অপরূপা সুন্দরী। তার রূপ দেখেই নবাবগঞ্জের জমিদার নরনারায়ণ চৌধুরীর পরিবার তাকে পছন্দ করেছিল, নরনারায়ণের নাতি সদানন্দের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য। বিয়ে করে সদানন্দ যখন বউ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল, নবাবগঞ্জের লোক তখন অবাক হয়ে গিয়েছিল নয়নতারার রূপ দেখে। সকলে একবাক্যে বলেছিল, এ যেন ডানাকাটা পরী। কথাটা শুনে নয়নতারার আনন্দ হয়েছিল। তখন সে ভাবেনি যে তার এত রূপ ব্যর্থ হবে সদানন্দকে তার সান্নিধ্যে আনতে।

সদানন্দ বিদ্বান ছেলে। বি. এ. পাশ করেছে। কিন্তু তার মনোভাব এলোমেলো, আচার-আচরণ ছন্নছাড়া। নরনারায়ণের বিরাট ঐশ্বর্যের প্রতি সে

বিমুখ। সে জেনেছিল নরনারায়ণের এই বিরাট বৈভবের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে আছে পাপের শাখা-প্রশাখা।

প্রথমজীবনে নরনারায়ণ ছিল কালীগঞ্জের জমিদার হর্ষনাথ চক্রবর্তীর পনের টাকা মাইনের নায়েব। হর্ষনাথের ছিল অগাধ বিশ্বাস নরনারায়ণের ওপর। কিন্তু শেষজীবনে হর্ষনাথের চৈতন্যোদয় হয়েছিল। তিনি সজ্ঞানে নবদ্বীপের গঙ্গায় দেহত্যাগ করেন। মরবার সময় তিনি নরনারায়ণকে বলেছিলেন—বাবা, আমি চললাম, তুমি আমার বিধবাকে দেখো। কয়েকদিনের মধ্যেই রহস্যজনকভাবে হর্ষনাথের ওয়ারিশনদের মৃত্যু ঘটল। নরনারায়ণ জমিদারীটা গ্রাস করে নিয়ে, নিজে জমিদারী পত্তন করল নবাবগঞ্জে। হর্ষনাথের অসহায়া বিধবা 'কালীগঞ্জের বউ' মামলা করল। নরনারায়ণ সে-মামলা ভন্ডুল করে দিল, তাকে দশ হাজার টাকা নগদ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

দশ বছর ধরে কালীগঞ্জের বউ এসেছে নরনারায়ণের কাছে ওই টাকার জন্য। কিন্তু নরনারায়ণ তাকে টাকা দেয়নি। দিয়েছে কেবল স্তোকবাক্য ও আশা। সদানন্দ নিজের চোখে দেখেছে তার দাদুর এই প্রতারণামূলক আচরণ। আরও দেখেছে যে, মাত্র চার পয়সার জন্য নিরীহ নিরপরাধ পায়রাপোড়াকে ঠগ বানিয়ে তার সর্বনাশ করা হয়েছে। মনের দুঃখে সে আত্মহত্যা করেছে গলায় দড়ি দিয়ে। অথচ প্রকৃত ঠগ্‌ হচ্ছে কৈলাস গোমস্তা। সে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করে বাবুদের নেকনজরে রয়ে গিয়েছে। সদানন্দ আরও দেখেছে যে একইভাবে সর্বনাশ করা হয়েছে মানিক ঘোষ ও ফটিক প্রামাণিকেরও। বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে সদানন্দের মন, পাপের ওপর প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণের জমিদারীর ওপর।

নরনারায়ণ চায় এইভাবে তার জমিদারীর প্রসার ঘটুক। নিরবচ্ছিন্নভাবে তার বংশধারা চলুক এই জমিদারীর ধারা সংরক্ষণে। সেই জন্যই তিনি সদানন্দের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের দিন সদানন্দ হল নিরুদ্দেশ। তার প্রকাশ মামা তাঁকে ধরে নিয়ে এল কালীগঞ্জের বউয়ের বাড়ি থেকে। সদানন্দ বলে, আগে তোমরা কালীগঞ্জের বউয়ের টাকা দাও, তবে আমি বিয়ে করব। নরনারায়ণ বলে, তুই বিয়ে করে এলেই আমি কালীগঞ্জের বউয়ের টাকা দিয়ে দেব। বিয়ে করে এসে সদানন্দ কালীগঞ্জের বউয়ের টাকা চায়। কিন্তু নরনারায়ণ কথার খেলাপ করে।

বিয়ের ফুলশয্যার দিন রবাহূত হয়ে আসে কালীগঞ্জের বউ, সদানন্দের বউকে আশীর্বাদ করতে। আবার টাকার কথা ওঠে। নরনারায়ণ তাকে কড়া কথা বলে। উঠোনে দাঁড়িয়ে কালীগঞ্জের বউ অভিশাপ দেয়, 'নারায়ণ, তুমি নির্বংশ হবে।'

নরনারায়ণ বংশী ঢালীকে ডেকে গোপনে কি নির্দেশ দেয়। ইতিহাসের পাতা থেকে চিরকালের মতো কালীগঞ্জের বউ ও তার চার পালকিবাহক উধাও হয়ে যায়। সদানন্দ গোপনে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ আসে। কিন্তু অতীতের আবার পুনরাবৃত্তি ঘটে। টাকা পেয়ে পুলিশ চলে যায়।

সদানন্দ এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে ওঠে। এর প্রতিঘাত গিয়ে পড়ে নয়নতারার ওপর। ফুলশয্যার দিন রাত্রে সে নয়নতারার সঙ্গে

এক-বিছানায় শোয় না। সে ঘর থেকে পালায়। নয়নতারার মন বিষাদে ভরে যায়। এদিকে খবর আসে যে ওই ফুলশয্যার দিন রাত্রেই কেষ্টনগরে তার মা কন্যা-বিচ্ছেদ সইতে না পেরে মারা গেছেন।

বাবাকে শান্ত করার জন্য নয়নতারাকে বাপের বাড়ি পাঠানো হয়। নয়নতারা আবার শ্বশুরবাড়ি ফিরে আসে। ভট্টাচার্যমশাইও একদিন নিজে নয়নতারার বাড়ি আসেন। যাবার সময় মেয়েকে আশীর্বাদ করে যান—'সুখে থাকো মা, স্বামীর সংসারে লক্ষ্মী হয়ে থাকো, মনেপ্রাণে স্বামীর সেবা কর, মেয়েমানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর নেই। তুমি মনেপ্রাণে স্বামীর ঘর কর, তাই দেখেই তোমার মায়ের স্বর্গত আত্মা সুখী হবে।'

এদিকে নবাবগঞ্জে সদানন্দর শয়নঘরে সেই একই দৃশ্য। শাশুড়ী রুষ্ট হয়ে বউকে ভর্ৎসনা করে বলে, 'তোমার রূপ নিয়ে কি আমরা ধুয়ে খাব! আমাদের এই বিরাট ঐশ্বর্য ভোগ করবার জন্য চাই নাতি। সেজন্যই তো তোমাকে আমরা এনেছি। তুমি যেরকমভাবে পার, তোমার রূপ দিয়ে সদাকে বশীভূত করে, আমাকে নাতি এনে দাও।'

নয়নতারা সেদিন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সে আর শোবার ঘরে নির্বাক দর্শক হয়ে থাকে না। আজ সদানন্দকে সে বশীভূত করবেই! আজ তাকে সে বিছানায় টেনে আনবেই। আর তা নয়তো, সে একটা হেস্তনেস্ত করবে। একটা মোকাবিলা এর চাই-ই।

কিন্তু সদানন্দ অচল অটল। নয়নতারার কথার উত্তর না দিয়ে, সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু নয়নতারা পিঠ দিয়ে কপাট চেপে ধরে, সদানন্দর মুখোমুখি হয়ে বলে—'তুমি না-হয় তোমার বাপ-ঠাকুরদার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছ, কিন্তু আমি কেন তোমার সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত করতে যাব?' তারপর কথা কাটাকাটি হয়। হঠাৎ সদানন্দ টেবিল থেকে একটা কাঁচের দোয়াতদানি তুলে নিয়ে নিজ কপালে ঠুকতে থাকে। কপাল ফুঁড়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে ঘরের মেঝে ভাসিয়ে দেয়। তাই দেখে নয়নতারা অজ্ঞান হয়ে ঘরের মেঝেতে পড়ে যায়। সদানন্দ ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর থেকেই সে হয় নিরুদ্দেশ।

এদিকে শব্দ শুনে শাশুড়ী প্রীতিলতা ছুটে এসে দেখে রক্তাক্ত মেঝের ওপর নয়নতারা অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। চৈতন্য ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই নয়নতারা প্রশ্ন করে, উনি কেমন আছেন? প্রীতিলতা বলে, সদানন্দ ভাল আছে, উপরের ঘরে শুয়ে আছে। নয়নতারা বলে, আমি ও'কে একবার দেখতে যাব। প্রীতি বলে, ডাক্তারের মানা আছে, তুমি পরে দেখা কোরো।

রাত্রে যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে, নয়নতারা সদানন্দকে দেখবার জন্য চুপিচুপি উপরে উঠে যায়। কিন্তু যা দেখে, তা তার চোখের সামনে খুলে দেয় নবাবগঞ্জের ইতিহাসের আর এক কদর্য পৃষ্ঠা। কিছুদিন যাবৎ নরনারায়ণ অসুস্থ হয়েছেন। কৃপণ পুত্র হরনারায়ণ চিকিৎসার খরচে বিব্রত হয়ে পড়েছে। নয়নতারা জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে খরচের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তার শ্বশুর তার পিতাকে গলা

টিপে মেরে ফেলছে।

সদানন্দ আর ফেরেনি। নয়নতারা একলাই শয়নঘরে শোয়। শাশুড়ী বলে—বউমা শোবার আগে ভাল করে দরজায় খিল দেবে। একদিন শাশুড়ী হঠাৎ বলে বৌমা, আজ থেকে তুমি দরজায় খিল না দিয়েই শোবে। নয়নতারা তো অবাক। কেন এরকম বিদকুটে নির্দেশ! রাত্রে ভয়ে তার ঘুম এল না। বিছানায় জেগেই পড়ে রইল। রাত্রে দেখে ঘরের দরজাটা খুলে একজন পুরুষমানুষ তার ঘরে ঢুকল। নয়নতারা তাকে চিনতে পারল—তার শ্বশুর। নয়নতারা আঁতকে ওঠে। লোকটা ভয় পেয়ে বেরিয়ে যায়। পরের দিন লোকটা ঘরে ঢুকে তার গায়ে হাত দেয়। এক ঝটকা মেরে নয়নতারা হাতটা সরিয়ে দেয়। তারপর বিছানা থেকে উঠে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পাশে বিহারী পালের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। বিহারী পালকে নবাবগঞ্জের জমিদাররা দেখতে পারে না, কেননা ইদানীং কালে লড়াইয়ের মৌকায় বিহারী পালের সমৃদ্ধি বেড়েছে। কিন্তু বিহারী পালের স্ত্রী নয়নতারাকে খুব ভালবাসে। নয়নতারা তাকে দিদিমা বলে। শ্বশুরের কুৎসিত প্রয়াসে সন্ত্রস্তা হয়ে নয়নতারা পরের দিন বিহারী পালের বাড়ি গিয়ে দিদিমার কাছে আশ্রয় নেয়। ভোরের আগেই নিজের ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু শাশুড়ী সব টের পেয়ে নয়নতারাকে শাসায় সে যেন বিহারী পালের স্ত্রীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখে।

নয়নতারার বিদ্রোহী মন জ্বলে ওঠে। বিহারী পালের স্ত্রীকে সে বলে, 'কাল আপনি নবাবগঞ্জের সমস্ত গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের আমাদের বৈঠকখানায় আসতে বলবেন।'

পরের দিন বার-বাড়িতে নবাবগঞ্জের সমস্ত গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের সমবেত হতে দেখে, নয়নতারার শ্বশুর বিস্মিত। জিজ্ঞাসাবাদে জানে তার বৌমা তাঁদের আসতে বলেছে। ক্ষণিকের মধ্যে নয়নতারা সেখানে উপস্থিত হয়ে, সমবেত জনমণ্ডলীর কাছে নবাবগঞ্জের কুৎসিত ইতিহাস বিবৃত করে যায়। তার শ্বশুর যে তার সতীত্বনাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছে, সে-কথাও সে বলে। জনমণ্ডলী রায় দেয়, নয়নতারাকে ওর বাপের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। বাপের বাড়ি যাবার আগে নয়নতারা কুয়োতলায় গিয়ে হাতের শাঁখা ভেঙে ফেলে, হাতের নোয়া খুলে জঙ্গলের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, কুয়োর জলে সিঁথির সিঁদুর ধুয়েমুছে ফেলে।

কেষ্টনগরে তার বাবার সামনে গিয়ে যখন নয়নতারা দাঁড়ায়, বাবা নয়নতারার এয়োস্ত্রী চিহ্নসমূহ না দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। প্রশ্ন করেন, 'আমার জামাই কোথায়?' নয়নতারা উত্তর দেয়, 'নেই, নেই, নেই। তোমার জামাই কোনদিন ছিল না, এখনও নেই। আমি তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে চলে এসেছি। এখন আমি তোমার কাছেই থাকব।' নয়নতারার উক্তি বৃদ্ধ ভটচার্যি মশাইকে নিদারুণ মানসিক আঘাত দেয়। বৃদ্ধ সহ্য করতে পারেন না। স্ট্রোক্ হয়। মারা যান। তাঁর প্রিয় ছাত্র নিখিলেশই তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যায়।

শ্মশান থেকে ফিরে এসেই নিখিলেশ নয়নতারার কাছে প্রস্তাব করে, 'তুমি আমার বাড়িতে আমার স্ত্রী হয়ে এস।' নয়নতারা তখন শোকে মুহ্যমান। একমাত্র অবলম্বন বাবাকে হারিয়ে ভবিষ্যৎ তখন তার কাছে অন্ধকার হয়ে গেছে। নয়নতারার সমস্ত

মন নিখিলেশের ওপর বিষিয়ে ওঠে। মনে হয় যেন নিখিলেশ এতদিন তার বাবার মৃত্যুর জন্যই প্রতীক্ষা করছিল। যেন নয়নতারার অসহায়তার সুযোগ খুঁজছিল সে। যেন নয়নতারার শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসাটাই তার কাছে কাম্য ছিল। কিন্তু তারপরেই মনে পড়ে তার আশ্রয়ের কথা, তার জীবিকানির্বাহের কথা, তা নিজের ভরণপোষণের কথা। তখন তার চোখের সামনে ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই, বোধ হয় বর্তমান বলেও কিছু নেই। শুধু আছে একটা অতীত, তা সেটা স্মরণ করতেও তার ভয় হয়।

নয়নতারা নিখিলেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। একদিন কলকাতায় এসে তাদের বিয়ে রেজেস্ট্রি হয়ে যায়। তারা যেমন বলল. তেমনি সই করল সে। রেজেস্ট্রি অফিসে তারা কী প্রশ্ন করল, তা তার কানে ভাল করে ঢুকল না। কালীঘাটে গিয়ে সিঁথিতে সিঁদুরও পরানো হল। তারপর তারা নৈহাটিতে এসে একটা বাড়ি ভাড়া করে। নিখিলেশ তাকে যা বলত, সে তাই-ই করতে চেষ্টা করত। সে যেন এক কলের পুতুল। নিখিলেশ তাকে দম দিয়ে ছেড়ে দিত, আর সে কলের পুতুলের মতো শুত, ঘুমোত, ভাবত, হাসত, নড়ত—সবকিছু করত। কিন্তু তার মধ্যে কোন প্রাণ ছিল না। নিখিলেশ তাকে বাড়িতে পড়িয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করিয়ে, একটা সরকারী চাকরিও যোগাড় করে দেয়। নিখিলেশের অফিস আগে শুরু হয়। সেজন্য সে আগের ট্রেনে কলকাতায় আসে। নয়নতারা পরের ট্রেনে কলকাতায় আসে অফিস করতে। দু'জনে একসঙ্গেই বাড়ি ফেরে। মনে হয় নয়নতারার জীবন সহজ সরল হয়ে গেছে। কিন্তু আয়নায় সামনে দাঁড়িয়ে সে যখন সিঁথিতে সিঁদুর পরে, মনে হয় কে যেন তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লজ্জায় ঘেন্নায় শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলে। রাত্রে নিখিলেশের পাশে সে যখন শুয়ে থাকে, এক এক দিন একটা পুরানো ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সে চমকে ওঠে।

এদিকে নবাবগঞ্জের ইতিহাসে ওলট-পালট ঘটে যায়। নয়নতারার শাশুড়ি প্রীতিলতা মারা যায়। প্রীতিলতা ছিল সুলতানপুরের জমিদার কীর্তিপদ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র সন্তান। প্রীতিলতাই ছিল তাঁর বিরাট জমিদারির একমাত্র ওয়ারিসন। প্রীতিলতার মৃত্যুর পর, কীর্তিপদবাবুও একদিন মারা যান। নবাবগঞ্জে নিঃসঙ্গ জীবন হরনারায়ণের পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে। নবাবগঞ্জের সমস্ত সম্পত্তি প্রাণকৃষ্ণ শা'কে চার লক্ষ টাকায় বেচে দিয়ে, হরনারায়ণ সুলতানপুর চলে যায়। কিন্তু ওই সম্পত্তি ভোগ করা প্রাণকৃষ্ণে'র সইল না। সেও একদিন মারা গেল। তারপর নবাবগঞ্জের জমিদারদের বাড়ি ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়।

হরনারায়ণ সুলতানপুরের বৃক্ষছায়া অবলম্বন করে পাঁউরুটি ও দুধ খেয়ে জীবন কাটাতে থাকে। একদিন সুলতানপুরের লোক দেখে, হরনারায়ণ আর শোবার ঘরের দরজা খোলে না। শাবল দিয়ে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে তারা দেখে হরনারায়ণের জীবনাবসান ঘটেছে।

এদিকে সদানন্দর জীবনেও বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ ঘটে যায়। বউবাজারের বিরাট ধনশালী ব্যক্তি সমরজিৎবাবু একদিন সদানন্দকে রাণাঘাট স্টেশন থেকে তার বাড়ি

নিয়ে আসেন। সমরজিৎবাবু নিঃসন্তান বলে সুশীল সামন্ত নামে একটি ছেলেকে পুষ্যি নিয়েছিলেন। তাকে মানুষ করে তার বিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু সুশীল সামন্ত পুলিশের চাকরিতে ঢুকে মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত হওয়ায়, সমরজিৎবাবু তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করে, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সদানন্দকে দেবার মতলব করেন। টের পেয়ে সদানন্দ কাউকে কিছু না বলে সমরজিৎবাবুর বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

সদানন্দ'র এখন আশ্রয়স্থল বড়বাজারে পাঁড়েজির ধরমশালা। পাঁড়েজি ধরম-শালার ম্যানেজার। লোক ভালো। সদানন্দকে দুটো টুইশনি যোগাড় করে দেয়। কিন্তু সদানন্দ ছেলে পড়িয়ে যে টাকা পায়, ধরমশালায় নিয়ে আসে না। পথে ভিখারীদের বিলিয়ে দেয়। তাদের কাছে সদানন্দ 'রাজাবাবু'। ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছে দেখে, পাঁড়েজি সদানন্দকে একখানা আলোয়ান কিনে দেয়। সদানন্দ সেটা এক নিরাশ্রয়া বুড়িকে বিলিয়ে দেয়। ঠাণ্ডা লেগে সদানন্দ অসুখে পড়ে। পাঁড়েজি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। সুস্থ হয়ে সে পাঁড়েজিকে বলে, আমি একবার নবাবগঞ্জ থেকে ঘুরে আসি। ক্লান্তি, অবসাদ ও অনশনে নৈহাটির কাছে সে ট্রেনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ট্রেনের গার্ড তাকে নৈহাটি স্টেশনে নামিয়ে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে, এমন সময়ে একজন মহিলা ভিড় ঠেলে সামনে এসে বলে, ওঁকে আপানারা হাসপাতালে পাঠাবেন না। আমি ওকে বাড়ি নিয়ে যাব। উনি আমার নিকট আত্মীয়। আমার নাম নয়নতারা ব্যানার্জি'।

অচৈতন্য সদানন্দকে নিজ বাড়িতে এনে, নয়নতারা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে যায়। গড়িয়ে গড়িয়ে দু'মাস গত হয়, তবুও সদানন্দর জ্ঞান ফেরে না। নিরলসভাবে রাত জেগে নয়নতারা তার সেবা করে যায়। চাকরি হবার পর নয়নতারা কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়েছিল। নয়নতারার ইচ্ছে ছিল কয়েক বছর পরে যখন আরও কিছু টাকা হবে তখন কলকাতা শহরে তারা একটা বেশ ছোটখাটো সাজানো-গোজানো বাড়ি করবে। কিন্তু সদানন্দর চিকিৎসার জন্য সে-সব টাকা নিঃশেষিত হয়ে যায়। নিখিলেশের দেওয়া দশ ভরির সোনার হারটাও সে বাঁধা দেয়। দিনের পর দিন, রাত জেগে সদানন্দর মাথার ওপর সে আইস-ব্যাগ ধরে বসে থাকে। ডাক্তারবাবু তো দেখে অবাক। বলেন, লোকের স্ত্রী তো দূরের কথা, নিজের মা-ও এমনভাবে সেবা করতে পারে না।

কিন্তু নিখিলেশ চটে লাল। তার মনে হয় তার জীবনটা যেন ছত্রখান হয়ে গেছে। নয়নতারাকে সে বলে, ওকে তুমি হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও না। তারপর যখন দেখে যে তার কথায় কোন কাজ হল না, তখন সে সদানন্দকে মারবার জন্য ওষুধের বদলে বিষ কিনে নিয়ে আসে। কিন্তু ডাক্তারবাবুর নজরে পড়ায় সদানন্দ বেঁচে যায়। নয়নতারা শিশিটা তুলে রাখে, যদি কোনদিন ওটা তার নিজের কোন কাজে লাগে!

তারপর একদিন সদানন্দর জ্ঞান ফিরে আসে। সামনে নয়নতারাকে দেখে সে বিস্মিত হয়। তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। ট্রেনের মধ্যে

কিভাবে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, নয়নতারা তাকে দেখতে পেয়ে নিজের বাড়িতে এনে কিভাবে তাকে ভাল করে তুলেছে, সব শোনে। একমুহূর্তও তার সেখানে থাকতে ভালো লাগে না। নিখিলেশের আচরণ থেকে সে বোঝে যে তার উপস্থিতির ফলে, নয়নতারার সুখের সংসারে চিড় ধরেছে। একদিন কাউকে কিছু না বলে সে সেখান থেকে সরে পড়ে। নয়নতারা নিখিলেশকে পাঠায় তার খোঁজে নবাবগঞ্জে। নিখিলেশ নবাবগঞ্জে না গিয়ে, ফিরে এসে নয়নতারাকে বলে, সদানন্দ আবার বিয়ে করে দিব্যি সুখে আছে। কিন্তু নয়নতারার মনে সংশয় জাগে। সে নিজে নবাবগঞ্জে গিয়ে দেখে, নিখিলেশ তাকে সব মিছে কথা বলেছে। নিখিলেশের ওপর তার বিতৃষ্ণা হয়। সে আলাদা ঘরে শুতে থাকে। তারপর সে ঠিক করে, সে কলকাতায় গিয়ে মেয়েদের এক বোর্ডিং-এ থাকবে।

এদিকে নৈহাটি থেকে চলে আসবার পর, সদানন্দের সঙ্গে তার প্রকাশ মামার দেখা হয়। প্রকাশ মামা তাকে নিয়ে যায়, হরনারায়ণ ও কীর্তিপদর একমাত্র ওয়ারিসন হিসাবে সদানন্দকে দিয়ে সাকসেশন সার্টিফিকেট বের করবার জন্য। সদানন্দ এখন আট লক্ষ টাকার মালিক। চার লক্ষ টাকা সে দান করে নবাবগঞ্জের লোকদের স্কুল-কলেজ ও হাসপাতাল করবার জন্য, আর বাকী চার লক্ষ টাকা নিয়ে সে আসে নৈহাটিতে নয়নতারার বাড়ি। ঠিক সেই মুহূর্তেই নয়নতারা বেরিয়ে যাচ্ছিল কলকাতায় মেয়েদের বোর্ডিং-এ থাকবার জন্য। সদানন্দকে সে বাড়ির ভিতরে এনে নিজের ঘরে বসায়। নিখিলেশ সেদিন সকাল-সকাল বাড়ি ফিরে নয়নতারার ঘরে সদানন্দকে দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। সদানন্দকে সে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তারপর দেখে টেবিলের ওপর সদানন্দ একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ ফেলে গেছে। ব্যাগ খুলে দেখে তার ভিতর রয়েছে একখানা চার লক্ষ টাকার চেক নিখিলেশ ও নয়নতারার নামে। চেকখানা পাবার পর নিখিলেশ ও নয়নতারার মধ্যে সমস্ত মনোমালিন্য কেটে যায়। আবার তাদের মধ্যে ভাব হয়।

নিখিলেশ তাকে নয়নতারার বাড়ি থেকে বের করে দেবার পর, সদানন্দ আবার চলতে থাকে। শেষে এসে দাঁড়ায় ও আশ্রয় পায় চৌবেড়িয়ায় রসিক পালের আড়ত-বাড়িতে। কিছুকাল পরে সেখানে আবির্ভাব ঘটে সদানন্দর দ্বিতীয় সত্তার—হাজারি বেলিফের, যে এতদিন ছায়ারূপে তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হাজারি বেলিফ বলে, আপনি আপনার পিতাকে খুন করেছেন, আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। হাজারি বেলিফকে সে অনুরোধ করে একবার তাকে যেন সুলতানপুর, নবাবগঞ্জ ও নৈহাটিতে নিয়ে যায়। আত্মগোপন করে সে সুলতানপুরের লোকদের জিজ্ঞাসা করে, সদানন্দ চৌধুরীকে তারা চেনে কিনা। একবাক্যে সকলে বলে, সদানন্দ চৌধুরী তো তার বাপকে খুন করবার পর থেকে পলাতক। নবাবগঞ্জে এসে দেখে অন্তর্দ্বন্দ্বে স্কুল-কলেজ ও হাসপাতাল সব জ্বলছে, আর এই অশান্তির কারণ হিসাবে নবাবগঞ্জের লোক সদানন্দকে অভিশাপ দিচ্ছে। নৈহাটিতে এসে শোনে, নিখিলেশ ও নয়নতারা সেখানে থাকে না। লটারিতে চার লক্ষ টাকা পেয়ে, তারা থিয়েটার রোডে বাড়ি করে সেখানে থাকে। থিয়েটার রোডে এসে দেখে সেখানে

সেদিন উৎসব, নয়নতারার প্রথম সন্তানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে। এমবেসির লোক, পুলিশের বড়সাহেবরা, আরও কত কে বিশিষ্ট অতিথি সেখানে আসছে। সদানন্দ ও হাজারি বেলিফকে দারোয়ানরা সামনের গেট থেকে তাড়িয়ে দেয়। পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে তারা দাঁড়ায় মুখোমুখি হয়ে নয়নতারার সামনে! নয়নতারা প্রথমে সদানন্দকে চিনতে পারেনি, ভেবেছিল ডেকরেটরের লোক। তারপর সদানন্দকে চিনতে পেরে বলে, 'ওঃ তুমি', আজ আমি খুব ব্যস্ত, তুমি কাল এস। এই কথা বলে সে অতিথি আপ্যায়নের কাজে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ এক আর্তনাদের শব্দ শুনে ছুটে আসে। সদানন্দ আর দ্বিতীয় সত্তা হাজারি বেলিফকে খুন করেছে। পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করতে যাচ্ছে এমন সময় দু'হাত বাড়িয়ে নয়নতারা বাধা দিতে যায়। বলে, 'তোমরা ওঁকে অ্যারেস্ট কোরো না। যত টাকা লাগে আমি দেব, আমার যথাসর্বস্ব দেব। উনি 'আমার স্বামী।' থিয়েটার রোডের বাড়িটার পরিবেশ একমুহূর্তে বদলে যায়। সকলেই স্তম্ভিত। কেবল নিখিলেশ নয়। সে নয়নতারাকে বলে, কী পাগলামি করছ! কথাটা শুনে নয়নতারা অজ্ঞান হয়ে মেঝের ওপর পড়ে যায়। তার চোখের জলে তার মুখের ও গালের 'ম্যাকস্ ফ্যাক্টর' ধুয়ে মুছে যায়। তার কানে কেবল বাজতে থাকে সদানন্দের বলা শেষ কথাগুলো—'আমি আসামী, আমি মানুষকে বিশ্বাস করেছিলুম, আমি মানুষকে ভালবেসেছিলুম, আমি মানুষের শুভ কামনা করেছিলুম, আমি চেয়েছিলুম মানুষ সুখী হোক, আমি চেয়েছিলুম মানুষের মঙ্গল হোক। কিন্তু 'আজ এই পনেরো বছর পরে জানলুম মানুষকে বিশ্বাস করা, মানুষকে ভালবাসা, মানুষের শুভ কামনা করা পাপ, আমি তাই আজ পাপী, আমি তাই আজ অপরাধী, আমি তাই আজ আসামী, আমাকে আপনারা আমার পাপের শাস্তি দিন, আমাকে ফাঁসি দিন—।'

বইখানির এইখানেই ইতি।

বিমল মিত্রের ৮৫৫ পাতার বই 'আসামী হাজির' উপন্যাসের এটাই হচ্ছে একটা সংক্ষিপ্ত কঙ্কাল বা কাঠামো। কিন্তু কুশল-শিল্পী যেমন কাঠামোতে মাটি লেপে রঙ চাপিয়ে তাকে সুন্দর মূর্তিতে পরিণত করে, বিমল মিত্রও তাই করেছেন। বস্তুত বইখানির 'ইসথেটিক বিউটি' (aesthetic beauty) বা 'নান্দনিক সৌন্দর্য' উপলব্ধি করতে হলে, সমগ্র বইখানি পড়া দরকার। এক ছাদের তলায় স্ত্রীর দুই স্বামীর সহবস্থান, এবং দু'জনের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতা পালনের melody আমি আর কোন উপন্যাসে পড়িনি। বেদ-পুরাণেও নয়। এ বই প্রমাণ করে, কথাশিল্পী হিসাবে বিমল মিত্র কত বড় প্রতিভাশালী লেখক। বাংলা ভাষায় পূর্বে এরূপ বই লেখা হয়নি, পরেও হবে না। জীবন সম্বন্ধে এখানি মহাকাব্য— এ হিউম্যান স্টোরি। একমাত্র বিমল মিত্রের পক্ষেই এ-রকম বই লেখা সম্ভবপর হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে অ-সাধারণ লোককে, 'ভালো মানুষ'কে জগতের লোক ভুল বোঝে। মানুষ সৎ হলে, তার যে কি শোচনীয় পরিণতি হয়, এখানা তারই এক বিশ্বস্ত দলিল। আর দেখিয়েছেন নারী চরিত্র কত দুর্ভেদ্য। নারী চরিত্রের এই দুর্ভেদ্যতাই নারীকে রহস্যময়ী করে তুলেছে। নারীর অবচেতন মনের গভীরে যে বাসনা বাসা

বাঁধে, সেখানে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ চলে, তা অনুধাবন করা খুবই কঠিন। কিন্তু বিমল মিত্র নারীর সেই অবচেতন মনকে আমাদের সামনে উন্মোচিত করে ধরেছেন, উচ্ছ্বাস বা আবেগময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে নয়,—সংলাপ ও আচরণের মাধ্যমে, চরিত্র অংকনের বিশিষ্ট মুন্সিয়ানাতে, বিচিত্র ও জটিল ঘটনাপ্রবাহের বিন্যাসে ও নারীর বাহ্যিক আচরণের ভিতর দিয়ে।

সদানন্দ'র পাশাপাশি তিনি চিত্রিত করে গেছেন, একজন কদাচারী ইতর ব্যক্তিকে, নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। নিখিলেশ যে একজন দুর্নীতিপরায়ণ ইতর ব্যক্তি সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নৈহাটির বাড়িতে একদিন সামান্য কথা-কাটাকাটির মধ্যে নিখিলেশ নয়নতারাকে 'স্কাউন্ড্রেল' বলে গালি দিয়ে অপমান করেছিল। কিন্তু সে নিজে যে কত বড় স্কাউন্ড্রেল, তা সে নিজে কোনদিনই বুঝতে পারল না। তা না হলে যে পণ্ডিতমশাইয়ের সে ছিল প্রিয় ও বিশ্বস্ত ছাত্র, সেই পণ্ডিতমশাইয়ের মৃত্যুতে তার বিন্দুমাত্র শোক হল না। পণ্ডিতমশাইকে শ্মশানে দাহ করে ফিরে আসবার পরমুহূর্তেই সে পণ্ডিতমশাইয়ের অসহায় ও শোকে মুহ্যমান কন্যা নয়নতারার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে বসল। সব জেনেশুনেই সে পরস্ত্রীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবার লোভ সামলাতে পারল না। নয়নতারার রূপেই তাকে লুব্ধ করল। মাত্র রূপ নয়। অর্থগৃধ্নুতাও। নয়নতারার কোনদিনই কোন বিধিসম্মত বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেনি। সুতরাং শেষমুহূর্ত পর্যন্ত নয়নতারা পরস্ত্রীই ছিল। শেষমুহূর্তে থিয়েটার রোডের বাড়ির উৎসবের সমারোহের মধ্যে যখন নয়নতারা প্রকাশ্যে সদানন্দকেই 'স্বামী' বলে ঘোষণা করল, তখনও সে নয়নতারার ওপর তার লোভ পরিহার করতে পারল না। সে ভালো করেই জানত যে, যে-সমাজের মধ্যে তার ও নয়নতারার অবস্থান সে-সমাজে এক নারীর দুই স্বামীর সহাবস্থান অবৈধ। এ কথা জেনেও সে নয়নতারার হাত ধরতে গিয়েছিল, বলেছিল—কী পাগলামি করছ! নয়নতারা নিখিলেশের ভুল ভাঙেনি দেখেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। নয়নতারা নিখিলেশকে ভালোরূপেই জানত। জানত তার ওপর নিখিলেশের অবৈধ আসক্তি ও লোলুপতা, জানত তার অর্থগৃধ্নুতা, যার জন্য সে নয়নতারাকে চাকরি করতে বাধ্য করেছিল, জানত নিখিলেশ তার গহনাগুলোর লোভে নির্লজ্জভাবে সেগুলো তার শ্বশুরবাড়িতে চাইতে গিয়েছিল, জানত সদানন্দকে বিষ খাইয়ে মারবার জন্য নিখিলেশ বিষ কিনে এনেছিল। এসব জেনেও সে নিখিলেশের সঙ্গে পনেরো বছর 'কাগজের বউ' সেজে ঘর করেছিল। এখানেই নয়নতারা রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। অথচ তার অন্তরাত্মা বা অবচেতন মন নিখিলেশকে চায়নি, চেয়েছিল সদানন্দকে। সেইজন্যই আয়নার সামনে সে যখন সিঁথিতে সিঁদুর পরতে যেত তখন সে নিজের পিছনে সদানন্দকে দেখত। রাত্রে নিখিলেশের পাশে সে যখন শুয়ে থাকত, সদানন্দর মুখখানাই তখন তার চোখের সামনে ভেসে উঠত। সে স্বপ্ন দেখত সদানন্দ এসেছে তাকে নিয়ে যাবার জন্য। সদানন্দ যেদিন নৈহাটিতে শেষবারের জন্য তার বাড়ি গিয়েছিল, সেদিন নয়নতারা নিজেই সদানন্দকে বলেছিল, তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চল। সে মনে-প্রাণে জানত যে সদানন্দই তার প্রকৃত স্বামী, নিখিলেশ নয়।

নিখিলেশের সঙ্গে তার সম্পর্কটা যে অবৈধ, তা সে ভালভাবেই জানত। সেজন্যই আয়নায় সে যখন তার পিছনে সদানন্দর মুখ দেখত, তখন লজ্জায় ঘেন্নায় সে শাড়ির আঁচল দিয়ে নিজের মুখখানা ঢেকে ফেলত। কিন্তু নিখিলেশের শেষ পর্যন্ত কোন লজ্জা-ঘেন্না ছিল না। কেননা, নয়নতারা যখন সদানন্দকে স্বামী বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করল সমবেত বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে, তখন সমবেত অতিথিমণ্ডলী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তাদের স্তম্ভিত হবার তো কথাই। কেননা, তারা একমুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিয়েছিল যে, যে-সন্তানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তারা সেখানে সমবেত হয়েছে, সে-সন্তান এক জারজ সন্তান—পরস্ত্রীতে উদ্গত সন্তান। কিন্তু নিখিলেশের কিছুমাত্র মনের বিকৃতি ঘটেনি। তা না হলে সে নয়নতারার হাত ধরতে গিয়ে বলে, কী পাগলামি করছ। হ্যাঁ, যে সমাজের চিত্র বিমল মিত্র এঁকেছেন, সে সমাজে সত্যবাদিতার কোন স্থান নেই, সত্যবাদিতার কোন মূল্য নেই। সত্যবাদিতা তো সে-সমাজে নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সত্যবাদিতার জন্য তো সদানন্দকে আসামী হতে হয়েছিল।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তবে নয়নতারা কেন নিখিলেশের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী রূপে ঘর করতে সম্মত হল? নিজ মুখেই সে স্বীকার করেছিল, সেদিন সে সম্মুখীন হয়েছিল, আদিম মানবীয় সমস্যার। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রত্নোপলীয় যুগের সেই আদিম মানবীর রক্তকণিকাই সে বহন করেছিল তার শিরা-উপশিরায়। প্রত্নোপলীয় যুগে আশ্রয় ও প্রতিরক্ষাই তো আদিম মানবীকে প্রবৃত্ত করেছিল পুরুষকে ভজনা করতে। পিতার মৃত্যুর পর সেই সমস্যারই সম্মুখীন হয়েছিল নয়নতারা। এক-মুহূর্তে নিখিলেশ তো সেদিন সে সমস্যার সমাধান করে দিতে পারত, বোন হিসাবে নয়নতারাকে তার বাড়ি নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়ে বোনের মতো তাকে উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করিয়ে চাকরি সংগ্রহ করে দিয়ে। সেভাবে সে তো নয়নতারাকে স্বাবলম্বী ক'রে তুলতে পারত। কিন্তু তা সে সেদিন করেনি। পণ্ডিতমশাইয়ের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতা সেদিন তার লুপ্ত হয়েছিল। সেদিন তার মধ্যে লেশমাত্র মানবিকতা ছিল না। নয়নতারার রূপই তার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নয়নতারার বিবাহের পূর্বেই নিখিলেশ তো অনবরতই তাদের বাড়ি আসত। তখনই তো নিখিলেশের অবচেতন মনের কোণে নয়নতারা বাসা বেঁধেছিল। সেদিন নয়নতারার নিজেরই মনে হয়েছিল, নিখিলেশ কি তার অসহায়তার প্রতীক্ষা করছিল? শ্বশুর-বাড়ি থেকে সে চলে আসে, এটাই কি তার কাম্য ছিল? আবার সেদিন নয়নতারার আচরণও আমাদের বিস্মিত করে। সেদিন নয়নতারা হারিয়ে ফেলেছিল তার সেই তেজীয়ান সত্তা, যে সত্তা জ্যোতির্ময়ী হয়ে উঠেছিল নবাবগঞ্জে তার শয়নকক্ষে সদানন্দর গৃহত্যাগের দিন, বা যার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি সে প্রদর্শন করেছিল নবাব-গঞ্জের জমিদারবাড়ির বৈঠকখানায় গণআদালতের সামনে। নিখিলেশ যেদিন তাকে তার স্ত্রী হবার প্রস্তাব করেছিল, সেদিন সে সেই কুৎসিৎ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে, নিজেও তো স্বাবলম্বী হবার পথে পা বাড়াতে পারত। সে তো মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেছিল। সে তো টিউশনি করে নিজের স্বাধীন ও সাধ্বী সত্তা অক্ষুণ্ণ

রাখতে পারত। তা কিন্তু সে করেনি। বোধহয় সে তখন পিতৃশোকে কাতর। শোকের কাতরতায় সেদিন তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঝাপসা হয়ে উঠেছিল। তার সামনে আর এক বিকল্পও অবশ্য ছিল। সে বিকল্প হচ্ছে, আত্মঘাতী হওয়া। আত্মঘাতী হবার কথা তো নয়নতারার মনে একাধিকবার জেগেছে। নবাবগঞ্জের শয়নকক্ষে সেই মোকাবিলার দিন, সদানন্দকেই তো সে বলেছিল, আমি আত্মঘাতী হইনি কেন, সেটাই আশ্চর্য। আবার আর একদিন আত্মঘাতী হবার পরিকল্পনায় বশীভূত হয়েই তো নৈহাটির বাড়িতে, সদানন্দকে মারবার জন্য নিখিলেশ যে বিষ কিনে এনেছিল, তা সে তুলে রেখে দিয়েছিল, যদি কোনদিন সেটা তার নিজের কাজে লাগে। কিন্তু কোনদিন সে আত্মঘাতী হয়নি। কেননা, আত্মঘাতী হবার জন্য যে মনোবল দরকার, সে মনোবল তার ছিল না। অস্তিবাদী লেখিকা সিমোন দ্য বভোয়ার, যিনি নারীচরিত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুশীলন করেছেন, তিনি বলেছেন পুরুষের তুলনায় আত্মঘাতী হবার মনোবল মেয়েদের অনেক কম। সে মনোবল ছিল কাদম্বরীর। শোনা যায়, স্বামীর জামার পকেটে এক অভিনেত্রীর প্রেমপত্র দেখে সে বিশুকে দিয়ে আফিম কিনে আনিয়ে আত্মঘাতী হয়েছিল। সে কেন আত্মঘাতী হয়েছিল, সে-কথা সে লিখে রেখে গিয়েছিল। সে-চিঠি যদি সেদিন মহর্ষি সঙ্গে-সঙ্গে না বিনষ্ট করতেন, তা হলে আজ আমরা নারীর জীবনের মর্মস্থলের বেদনার একটা সন্ধান পেতাম—নারী কেন আত্মঘাতী হয়?

পণ্ডিতমশাই যখন নবাবগঞ্জে মেয়েকে দেখতে গিয়েছিলেন, তখন ফিরে আসবার সময় তিনি নয়নতারাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, 'মা, স্বামীর সেবা কর, মেয়েমানুষের জীবনে এত বড় আশীর্বাদ আর নেই, এই দেখেই তোমার মা'র স্বর্গস্থ আত্মা সুখী হবে।' বোধহয় যেদিন অফিস যাবার জন্য ট্রেন ধরতে গিয়ে নয়নতারা নৈহাটি স্টেশনে সদানন্দকে অচৈতন্য অবস্থায় প্লাটফরমের ওপর পড়ে থাকতে দেখেছিল এবং তার বাড়িতে তাকে তুলে নিয়ে এসে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল, সেদিন তার অবচেতন মন জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তার বাবার সেই আশীর্বাদকে সার্থক করবার জন্য। সেদিন তার সচেতন মন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, 'কাগজের স্বামী'র পরিবর্তে প্রকৃত স্বামীর সেবা করবার জন্য। সেটাই ছিল তার অন্তরের আ[illegible]ন। বাবার কথামতোই সে স্বামীর সেবা করেছিল, তার সর্বস্ব দিয়ে নিখিলেশের ঈর্ষাকাতর বিরোধিতার বিপক্ষে। তার সেবা দেখে ডাক্তারবাবুও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, 'লোকের স্ত্রী তো দূরের কথা, লোকের নিজ মা-ও এরকম সেবা করে না।' ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আচ্ছা, এর কি স্ত্রী নেই? নয়নতারা বলেছিল, হ্যাঁ, আছে। আবার তারই কয়েকদিন পরে তার সহকর্মিণী মালা যখন তার বাড়ি এসেছিল, এবং তাকে প্রশ্ন করেছিল, ওই মানুষটার জন্য তুই এতদিন অফিস কামাই করে রয়েছিস, তা ওর কি নিজের স্ত্রী নেই? তার উত্তরে নয়নতারা বলেছিল, না। এই পরস্পরবিরোধী উক্তিই তো নারী-মনের এক গভীর রহস্যকে অনাবৃত করে। নারী নিজ আচরণের জন্য প্রায়ই লজ্জা-ঘেন্নায় মরে যায়! লজ্জা-ঘেন্নাবশতই মালাকে 'না' বলা তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, কেননা 'হ্যাঁ' বললে মালা আরও কৌতূহলী

হয়ে উঠত, এবং প্রকৃত সত্য জানতে পারলে অফিসমহলে প্রচারিত হ'ত যে নয়নতারা ও নিখিলেশের সম্পর্ক অবৈধ। এখানে সংযত হয়ে গিয়ে বিমল মিত্র এক অসামান্য মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। কেননা, মেয়েদের স্বভাবসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী তিনি যদি মালার সঙ্গে নয়নতারাকে খোলা-মন নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত করাতেন, তাহলে নয়নতারার পক্ষে সেটা কী লজ্জা-ঘেন্নার ব্যাপার হ'ত। নয়নতারা সেদিন তার অবচেতন মনকে মালার কাছে উন্মুক্ত করেনি। এই 'হ্যাঁ' ও 'না'র মধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করি নারীর রহস্যময়ী স্বরূপ। সেজন্যই সারভেনটিস্ তাঁর 'ডন্ কুইক্সোট' উপন্যাসে বলেছেন—"Between a woman's 'yes' or 'no', there is no room for a pin to go." নৈহাটিতে থাকাকালীন সদানন্দকে সে স্বামী বলেই গ্রহণ করেছিল, সদানন্দ সম্বন্ধে নিখিলেশ তাকে যাই বলুক না কেন। কেননা, বিমল মিত্র নয়নতারাকে দিয়ে স্বগতোক্তি করিয়েছেন; 'নয়নতারা বুঝতে পারে ও-মানুষটা যে এ-বাড়িতে শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছে, ও-মানুষটার জন্যে যে এতগুলো টাকা খরচ হচ্ছে, নয়নতারার অফিস কামাই হচ্ছে, এটা নিখিলেশের পছন্দ নয়! কিন্তু পুরুষমানুষ এত অবুঝ কেন? এইটুকু বোঝে না কেন যে আজ না হয় ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা উচিত নয়, কিন্তু এককালে ওর সঙ্গেই তো অগ্নিসাক্ষী রেখে তার বিয়ে হয়েছিল।' কিন্তু সদানন্দ জানত যে, যাকে সে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি, তার কাছ থেকে সেবা নেবার তার অধিকার নেই। এই অধিকারের প্রশ্ন নিয়েই তো নৈহাটির বাড়িতে রোগশয্যায় সদানন্দ'র সঙ্গে নয়নতারার বিতর্ক হয়েছিল। নয়নতারা তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই তো সেদিন সদানন্দকে বলেছিল, 'সাতপাক ঘুরে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল, আমার অধিকার নেই, তুমি এ কি কথা বলছ?' যদিও সে তার এ অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সচেতন ছিল, তবুও সে জানত যে নিখিলেশের কাছে এটা অপ্রিয় ব্যাপার, সেজন্যই সদানন্দ যখন চলে যেতে চেয়েছিল এবং বলেছিল, 'আমার জ্ঞান থাকলে আমি কিছুতেই এখানে আসতুম না', তখন সে সদানন্দকে বলেছিল, 'তুমি আগে ভালো হও, তারপর চলে যেও, আমি তোমাকে এখানে আটকে রাখবো না, তুমি থাকতে চাইলেও আমি তোমাকে এখানে থাকতে দেবো না'। আবার সেই নয়নতারাই একদিন সদানন্দকে বলেছিল, 'যেখানে তুমি যাবে, সেখানেই আমি যাবো। তোমার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে পারলে, আমি বেঁচে যাই, আমার আর কিছু ভাল লাগছে না। এ বাড়ি আমার কাছে এখন বিষ হয়ে গেছে। এ বাড়ির প্রত্যেকটা ইঁট আমার কাছে এখন অসহ্য হয়ে উঠেছে, এখানে আর একদিন থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো, সত্যি। এর থেকে একমাত্র তুমিই আমাকে বাঁচাতে পারো।' প্রমীলা যে এক রহস্যময়ী জীব, তা নয়নতারার এই পরস্পরবিরোধী উক্তি থেকেই বুঝতে পারা যায়।

দুইখাতে প্রবাহিত নয়নতারার জীবনকাহিনী আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। তার যুগলসত্তাতে আমরা বিস্মিত। সদানন্দই যদি তার অন্তরের দেবতা হয়, সদানন্দকেই যদি সে মনেপ্রাণে স্বামী বলে গ্রহণ করে থেকে থাকে, তবে কি করে তার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল দীর্ঘ পনেরো বছর নিখিলেশের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনযাপন

করা ? বিশেষ করে যখন সে জানত যে নিখিলেশ একজন শঠ, প্রতারক ও প্রবঞ্চক। নবাবগঞ্জে গিয়ে সে নিজের চোখেই দেখে এসেছিল, নিখিলেশ কত বড় মিথ্যাবাদী, কত বড় প্রবঞ্চক। নিখিলেশের এই প্রবঞ্চকতাই তাকে উত্তেজিত করেছিল, নবাবগঞ্জ থেকে ফিরে আসবার পর পৃথক ঘরে পৃথক শয্যায় রাত কাটাতো। নিখিলেশের ওপর তার এ অভিমান কেন ? আবার আর একদিন যখন সে নিখিলেশকে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরতে দেখেছিল, তখন সে রাগে জ্বলে উঠে নিখিলেশকে ভর্ৎসনা করেছিল। যদি নিখিলেশের প্রতি তার বিন্দুমাত্র অনুরাগ না থাকবে, তবে কি জন্য তার এই অভিমান, এই রাগ ? নিখিলেশের সঙ্গে দাম্পত্যজীবন ব্যর্থও হয়নি। সে তো সন্তানের জননী হয়েছিল। মাতৃত্বের গর্বে গরবিনী হয়ে সে তো সমারোহের সঙ্গে উৎসব করতেও মত্ত হয়েছিল। তবে এসব কি তার অভিনয় ? বলব, হ্যাঁ, অভিনয়ই বটে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, কেন এই অভিনয় ? কিসের প্ররোচনায় তার এই অভিনয় ? এ অভিনয়ের কারণ, সে তো নিজের মুখেই ব্যক্ত করেছিল সদানন্দ'র মহানিষ্ক্রমণের রাত্রে নবাবগঞ্জে শয়নকক্ষে। সেদিন সদানন্দকে সে বলেছিল, 'আমার কি এখন থেকে কোন সাধ-আহ্লাদ থাকবে না ? আমি কি তা হলে সারাজীবন এমনি করেই তোমাদের বাড়িতে একা-একা রাত কাটাবো ? আমার মনের কথা বলবার, তা হলে কোন লোকই থাকবে না ? আমি কি নিয়ে থাকবো ? আমি কাকে আশ্রয় করে বাঁচবো ? আমার জীবন কেমন করে সার্থক হবে ?' কাকে আশ্রয় করে সে বাঁচবে, কে তার জীবন সার্থক করবে, কে তার সাধ-আহ্লাদ মেটাবে, এসব প্রশ্নই তাকে প্রলুব্ধ করেছিল নিখিলেশের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে তার কার কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে।

এককথায় নারী চায় আশ্রয়। নারী চায় একজনকে অবলম্বন করে তার সাধ-আহ্লাদ মেটাতে, তার জীবন সার্থক করে তুলতে। সে চায় তার দাম্পত্যজীবনে একজন দীপ্তিমান সহযাত্রী। নয়নতারার কাছে দুই সত্তাই সত্য। কোনটাই মিথ্যা বা nonentity নয়। এই দুই সত্তাকে সার্থক করবার জন্য যদি তাকে অভিনয় করতে হয়, তা হলে অভিনয়ের জন্য সে প্রস্তুত। হয়তো এই অভিনয়ের জন্য যে চাতুর্যের ও অনুষঙ্গের প্রয়োজন হয়, তাকেই বিমল মিত্র 'ম্যাকস ফ্যাক্টর' বলেছেন। অভিনয়ের ক্ষেত্রে নারী অসাধারণ পটুতায় অধিকারিণী। তার এ অভিনয় চলচ্চিত্রের অভিনয়ের মতো। চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকাদের দাম্পত্যজীবনের অভিনয় করতে দেখে দর্শকের কি একবারও মনে হয় যে বাস্তবজীবনে এদের আর একটা সত্যিকারের দাম্পত্যজীবন আছে ?

নারীর দুটো সত্তা আছে। একটা আটপৌরে বা বাহ্যিক সত্তা, যেটা সে লোক-সমাজে প্রকট করে। অপরটা তার অন্তরের সত্তা, যে সত্তা তার অবচেতন মনে সুপ্ত হয়ে থাকে, কৃচিৎ-কদাচিৎ অনাবৃত করে। এই যুগলসত্তার বিদ্যমানতাই আমরা নয়নতারার মধ্যে দেখি। নয়নতারার বিসদৃশ আচরণ দেখে ডাক্তাররা বলবেন, নয়নতারা 'সিজোফ্রেনিয়া' (Schizophrenia) ব্যাধিগ্রস্ত। কিন্তু আমি বলব, প্রমীলার ক্ষেত্রে সিজোফ্রেনিয়া মোটেই কোন ব্যাধি নয়। এটা প্রমীলার সহজাত

বৈশিষ্ট্য। এই বিশিষ্টতার জন্যই বিধাতা প্রমীলাকে রহস্যময়ী করে তুলেছেন। মনে হয় এ-সম্বন্ধে সত্যিকথাটা বলেছেন জার্মান দার্শনিক নিট্‌সে। তিনি বলেছেন, 'নারী-সৃষ্টি বিধাতার দ্বিতীয় ভুল' ('Women was God's second mistake')।

প্রমীলার এই সহজাত বৈশিষ্ট্য, নারীদেহে কোন বিশেষ 'হরমোন'-এর বিদ্যমানতার জন্য ঘটে না। এটা ঘটে অবস্থাবিপাকে, যে ঘটনা বা মনের বিশেষ অবস্থার (situation) সে সম্মুখীন হয়, তারই ঘাত-প্রতিঘাতে। আদিমকাল থেকেই তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিবেশই তার চরিত্র গঠনে তাকে সহায়তা করেছে। সে যে রহস্যময়ী, এটা তার শাশ্বত ধর্ম। সেজন্যই সিমোন দ্য বভোয়ার বলেছেন—'She revels in immaneace, she is contrary. she is prudent and petty, she has no sense of fact or accuracy, she lacks morality, she is contemptibly utilitarian, she is false, theatrical, self-seeking and so on.' এটা এমন এক অস্তিবাদী নারীর উক্তি, যে সারাজীবন অনুশীলন করে গেছে নারী-চরিত্র নিয়ে। এই উক্তির মধ্যেই আমরা নয়নতারার সত্তাকে খুঁজে পাই, তার বিচিত্র আচরণের ব্যাখ্যা পাই। মনে পড়ে কনফুসিয়াস-এর কথা। তিনি বলেছিলেন—চাঁদের ওপিঠে কি আছে তা পুরুষমানুষের পক্ষে জানা সম্ভবপর; কিন্তু মেয়েদের মাথায় কী ভাবনা-বিরাজ করছে, তা জানা সম্ভবপর নয়। সেজন্যই আমাদের দেশের ঋষিরা বলেছেন—নারীর মনের মধ্যে যে কী আছে তা 'দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ'। তাদের মাথায় কী পোকা কিলবিল করছে, তা যদি আমরা জানতে পারতাম, তা হলে তো নারীকে আমরা রহস্যময়ী বলে মনে করতাম না। তা হলে তো নয়নতারাও আমাদের কাছে রহস্যময়ী হয়ে উঠত না। [প্রমীলা প্রসঙ্গ]

লেখকের কড়ি দিয়ে কিনলাম-এর একটি সমালোচনা

Bimal mitra's encyclopedic novel "Kari Diye Kinlam" (1962) sums up the complexities and unsolved riddles of modern life in a representative individual character and studies life against the back-ground of an ever-widening environment. This is truly a novel with a third dimension that packs up the meaning of the lives of all classes of people and events of far-reaching magnitude into the life of a single individual.

This is a book which has an intellectual appeal not exhausted at the first reading of the story. With this novel modern Bengali fiction may be said to have stepped into a new sense of life values or a new world of cosmic proportions.